সামাজিক বিজ্ঞান

ভাগ-১

ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণী

শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালন এবং
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রতিষ্ঠান পরিষদ
ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

ওড়িশা প্রাথমিক শিক্ষা
কার্য্যক্রম আধিকরম,
ভুবনেশ্বর

ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান

অষ্টম শ্রেণী

মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ ওড়িশার দ্বারা অষ্টম শ্রেণীর জন্যে অনুমোদিত

প্রথম সংস্করনের প্রস্তুতি (২০১১)
মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ, কটক, ওড়িশা

অনুবাদক মন্ডলী ঃ
প্রফেসার দীপাস্য কুন্ডু
শ্রীমতী সুচিত্র দাস (সমীক্ষক)
শ্রীমতী মধুমিতা ব্যানার্জ্জী (অনুবাদক)

সংযোজনা ঃ
ড. সবিতা সাহু

লেখক এবং সমীক্ষক মণ্ডলী ঃ
প্রফেসর ডঃ অশোক নাথ পরিডা (সমীক্ষক)
ডঃ ব্রজেন্দ্র নারায়ণ পট্টনায়ক (স্বতন্ত্র সমীক্ষক)
প্রফেসর বৈষ্ণব চরণ দাস (সহ সমীক্ষক)
ডঃ ভগবান কর
শ্রী প্রফুল্ল কুমার জেনা
শ্রী দৈতারী সাহু

পরিবর্ত্তিত সংস্করন প্রস্তুতি (২০১৬)
শিক্ষক শিক্ষা নির্দেশালয় এবং রাজ শিক্ষা গবেষনা ও প্রশিক্ষন পরিষদ, ওড়িশা, ভুবনেশ্বর

সমীক্ষক মন্ডলী ঃ ইতিহাস ঃ শ্রী কার্ত্তিক চন্দ্র রাউত
শ্রী সত্যজিৎ মহাপাত্র

রাজনীতি বিজ্ঞান ঃ প্রফেসর বৈষ্ণব চরন দাস
শ্রীমতী কানন লক্ষ্মী পট্টনায়ক

সংযোজনা ঃ ডঃ তিলোত্তামা সেনাপতি

প্রকাশক ঃ বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ, ওড়িশা সরকার
মূদ্রন ঃ পাঠ্যপুস্তক উৎপাদন ও বিক্রয়, ভুবনেশ্বর

মুখবন্ধ
প্রথম ঃ সংস্করণ

মানুষ একটি সামাজিক প্রানী, সমাজেই তার জন্ম। বিকাশ ও বিলয়। সেই সমাজের বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানকেই ''সামাজিক বিজ্ঞান'' বলা হয়। অষ্টম শ্রেনীর জন্যে উদিষ্ট এই ''সামাজিক বিজ্ঞান'' ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞান এবং ভূগোলের সংযুক্ত পাঠ্যপুস্তক। এটি জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষন পরিষদ নয়া দিল্লী তথা আমাদের রাজ্যে এর নমুনা পাঠ্য খসড়ার ওপরে অ আধারিত।

''ইতিহাস'' শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীকে তার আঞ্চলিক স্থিতি থেকে আরম্ভ করে সারা পৃথিবীর, অতীত থেকে বর্তমান পর্য্যন্ত সংস্কৃতি, সভ্যতা, পরম্পরা, শাষন, ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রের ক্রমবিকাশের ওপরে ধারনা দেওয়া। সেই ভাবে ''রাজনীতি বিজ্ঞানে'' শিক্ষার্থী তার নিজের সমাজ, স্থিতি, শাষন, শৃঙ্খলা, ন্যায়, কর্ত্তব্য ও অধিকার বিষযে জানে। এই সব উদ্দেশ্য কে নজরে রেখে এই পাঠ্য পুস্তক টি পূর্বাপেক্ষা অভিনব রূপে রূপায়িত হয়েছে। এতে প্রথম বার ''তোমার জন্য কাজ'' ও ''জানার কথা''র প্রচলনের প্রয়াস করা হয়েছে। একজন শিক্ষার্থী মনযোগ দিয়ে পুস্তকটির সমস্ত বিভাগ অধ্যায়ন করলে নিশ্চই সামাজিক বিজ্ঞান, বিশেষতঃ ইতিহাস ও রাজনীতি বিজ্ঞানের বাস্তব মূল্য বোধ উপলব্ধি করবে বলে আশা ও বিশ্বাস।

পুস্তকটির পাণ্ডুলিপি রাজ্যের কোনা কোনা থেকে আমন্ত্রিত অভিজ্ঞ বিষয় শিক্ষক – শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক কর্মশালায় নিরীক্ষিত, আলোচিত ও সমীক্ষিত হয়ে তাঁদের বিজ্ঞ প্রস্তাব যথা সম্ভব গ্রহন করা হয়েছে। পরিশেষে এই শ্রম সাপেক্ষ সম্পাদনায় সম্পৃক্ত শিক্ষক শিক্ষিকা, কর্মচারী, অধিকারী, লেখক মন্ডলী, সমীক্ষক, সংযোজক ও মূদ্রাকার কে পরিষদ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে। ত্রুটি বিহীন সম্পাদনার জন্য অদম্য উদ্যম করা হলেও ত্রুটি বিচ্যুতির সম্ভাবনা এড়িয়ে দিতে পারা যায় না। আশা ও বিশ্বাস অনিচ্ছা কৃত ত্রুটি বিচ্যুতি কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচরে আনায় সহযোগ করলে পরবর্ত্তী সংস্করনে সংশোধিত হবে।

সভাপতি, মাধ্যমিক শিক্ষাপরিষদ, ওড়িশা

মুখবন্ধ
পরিবর্ত্তিত সংস্করণ

বিদ্যালয় ও গণশিক্ষা বিভাগ, ওড়িশা সরকারের নির্দেশে শিক্ষক শিক্ষা নির্দ্দেশালয় এবং রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষন পরিষদ, ওড়িশা, মূল সামাজিক বিজ্ঞান পুস্তকের এক নূতন পরিবর্ত্তিত সংস্করন প্রস্তুত করেছেন। আবশ্যক স্থানে প্রদত্ত ভাষাগত, তথ্যগত ও প্রশ্নগত বিষয়ে স্বল্প পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। পুস্তকটিকে অধিক সময় উপযোগী করার জন্যে সমীক্ষক মন্ডলা চেষ্টা করেছেন।

অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবর্ত্তিত সংস্করণটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

ত্রুটি বিহীন সমীক্ষার জন্যে পুস্তকটিকে শিক্ষার্থীদের আবশ্যকতা অনুযায়ী অধিক আকর্ষনীয় করার চেষ্টা করা হয়েছে। পাঠ্য পুস্তকটির পরিবর্ত্তিত সংস্ককরন অধিক উপযোগী হলে সমীক্ষক মণ্ডলী ও সংযোজক গনের পরিশ্রম সার্থক হবে।

সমীক্ষক মণ্ডলী

ভারতের সংবিধান

প্রাক কথন ঃ

আমরা ভারতবাসী ভারতকে এক সার্বভৌম সমাজবাদী ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক সাধারণ তন্ত্র রূপে গঠন করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে নাগরিক গণকে

- সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় ;
- চিন্তা, অভিব্যাক্তি, প্রত্যয়, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং উপাসনার স্বতন্ত্রতা;
- স্থিতি ও সুবিধা সুযোগের সমানতার সুরক্ষা প্রদান করতে তথা
- ব্যাক্তি মর্য্যাদা এবং রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি নিশ্চিত করে তাঁদের মধ্যে ভাতৃ ভাব উৎসাহিত করতে

এই ১৯৪৯ সালের নভেম্বর ২৬ তারিখে আমাদের সংবিধান প্রনয়ন সভায় এত দ্বারা এই সংবিধান গ্রহন ও প্রনয়ন করছি এবং আমাদের নিজেকে অর্পন করছি।

চতুর্থ অধ্যায় (ক)
৫১ (ক) ধারা ঃ মৌলিক কর্ত্তব্য

ভারতের প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নলিখিত কর্ত্তব্য ঃ-

ক) সংবিধান জেনে চলবো এবং এর আদর্শ ও অনুষ্ঠান গুলো এবং জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত কে সম্পূর্ণ প্রদর্শন করা;

খ) যে সব মহান আদর্শ আমাদের জাতীয় সংগ্রামকে অনুপ্রাণিত করেছিল, তাকে স্মরণ ও অনুসরণ করা;

গ) ভারতের সার্বভৌম, একতা ও সংহতির সুরক্ষা করা ;

ঘ) দেশের প্রতিরক্ষা করা এবং প্রয়োজনে সেবা প্রদান করা;

ঙ) ধর্মগত, ভাষাগত এবং আঞ্চলিক কিম্বা গোষ্ঠীগত ভিন্নতা অতিক্রম করে জন সাধারনের মধ্যে ঐক্য ও ভাতৃভাব প্রতিষ্ঠা কার এবং নারীজাতীর মর্য্যাদা হানিকর ব্যবহার পরিত্যাগ করা;

চ) আমাদের সংস্কৃতির মূল্যবান ঐতিহ্যকে সম্মান করা ও সংরক্ষণ করা;

ছ) অরণ্য, হ্রদ, নদী, বন্যপ্রানী সমেত প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা করা এবং উন্নত করা, তার সঙ্গে জীব জগতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা;

জ) বৈজ্ঞানিক মনভাব, মানববাদ এবং অনুসন্ধিৎসা ও সংস্কার মনোভাব পোষন করা;

ঝ) সার্বজনিক সম্পত্তির সুরক্ষা করা ও হিংসা ত্যাগ করা;

ঞ) ব্যাক্তিগত ও সমষ্টিগত কার্য্যের প্রত্যেক ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করা, যার দ্বারা আমাদের দেশ প্রচেষ্টা ও কৃত্তিত্বের উচ্চতর সোপানে অবিরত উন্নতি করতে পারবে।

ট) মাতা, পিতা বা অভিভাবক, তাঁদের ছ থেকে চোদ্দ বছরের মধ্যে থাকা সন্তান বা লালিতদের শিক্ষা লাভের সুযোগ যুগিয়ে দেওয়া।

ভারতীয় স্থল সেনা

জীবন ও জীবিকা গড়ার সহযোগী

ক্রমিক সংখ্যা	পাঠ্যক্রম	পাঠ্যক্রমের জন্য খালি থাকা স্থান	যোগ্যতার মানদন্ড		বৈবাহিক স্থিতি	অগ্রণীসম্পাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়	চাকুরী চয়ন পরিষদ (SMB) বসার অনুমানিক তারিখ	প্রশিক্ষন একাডেমির নাম	প্রশিক্ষনের সময় সীমা
			বয়স সীমা	যোগ্যতা					
১.	এন.ডি.এ জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমী	৩০০ স্থল সেনা, ১৯৫ বায়ু সেনা ৬৬ নৌসেনা ৩৯ (প্রত্যেক বছর জানুয়ারী এবং জুলাই মাস	১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর	১০+২ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা শ্রেনী কিম্বা সমতুল্য কেবল স্থল সেনার জন্য এবং পদার্থ বিজ্ঞান ও গণিত সহিত কেবল বায়ু সেনা ও নৌসেনার জন্য	অবিবাহিত	কেন্দ্রীয় জনসেবা আয়োগের দ্বারা মার্চ ও অক্টোবর মাসে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।	সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবর মাস জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস	জাতীয় প্রশিক্ষন একাডেমি (NDA) খড়গ ভাঁসলা পুনা	জাতীয় প্রতিরক্ষা একাডেমিতে (NDA) ৩ বছর এবং রাষ্ট্রীয় মিলিটারী একাডেমিতে ১ বৎসর
২.	১০+২ স্তরে বৈশয়িক প্রবেশ যোজনা	৮৫ (প্রতি বৎসর জানুয়ারী এবং জুলাই মাস)	১৬ বছর ৬ মাস থেকে ১৯ বছর ৬ মাস	পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান ও গণিত নিয়ে ১০+২ পাশ মোটামুটি ৭০ শতাংশর বেশী নম্বর রাখা প্রার্থী আবেদন করবে	অবিবাহিত	এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর মাস	আগষ্ট থেকে অক্টোবর ও ফেব্রুয়ারী থেকে এপ্রিল মাস	রাষ্ট্রীয় মিলিটারী একাডেমী দেরাদুন	৫ বছর (রাষ্ট্রীয় মিলিটারী একাডেমীতে ১বছর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকে ৪ বছর, ৪ বছর পরে স্থায়ী কমিশনে।
৩.	আই. এম.এ (ডি.ই) রাষ্ট্রীয় মিলিটারী একাডেমি (শিক্ষাদান)	২৫০ প্রত্যেক বছর জানুয়ারী এবং জুলাই মাস	১৯ বছর থেকে ২৪ বছর	স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ	অবিবাহিত	মার্চ / এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর মাস	সেপ্টেম্বর / অক্টোবর এবং মার্চ / এপ্রিল মাস	রাষ্ট্রীয় মিলিটারী একাডেমি দেরাদুন	১ বছর ৬ মাস
৪.	এস.এস. সি. (এন. টি) স্বল্প মেয়াদী সেবা মিশন (অবৈষয়িক পুরুষ)	১৭৫ প্রত্যেক বছর এপ্রিল এবং অক্টোবর	১৯ বছর থেকে ২৫ বছর	স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক পাশ	অবিবাহিত	মার্চ / এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর/ অক্টোবর মাস	অক্টোবর / নভেম্বর এবং জুলাই/আগষ্ট	ও.টি.এ (চেন্নাই) অধিকারী প্রশিক্ষন একাডেমী চেন্নাই	৪৯ সপ্তাহ

৫.	এস.এস.সি (এন. টি) স্বল্প মেয়াদী সেবা কমিশন (অবৈষয়িক) (মহিলা) বিশেষজ্ঞ অবৈষয়িক সমেত কে এ.জি. প্রবেশের জন্য	প্রত্যেক বছর এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে যত গুলি স্থানের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে	স্নাতক উপাধির জন্যে ১৯ থেকে ২৫ বছর ও স্নাতকোত্তর বিশেষজ্ঞ কে এ.জির জন্যে ২১ থেকে ২৭ বছর	স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিপ্লোমা সমেত স্নাতক স্নাতকোত্তর আইন স্নাতক পাশ	অবিবাহিত	এপ্রিল ও অক্টোবর মাস	নভেম্বর থেকে জানুয়ারী এবং মে মাস থেকে জুলাই	অধিকারী প্রশিক্ষণ একাডেমি (ও.টি.এ চেন্নাই	৪৯ সপ্তাহ
৬.	NCC সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (স্বতন্ত্র) পুরুষ প্রবেশ এর জন্য	৫০ প্রত্যেক বছর এপ্রিল ও অক্টোবর মাস	১৯ থেকে ২৫ বছর	স্নাতক উপাধিতে গড় ৫০ শতাংশ নম্বর রেখে পাশ করবে সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (স্থল) বাহিনী) তে ২ বছরের সেবা সমেত সি. সার্টিফিকেট পরীক্ষায় বি. শ্রেনী প্রাপ্ত হয়ে থাকবে	অবিবাহিত	বিজ্ঞাপন রূপে প্রকাশিত হবে	জানুয়ারী ও আগষ্ট শুধু মহিলাদের জন্য নভেম্বর থেকে জানুয়ারী এবং মে থেকে জুলাই পুরুষের জন্য	অধিকারী প্রশিক্ষন একাডেমি চেন্নাই	৪৯ সপ্তাহ
	NCC সমর শিক্ষার্থী বাহিনী (স্বতন্ত্র) মহিলা প্রবেশ এর জন্য	যতগুলি স্থানের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে							
৭.	কে. এজি (বিচারক মহা অধিবক্তা পুরুষ)	যতগুলো স্থানের জন্য এপ্রিল / অক্টোবর মাসে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে।	২১ থেকে ২৭ বছর	স্নাতক সমেও গড় ৫৫ শতাংশ নম্বর রেখে আইনে স্নাতক / ভারতের যে কোনো রাজ্যের বার কাউন্সিলে নিজের নাম পঞ্জিকৃত করা থাকবে	অবিবাহিত বিবাহিত	“ মে”	জানুয়ারী ও আগষ্ট	অধিকারী প্রশিক্ষন একাডেমী চেন্নাই	৪৯ সপ্তাহ
৮.	ইউ. ই. এস (অনু ইঞ্জিনিয়ারীং সেবা)	৬০ প্রত্যেক বছর জুলাই মাসে	শেষ বছরের জন্য ১৯ থেকে ২৫ বছর প্রাক্ শেষ বছরের জন্য ১৮ থেকে ২৪ বছর	ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী পাঠ্য ক্রমের শেষ বছর বা প্রাক্ শেষ বছরের ছাত্র হওয়া দরকার।	অবিবাহিত	এপ্রিল ও অক্টোবর	শেষ বছরের জন্য জানুয়ারী থেকে মার্চ প্রাক শেষ বছরের জন্য আগষ্ট থেকে অক্টোবর মাস	রাষ্ট্র ত্রয় মিলিটারী একাডেমী	১ বছর

৯.	টি. কি. সি (ইঞ্জিনিয়ারীং তালিম প্রাপ্ত স্নাতক বাহিনী (ইঞ্জিনিয়রীং)	প্রতিবছর জানুয়ারী ও জুলাই মাসে যতটি স্থানের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে	২০ থেকে ২৭ বছর	ইঞ্জিনিয়ারী স্রোতের প্রকাশিত হওয়া বিষয়ের বি.ই./বি. টেক (ইঞ্জিনিয়ারীং) বৈষয়িক স্নাতক)	অবিবাহিত বিবাহিত	পুরুষের জন্য এপ্রিল এবং অক্টোবর ও মহিলাদের জন্য জুন, জুলাই, ডিসেম্বর-জানুয়ারী	মার্চ / এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর / অক্টোবর	রাষ্ট্রীয় মিলিটারী একাডেমী	এক বছর
১০.	টি. কি. সি (শিক্ষা) এ.ই.সি. তালিম প্রাপ্ত স্নাতক বাহিনী (শিক্ষা) স্থল সেনা শিক্ষা বাহিনী	প্রতিবছর জানুয়ারী ও জুলাই মাসে যতটি স্থানের জন্যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে।	২৩ বছর থেকে ২৭ বছর	স্বীকৃতি প্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞাপিত হওয়া বিষয়ে কলা/বিজ্ঞানে স্নাতোকোত্তর পাশ	অবিবাহিত	মার্চ ও আগষ্ট	মার্চ / এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর / অক্টোবর	রাষ্ট্রীয় মিলিটারী একাডেমী	এক বছর
১১.	এস.এস. সি.টি স্বল্পমেয়াদী সেবা কমিশন (বৈষয়িক) (পুরুষ)	৫০ প্রতি বছর এপ্রিল ও অক্টোবর	২০ থেকে ২৭ বছর	বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকা বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারীং উপাধি	অবিবাহিত বিবাহিত	এপ্রিল ও জুলাই	ডিসেম্বর-জানুয়ারী ও জুন-জুলাই	অধিকারী প্রশিক্ষন একাডেমী	৪৯ সপ্তাহ
১১.	এস.এস. সি.টি স্বল্পমেয়াদী সেবা (বৈষয়িক) (মহিলা)	প্রত্যেক বছর এপ্রিল ও অক্টোবর মাসে যতটি স্থানের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে	২০ থেকে ২৬ বছর	বিজ্ঞাপিত হয়ে থাকা বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারীং উপাধি	অবিবাহিত	জানুয়ারী ও জুলাই	এপ্রিলের পাঠ্য ক্রমের জন্য নভেম্বর থেকে জানুয়ারী ও অক্টোবর পাঠ্য ক্রমের জন্য মে থকে জুলাই	অধিকারী প্রশিক্ষন একাডেমী	৪৯ সপ্তাহ

জীবন ও জীবিকা গড়তে সহযোগী

ক্রমিক সংখ্যা	বছর	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স
১	২	৩	৪
১.	সৈনিক (সাধারন কর্ত্তব্য) (স্থলসেনার সব বিভাগের জন্য)	প্রত্যেক বিষয়ে ৩২ শতাংশ এবং গড় ৪৫ শতাংশ নম্বর রেখে এস.এস. এল. সি /ম্যাট্রিক পাশ এব তর্দুদ্ধ	১৭ বছর ৬ মাস থেকে ২১ বছর
২.	সৈনিক (বৈশয়িক) (বৈষয়িক স্থুল সেনা, গোলন্দাজ সেনা)	পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, গণিত ও ইংরাজী বিষয় নিয়ে ১০ + ২ / ইন্টার মিডিয়েট বিজ্ঞান শ্রেনী পাশ।	১৭ বছর ৬ মাস থেকে ২৩ বছর
৩.	সৈনিক কেরানী / বৈষয়িক ভাঁড়ার রক্ষক (স্থুল সেনাদের সমস্ত বিভাগ)	প্রত্যেক বিষয়ে অন্যন্য ৪০ শতাংশ এবং মোটামুটি ৫৪ শতাংশ নম্বর রেখে (কলা, বানিজ্য, বিজ্ঞান) যে কোনো স্রোতের ১০+ ২ ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষার পাশ। উচ্চ যোগ্যতার জন্যে কিছু নির্দ্ধারন হবে না।	১৭ বছর ৬ মাস থেকে ২৩ বছর
৪.	সৈনিক, সেবাকর্ম সহায়ক (স্থুল সেনা, চিকৎসা বাহিনী)	প্রত্যেক বিষয়ে ন্যূনতম ৪০ শতাংশ এবং গড়ে অন্যান ৫০ শতাংশ নম্বর রেখে, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান ও ইংরাজীতে ১০+ ২ / ইন্টার মিডিয়েট পরীক্ষায় পাশ।	১৭ বছর ৬ মাস থেকে ২৩ বছর
৫.	সৈনিক কারিগর (স্থুল সেনার প্রত্যেক বিভাগ)	অমাধ্যমিক	১৭ বছর ৬ মাস থেকে ২৩ বছর
৬.	সৈনিক (সাধারণ কর্ত্তব্য) (স্থুল সেনার প্রত্যেক বিভাগ)	অমাধ্যমিক	১৭ বছর ৬ মাস থেকে ২৩ বছর
৭.	সার্ভেয়ার অটো কার্ডিও গ্রাফার (স্বয়ং হৃদ স্পন্দন লিখন সর্বেক্ষক। (ইঞ্জিনিয়ারস্)	ম্যাট্রিক এবং দ্বাদশ (১০ ২) শ্রেনীতে গনিত ও বিজ্ঞান নিয়ে থাকা স্নাতক, কলা / বিজ্ঞানে গণিত নিয়ে পাশ	২০ বছর থেকে ২৫ বছর
৮.	কে. সি ও (ধার্মিক শিক্ষক) কনিষ্ট কমিশনার অধিকারী (ধার্মিক শিক্ষক) স্থুল সেনার সমস্ত বিভাগ	যে কোনো স্রোতের স্নাতক সহিত নিজ ধর্ম সম্প্রদায়ের ও পরে যোগ্য তা	২৭ বছর থেকে
৯.	কে. সি ও (ক্যাটারিং) কনিষ্ট কমিশনার অধিকারী (খাদ্য সরবারহ) স্থুল সেনার সেবা বাহিনী।	১০ ২ যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রন্ধন কলা হোটেল পরিচালনা, খাদ্য সরবরাহে বৈষয়িক জ্ঞান থাকা ১ বছর বা তদুর্দ্ধ সময় সীমার পাঠ্যক্র / ডিপ্লোমা (সর্ব ভারতীয় বৈষয়িক শিক্ষা পরিষদ) র স্বীকৃত বাধ্যতা মূলক নয়।	২১ বছর থেকে ২৭ বছর
১০.	হাবিলদার শিক্ষক	জি.পি এক্স (সাধারণ পদবী -এক্স) কলা /বিজ্ঞানে স্নাতক উত্তর কিম্বার শিক্ষা তালিম পাঠ্য সহ কলা / বিজ্ঞানে স্নাতক, জি.পি, ওয়াই (সাধারন পদবী -ওয়াই) শিক্ষক তালিম পাঠ্য ক্রম ব্যাতীত কলা / বিজ্ঞান স্নাতক।	(সর্ব ভারতীয় বৈষয়িক শিক্ষা পারিষদ) ২০ - ২৫ বছর

সূচীপত্র

ইতিহাস

অধ্যায়	প্রসঙ্গ	পৃষ্ঠা
প্রথম	ভারতে কোম্পানী শাষন প্রতিষ্ঠা ● ব্রিটিশ শাষনের পূর্বে ভারতের রাজ্যনৈতিক অবস্থা ● বানিজ্যবাদ ও ব্যাবসায়ীক সংঘর্ষ ● ভারতীয় শাষক গণের সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তরের জন্য সংঘর্ষ ● শাষন ব্যবস্থা	১- ১৩
দ্বিতীয়	ভারতের ইংরেজ শাষনের প্রভাব ● শিক্ষা ঃ নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা (বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, বৈষয়িক শিক্ষা) দেশীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন, জাতীয় কিশোর বিকাশ ● নারী এবং সংস্কারঃ সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ ও সংস্কার ● ভারতীয় নবজাগরণ ঃ সামাজিক, ধার্মিক সংস্কার আন্দোলন	১৪-২২
তৃতীয়	ইংরেজ শাষনকে প্রতিরোধ ● জয়ী রাজগুরু ● ওড়িশায় পাইক বিদ্রোহ (১৮১৭) ও বক্সী জগবন্ধুর ভূমিকা	২৩ -৩৫

- ওড়িশায় আদিবাসী বিদ্রোহ
  কন্ধ, ভূইয়াঁ, কোল ও সাঁওতাল ১৮৫৭র বিদ্রোহ
- কারণ ও ফলাফল এবং ওড়িশার ভূমিকা - বীর
  সুরেন্দ্র সাএ।

চতুর্থ ব্রিটিশ অর্থনীতি ও ভারতে এর প্রভাব ৩৬-৪০
- কৃষি ও শিল্পে এর প্রভাব
- কুটীর শিল্পের অবনতি
- বিংশ শতাব্দীতে ভারতে আধুনিক শিল্পের বিকাশ

পঞ্চম ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ৪১-৪৮
- ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকাশের কারন
- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস
- বঙ্গ বিভাজন ; স্বদেশী আন্দোলন

ষষ্ঠ আমেরিকা ও ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিপ্লব ৪৯-৬০
- আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম
- ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব (১৭৮৯)
- জার্মানী একত্রীকরণ ও ইটালী একত্রীকরন

রাজনীতি বিজ্ঞান

অধ্যায় প্রসঙ্গ পৃষ্ঠা

প্রথম কেন্দ্র সরকার ৬২-৮৫
কার্য্যপালিকা, ব্যবস্থাপিকা ও ন্যায় পালিকা - রাষ্ট্রপতি
উপরাষ্ট্র পতি, মন্ত্রীপরিষদ ও প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা, রাজ্য সভা
সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়

দ্বিতীয়	রাজ্য সরকার	
	● কার্য্য পালিকা, ব্যাবস্থাপিকা ও ন্যায় পালিকা - রাজ্য পাল, মন্ত্রী পরিষদ, মুখ্যমন্ত্রী, বিধান সভা ও বিধান পরিষদ, উচ্চ ন্যায়ালয় ও অধস্তন ন্যায়ালয়	
	● কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক, ব্যবাস্থাপিকা, প্রশাসনিক ও আর্থিক সম্পর্ক	
তৃতীয়	জেলা প্রশাসন	১০৪ - ১০৯
	জেলা পালের ভূমিকা, জেলা গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা	
চতুর্থ	ভারতে রাজনৈতিকদল ও চাপদায়ী গোষ্ঠি	১১০-১১৬
	জাতীয় ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল	
	চাপদায়ী গোষ্টি ঃ অর্থ ও প্রকার ভেদ	

ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

ভারতের কোম্পানী শাসন প্রতিষ্ঠা

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা ঃ

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে পরিবর্তন এক গতানুগতিক প্রক্রিয়া, মধ্যযুগীয় রাজনৈতিক দৃশ্য পটে মোগল সাম্রজ্য প্রতিষ্ঠাতা রূপে বাবরের আবির্ভাব হয়েছিল। এই মোগল সাম্রাজ্য ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরেও প্রায় দীর্ঘ দেড়শ বছর টিকে ছিল। রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের মধ্যে প্রতিষ্টিত বিশাল সাম্রাজ্য খন্ড খন্ড হয়ে গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাবে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ও বিভাজন এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে পাশ্চাত্য শক্তি গনের উৎথান হল। এর সঙ্গে ভারতে আধুনিক যুগের আরম্ভ হলো।

মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সময়ে মারাঠা, শিখ ও জাঠেরা বিদ্রোহ করেছিল। বিদ্রোহ দমন ও শান্তি স্থাপনে বিফল হয়ে ঔরঙ্গজেব শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীরা খুবই দুর্বল ও অযোগ্য ছিলেন। তাঁরা আমীরদের সাহায্যে শাসন পরিচালনা করতেন। ওদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে আমীর ও সম্ভ্রান্তরা নিজ নিজ স্বার্থ গোছাতে লাগল। এই আমীর গন দুরানী- ইরানী ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি দলে বিভক্ত হয়ে মোগল দরবারকে দুর্বল করে রাজনৈতিক লাভ হাসিল করে ফেলল। ফলে কেন্দ্রীয় শাসন দূর্বল হয়ে গেল। প্রাদেশিক শাসন কর্তারা স্বাধীন রাজ্য গঠনে আগ্রহী হলেন।

দাক্ষিনাত্য সুবা নিজাম-উল মুলকের চেষ্টায় স্বাধীনতা লাভ করেছিল। তিনি মোগল সৈন্য বাহিনীর উচ্চ পদে থেকে ''কুলি খাঁ" উপাধি পেয়েছিলেন। মোগল শাসকের দ্বারা তিনি দাক্ষিনাত্যে গর্ভনর হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। পরে তিনি সেখানে নিজের কতৃত্ব বিস্তার করেন। তাঁর এই আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে মোগল সম্রাট হায়দ্রাবাদের শাসক মুবারিক খাঁ কে দাক্ষিনাত্যে পাঠালেন নিজম-উল-মূলক মুবারিক খাঁ কে হত্যাকরে 'আসফ জাহ' উপাধি গ্রহন করে স্বাধীন ভাবে দাক্ষিনাত্যে শাসন করতে লাগলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ইউরোপীয় কোম্পানীরা এই সুবার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করে ছিল।

অযোধ্যার সুবা অযোধ্যা, বেনারস, এলাহাবাদ ও কানপুর নিয়ে গঠিত হয়েছিল, সাদত খাঁ এর সুবেদার ছিলেন। তাঁর পরে সফদর জং অযোধ্যার শাসক হলেন। পরবর্তী কালে তিনি দিল্লীর উজির (প্রধান মন্ত্রী) হয়েছিলেন। তাঁর পরে তার পুত্র সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব হলেন। বিরা এক শক্তিশালী সৈন্য ব্যাহিনী গঠন করে উত্তর ভারতের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

> *তুমিজানকি?*
>
> **মোগল সম্রাট গন শাসনের ক্ষেত্রে কিছু পদবী সৃষ্টি করে ছিলেন। উজির পদবী ধারী ব্যাক্তি প্রধান মন্ত্রী হতেন। অর্থ ও রাজস্ব বিভাগ তাঁদের হাতে থাকতো। সম্রাটের অনুপস্থিতিতে তাঁর হয়ে কার্য্য করতেন ও মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারতেন। মোগল সম্রাটগন প্রাদেখিস শাসন কার্য্য সাধারণতঃ দুধরনের কর্মচারীদের ওপর ন্যাস্ত করতেন। তাঁরা হলেন সুবেদার ও দেওয়ান। সুবেদার নিরাপত্তা, ফৌজদারী মকদ্দমা ও পুলিশের কাজ তরারক করতেন। দেওয়ান রাজস্ব ও তৎসম্পর্কীয় মামলা পরিচালনা তদারক করতেন।**

দিল্লীর উত্তরে লাহোর ও সুলতান মোগলের শাসনাধীন ছিল। মোগল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমন করেন। তিনি লাহোর অধিকার করে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসহ হলেন।

পানিপথ থেকে কিছু দূরে কর্নালে মোগল সেনারা তাকেপ্রতিরোধ করল।

নাদির সাহ মোগল সেনাকে পরাস্ত করে পরাজিত মোগল সম্রাট মহম্মদ শাহ কে নিয়ে দিল্লীতে প্রবেশ করল। বহুদিন দিল্লী অধিকার করে সেখানে লুণ্ঠন ও নরহত্যা চালালো। দিল্লী নগরী শ্মশানে পরিণত

আদির সাহঁ

হল। অবশেষে দিল্লীকে লুণ্ঠন করে, শাহোজাহান নির্মিত ময়ূর সিংহাসন কোহিনূর হীরে, হস্তী ও অশ্বগুলো নিয়ে পারস্যে ফিরে গেলেন। রাজ পুতেরা আকবরের সময়ে মোগল সম্রাটদের দৃঢ় সমর্থন দিয়ে এসেছেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের সংকীর্ণ ধর্ম বিদ্বেষ নীতির জন্যে রাজ পুতের মোগলদের শত্রু হয়েগেলেন।

তুমি জান কি ?

শাহজাহান ময়ুর সিংহাসন নির্মান করেছিলেন। হীরে, নীলা, মুক্তো, মানিক্য খচিত এই সিংহাসন এক লক্ষ কোটি টাকা ব্যায়ে সাত বছরে নির্মিত হয়েছিল।

তোমার জন্য কাজ ?

নাদির শাহ কোন রাস্তা দিয়ে দিল্লী প্রবেশ করেছিলেন, তার কেটি রেখা মানচিত্র আঁকো।

ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে রাজ পুতেরা মেত্ত্বার (উদয়পুর) মারওয়াড়া (যোধপুর) ও অম্বর (জয়পুর) নামক স্বাধীন রাজ গঠন করলেন। মাড়ওয়াড়ের রাজা অজিত সিং গুজরাট ও আজমীরের শাসন কর্তা হলেন। তিনি আগ্রার শাসন দায়িত্বও গ্রহন করেছিলেন।

তিনি দিল্লী, জয়পুর, বেনারস, মথুরা ও উজ্জয়িনীতে জ্যোতি বিজ্ঞানের পর্য্যাবেক্ষনাগার স্থাপন করেছিলেন।

রাজপুতেরা মারাঠা ও জাঠেদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখায় এদের উত্থান সম্ভব হলো না।

গুরু গোবিন্দ সিং শিখেদের সংগঠিত করে এক যোদ্ধা বাহিনী গঠন করেছিলেন। তাঁর পরে বান্দা বাহাদুর শিখেদের নেতৃত্ব নিয়ে লাহোর অধিকার করেছিলেন। শিখরা ঝিলম থেকে সতলেজ নদী পর্যন্ত্য বিস্তৃত ভুখন্ডকে নিজেদের অধীনস্ত করে ছিলেন। কিন্তু কোনো রাজ্য গঠন করতে সক্ষম হয় নি। শিখরা বারোটি সংঘে সংগঠিত হয়েছিল। প্রত্যেক সংঘ কে মিসল বলা হোতো। আফগানী রাজা আহম্মদ সহ আবদালী এই মিসল গুলি ধ্বংস করার চেষ্টা করে বিফল হয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করে ছিলেন।

তুমি জান কি ?

শিখ সর্দারো নিলাম থেকে সতলেজ নদী পর্য্যন্ত ভূখন্ড নিজের অধিকারে নিলেও কোনো রাজ্য গঠন করতে পারেনি। কিন্তু তারা বারোটি সংগঠন করে সিল নামাঙ্কিত করেছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ রনজিৎ সিংহ এই মিসল গুলি একত্রিত করে এক শক্তিশালী রাজ্য গঠন করে ছিলেন। ঔরঙ্গজেবের সময়ে শিবাজী মারাঠ শক্তিকে একত্রিত করে মারাঠা রাজ্য গঠন করেছিলেন। তাঁর পরে পুত্র শম্ভুজী কে মোগলরা হত্যা করে এবং তার পুত্র শাহুজীকে বন্দী করে রেখেছিল। ঔরঙ্গজেবের পরে মারাঠারা আবার শক্তিশালী হয়ে শাহুজীকে কারা মুক্ত করে, শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারাম কে রাজা করা লেন। রাজারাম ও শাহুজীর মধ্যে সিংহাসনের জন্য গৃহযুদ্ধ হলো। পেশওরা বালাজী বিশ্বনাথের সাহায্যে শাহুজী সিংহাসন অধিকার করলেন। রাজারামের মৃত্যুর পরে তাঁর বিধবা পত্নী নিজের নাবালক পুত্র তৃতীয় শিবাজীকে শোলাপুরের সিংহাসনে বসিয়ে নিজে রাজপ্রতিনিধি রূপে শাসন চালালেন।

তাঁর নেতৃত্বে মারাঠ বাহিনী সাহস ও উৎসাহের সহ মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। মারাঠা রাজ্য অধিকারের জন্য তারাবাই ও শাহুজীর মধ্যে গৃহযুদ্ধ লেগেছিল। শাহুজী তাঁর বিশ্বস্ত (প্রধানমন্ত্রী) পেশওয়া

বালাজী বিশ্বনাথের সহায়তায় সিংহাসন অধিকার করেলেন। শাহুজী কে নাম মাত্রে রাজা করে বালীজী নিজে শাসন চালাতে লাগালেন। সেদিন থেকে পেশওয়া পদ পুরুষানিক ক্রম হলো। বালাজীর পরে প্রথমে বাজীরাও মারাঠদের শাসক হলেন, তাঁর পরে মারাঠা শক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে আফগান রাজা আহম্মদ শাহ আবদালী মারাঠা রাজ্য আক্রমন করলো, শেষে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হলো। ফলে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের আশা ক্ষীন হয়ে গেল।

তুমি জান কি?

মারাঠা শাসকরা তাঁদের রাজ্য শাসনের জন্য নিযুক্ত করা প্রধান মন্ত্রীকে পেশত্বা পদবী দেওয়া হতো। শাসন কার্য্য ও জননহতকর কার্য্য তার দায়িত্বে ছিল।। প্রচ্ছাদের প্রতি যেকোনো মিছেল, তার দস্তমতে হতো।

বানিজ্যবাদ ও ব্যবসায়িক সংর্ঘষ -

প্রাচীন যুগ থেকেই ভারতের সঙ্গে ইউরোপীয় দেশের বানিজ্য চলতো জলপথ ও স্থল পথের মাধ্যমে। আরবীয় বনিকেরা ভারত থেকে জিনিষ কিনে রোমের বনিকদের বিক্রী করতো। রোমীয় বনিকরা চড়া দামে সেসব পশ্চিম ইউরোপে বিক্রী করতো। কনস্ট্যান্টিনোপেলের মধ্যে দিয়ে ইউরোপের সঙ্গে বানিজ্য কারবার হতো।। ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা কনস্ট্যান্টিনো পল অধিকার করে নেওয়ার পরে ভারতও ইউরোপের মধ্যে বানিজ্য কারবার বাধা প্রাপ্ত হলো।

তুমি জান কি?

কনস্ট্যান্টিনোপল (আধুনিক ইস্তানবুল) তুর্কী রাজ্যের প্রাচীন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বানিজ্য স্থল ছিল। মুসলমানদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অটোমান সাম্রাজ্যের সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপেল অধিকার করেছিলেন।

ইউরোপে নবজাগরনের জন্য কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন বিশেষ ভাবে সহায়ক হয়ে ছিল।

সুতরাং তারা ভারতের সঙ্গে সিধে প্রত্যক্ষ ভাবে বানিজ্যের পথ খুঁজতে চেষ্টা করতে লাগল।

ভাস্কো-ডা-গামা

পর্তুগীজরা প্রথমে ভারতে এসে ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্য সফল করল।

পর্ত্তুগীজ - ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামা উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থ কালিকট (কোঝি কোড্) পৌঁছালেন। জামোরিন উপাধি ধারী একজন হিন্দুরাজা এখানকার শাসন ছিলেন। ভাস্কো ডা গামা জামোরিনের দরবারে পৌঁছে পর্ত্তুগীজদের বানিজ্য করার অনুমতি চেয়েছিলেন। রাজা তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে পর্তুগীজদের বানিজ্য করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এর ফলে পর্ত্তুগীজরা ভারতে বানিজ্য, কুঠি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ভারতের গোয়া, দামন, দিউ, সালসেট বেসিন, বম্বে এবং বঙ্গের হুগলী তে বানিজ্য কুঠি নির্মান করে ভারতে পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

ভারতে পর্ত্তুগীজ অধিকৃত অঞ্চলের গভর্নর হিসেবে আলবুকার্ক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি এক বিরাট নৌশক্তি গঠন করে পর্ত্তুগীজদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পর্ত্তুগীজেরা জলদস্যু বৃত্তি করে এবং অন্য দেশের বানিজ্য তরী লুণ্ঠন করে নিজেদের ব্যবসার প্রসার করে চললো। ভারতীয়দের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করিয়ে খ্রীষ্ট ধর্মের প্রসার করলো। যার ফলে মোগল সম্রাটেরা তাদের বাধা দিতে লাগলো। শেষে ইংরেজ ও ডাচ্ বা ওলন্দাজদের সঙ্গে প্রবল প্রতিবন্ধিতার সম্মুখীন হয়ে তাদের বানিজ্য কুঠি হারিয়েছিল।

১৯৬১ সাল পর্য্যন্ত গোয়া, দামন, দিউ পর্ত্তুগীজদের

তুমি জান কি ?

উপনিবেশ স্থাপন বলতে অন্য দেশে বসতি স্থাপন করা ও বানিজ্য প্রসারের জন্য বানিজ্য কুঠি নির্মান করার সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তার করা বোঝায়।

অধিকারে ছিল। সেই বছরেই স্বাধীন ভারত সরকার এই অঞ্চলগুলি অধিকার করে নেওয়ায় তাদের উপনিবেশ ভারত থেকে লোপ পেয়ে গেল।

ওলন্দাজ - ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে হল্যান্ড (অধুনা নেদারল্যাণ্ড দেশের অধিবাসী ডাচ্ বা ওলন্দাজেরা ভারতের সঙ্গে বানিজ্য করা প্রয়াসে নৌযাত্রা আরম্ভ করেছিল। ১৬০২ সালে তারা ডাচ্ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গঠন করেছিল। ভারতে প্রবেশ করার পর তারা পর্ত্তুগীজ দের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হলো। তারা পর্ত্তুগীজ দের সঙ্গে সংঘর্ষ করে ওদের অনেক কুঠি দখল করে নিল। গুজরাট, করমন্ডল, কোচিন, প্রভৃতি স্থানে তারা বানিজ্য কুঠি স্থাপন করল। ভারতে এক চেটে বানিজ্য করে সাম্রাজ্য বিস্তার করার চেষ্টা করার সময় ইংরেজদের সঙ্গে তাদের প্রবল সংঘর্ষ হয়েছিল। শেষে ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়ে তারা ভারত ছেড়ে জাভা ইন্দোনেশিয়া সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলে বানিজ্য বসতি করে।

দিনেমার - ডেনমার্কের লোকেদের ডেনিস বা দিনেমার বলা হয়। তারা ও বানিজ্যিক কোম্পানী করে ভারতে বানিজ্য করতে এসেছিল। বঙ্গদেশের শ্রীরামপুরে বানিজ্যকুঠি স্থাপন করেছিল পরে ইংরেজদের কাছে বানিজ্য কুঠি বিক্রি করে ভারত থেকে চলে গেল।

ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ঃ ইংল্যান্ডের রানী প্রথম এলিজাবেথের রাজত্ব কালের শেষ ভাগে ইংল্যান্ডের একদল বনিক ও নাবিক প্রাচ্য দেশের সঙ্গেঁ বানিজ্য করার অনুমতি ভিক্ষা করেছিল। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে রানী তাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করেন এবং প্রাচ্যে বানিজ্য করার জন্য সম্পদ প্রদান করেন। রানীর নিকট থেকে সম্পদ পাওয়া কোম্পানী ব্রিটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নামে নামাঙ্কিত হয়েছিল। ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্ কোম্পানীর ক্যাপ্টেন হকিন্স কে জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠিয়ে ছিলেন। হকিন্সের অনুরোধে ক্রমে জাহাঙ্গীর ইংরেজদের সুরাটে স্থায়ী বসতি স্থাপনের আদেশ পত্র দিয়েছিলেন। এর কিছুদিন পরে ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের রাজদূত স্যার টমাস রো, জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে জাহাঙ্গীরের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কে স্থাপন করেছিলেন এবং নানা প্রকার বানিজ্যের সুবিধের জন্য কুঠি নির্মানের অধিকার হাসিল করেন।

ফলে ইংরেজরা ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল তথা দেশের দূরবর্ত্তী স্থান গুলিতে বানিজ্য কুঠি নির্মান করে ছিলো। তাদের মধ্যে মসলিপট্টম, মহানদীর মোহনায় স্থিত হরিপুর, বালেশ্বর, হুগলী, পাটনা ও কাশিম বাজার প্রভৃতি উল্লেখ যোগ্য। মাদ্রাজ, বম্বে ও কলিকাতা ইংরেজদের

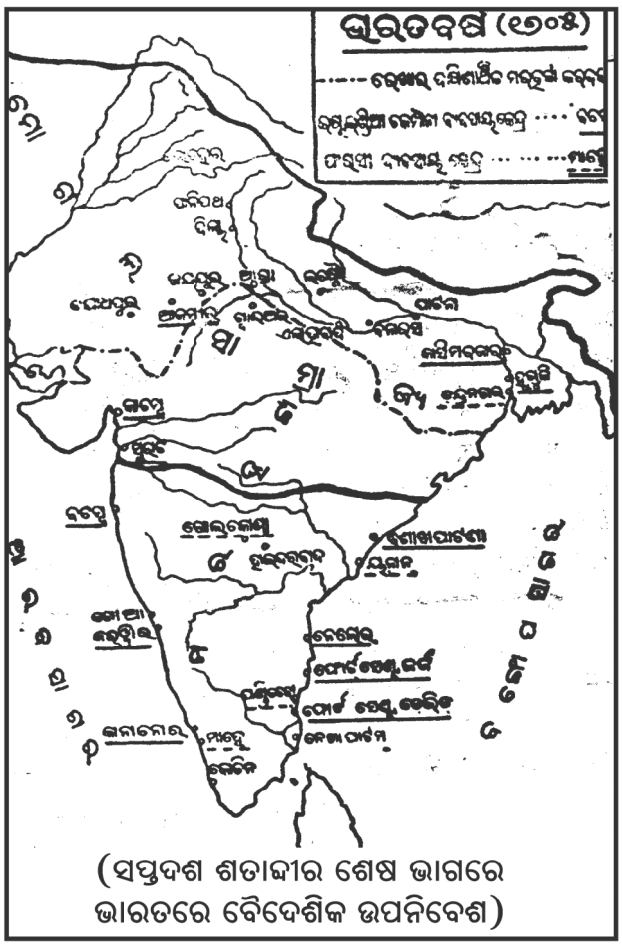

(ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ
ଭାରତରେ ବୈଦେଶିକ ଉପନିବେଶ)

প্রধান বানিজ্য কেন্দ্র ছিল।

১৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংজেরা মাদ্রাজে ফোর্ট সেন্ট জর্জ নির্মান

করেছিলেন। এটি বর্তমানে তামিল নাড়ুর চেন্নাইয়ে অবস্থিত। সেই রকম পর্ত্তুগীজ রাজা ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চালর্সকে বম্বে যৌতুক রূপে দিয়ে ছিলেন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে হস্তান্তর করায়, ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বানিজ্য কুঠি ১৬৬৮ সালে এখানে গড়ে উঠলো। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বাংলার হুগলী নদীর (গঙ্গা) ধারে ''ফোর্ট উইলিয়াম'' দুর্গ নির্মান করে। মোগল সম্রাটদের প্রভাবিত করে এবং ইংরেজ কর্মচারী দের উৎকোচ (ঘুষ) দিয়ে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর গ্রামের জমিদারী প্রাপ্ত করলো।

তোমার জন্য কাজঃ

ইউরোপের মানচিত্রে ইংল্যান্ড, হল্যান্ড, ফ্রান্স, পর্ত্তুগাল ও ডেনমার্ক দেশগুলি বেং তাদের রাজধানী সকল চিহ্নিত কর।

ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দ্দশ লুইয়ের মন্ত্রী কোলবার্টের পৃষ্টপোষকতায় ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ''ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী'' গঠিত হয়েছিল। মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অনুমতি পেয়ে ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সুরাটে বানিজ্য কুঠি নির্মান করেছিল। পরে কোম্পানী মসিলিপট্টম, পন্ডিচেরী ও বাংলার চন্দননগরে বানিজ্য কুঠি নির্মান করল। ফ্রাঙ্কোয়মার্টিন নামে এক ফরাসী ব্যাক্তি বিজাপুর রাজার কাছ থেকে পণ্ডিচেরী (পুদুচেরি) হাসিল করে সেখানে ইউরোপীয় সৈন্য ও পাঁচশো ভারতীয়কে পাশ্চাত্য যুদ্ধরিতী শিক্ষা দিলেন। পন্ডিচেরী ফরাসীদের সামরিক শিবির রূপে ব্যবহৃত হলো। পরে ফ্রান্সের বিচক্ষন রাজনীতি ও ড্যুপ্লে চন্দননগরের শাসন কর্ত্তা রূপে নিযুক্ত হলেন। তিনি অনুভব করলেন যে ইংরেজদের প্রতিহত করতে পারলে ভারতে সাম্রাজ্য গঠন করা সম্ভব হবে।

যার ফলে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘর্ষ শুরু হলো।

বনিক গোষ্ঠী সংঘর্ষ - ভারতে বানিজ্য করা ও রাজ্য বিস্তার করার জন্যে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের সুত্রপাত হয়ে ছিল। তামিল নাড়ুতে ইংরেজদের বানিজ্য দূর্গ মাদ্রাজে ও ফরাসীদের দূর্গপন্ডিচেরীতে অবস্থিত ছিল। দাক্ষিনাত্যে নিজের প্রভাব বিস্তারে উভয়ে বেষ্টিত হলো এবং যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ন হলো।

প্রথম কর্নাট সমর (১৭৪০-১৭৪৮) ঃ অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ ইউরোপে সংগঠিত হয়েছিল। সেই যুদ্ধ ফরাসী ও ইংরেজরা দুই বিপরীত পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছিল। এবং তাঁর প্রভাব ভারতে ও প্রতিফলিত হয়েছিল।

ইংরেজরা প্রথমে ফরাসীদূর্গ পন্ডিচেরী আক্রমন করলো। ফরাসী সেনাবাহিনীকে ডুপ্লে পরিচালনা করে ইংরেজদের হাটিয়ে দিয়ে ইংরেজ দূর্গ মাদ্রাজ অধিকার করে নিল। ঠিক এই সময়ে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসী দের মধ্যে শান্তিচুক্তি হলো। এই চুক্তি অনুযায়ী ভারতেও তাদের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি হয়ে গেল। ড্যুপ্লে বাধ্য হয়ে ইংরেজদের মাদ্রাজ দূর্গ ফিরিয়ে ছিলেন।

দ্বিতীয় কর্নাট সমর (১৭৫০ - ১৭৫৪) - শান্তি চুক্তি অনুযায়ী ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শত্রুতার অবসান ঘটলেও, হাইদ্রাবাদ ও কর্নাটকের নবাবের পদের জন্য তারা পুরনায় সংঘর্ষে অবতীর্ণ হলো। কর্ণাটকের নবাবের জ্যন ইংরেজরা আনোয়ার কে সমর্থন করার ক্ষেত্রে ফরাসীরা চান্দাসাহেব কে সমর্থন করতো। ফলে যুদধ আরম্ভ হলো যুদ্ধে আনোয়ারউদ্দিন পরাস্ত ও নিহত হন। চান্দা সাহেব কর্ণাটকের নবাব হলেন।

এদিকে হায়দ্রাবাদের সিংহাসনের জ্যন নিজামের পুত্র নাসিরজঙ্গ ও নাতি মুজাফর জঙ্গ কলহে জড়িয়ে পড়ল। ইংরেজরা নাসিরজঙ্গ ও ফরাসীরা মুজাফরজঙ্গ কে সমর্থন করে যুদ্ধে অবর্তীন হল ফরাসী গভর্নর ড্যুপ্লের ষড়যন্ত্রে

নাসির জঙ্গ পরাস্ত ও নিহত হলেন। মুজাফরজঙ্গ হায়দ্রাবাদের নিজাম হলেন। এর ফলে ভারতে ফরাসী শক্তি বৃদ্ধি পেল। এই সময় ইংরেজের চতুর এবং বিচক্ষন যুব ক্লাইভ সেনাবাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব বহন করলেন। ক্লাইভের পরিচালনায় ইংরেজ বাহিনী কর্নাটকের রাজধানী আর্কট অধিকার করেনিল।

আনোয়ার উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলী কে কর্ণাটকের নবাব করা হলো। ক্লাইভের নেতৃত্বে ইংরেজদের প্রভাব বৃদ্ধি পেল। এই সময় ফ্রান্সের সরকার ড্যুপ্লেকে ফ্রান্সে ফিরিয়ে নিল।

ড্যুপ্লে ভারত থেকে চলে যাওয়ার পর ফরাসীরা দুর্ব্বল হয়ে পড়ল। ওদের ক্ষমতা লেগে গেল।

তৃতীয় কর্ণাটসমর (১৭৫৮)ঃ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সপ্ত বর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ লাগলো। এর প্রতিক্রিয়া ভারতেও প্রতিফালিত হলো। ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ক্লাইভ ১৭৫৭ সালে ফরাসী বানিজ্য কুঠি চন্দননগর অধিকার করে নিলেন। ফরাসী সরকার যুদ্ধ পরিচালনার জন্যে কাউন্ট ডি লালীকে ভারত পাঠালো। কাউন্ট ডি লালী ১৭৫৮ সালে সেন্ট ডেভিড দুর্গ অধিকার করলো। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাপতি আয়ার কুট ওয়ান্ডি ওয়াস যুদ্ধে ডিলালীকে পরাস্ত করলেন। পন্ডিচেরী ও সাহে ইংরেজদের অধিকৃত হলো।

দাক্ষিনাত্যে ইংরেজ দের ক্ষমতা বিস্তার হলো। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপে সপ্তবর্ষীয় যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটায় ফরাসীর সন্ধি শর্ত্তানুযায়ী তাদের উপনিবেশ সব ফিরে পেল। এই কর্ণাট সমরের পরে ইংরেজরা অধিক শক্তি শালি হয়ে বঙ্গ দেশে ক্ষমতা বিস্তারের প্রয়াস করলো।

ভারতীয় শাসক গনের সঙ্গে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সংঘর্ষঃ আলিবর্দ্দী খাঁ ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে বাংলার নবাব বলে ঘোষনা করলেন। ১৭৪০ থেকে ১৭৫৬ সাল তিনি বঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশার শাসন কর্ত্তা হয়েছিলেন। তিনি ইউরোপীয় বনিকদের নিজ আয়ত্তে রেখে ছিলেন। নিজের রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্যাম করে ১৭৫৬ এপ্রিল ৯ তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুর পরে তার নাতি সিরাজদৌল্লা বঙ্গের নবাব হলেন। নবাব হওয়ার পরে তাঁর জ্ঞাতি গুষ্টি শত্রুতা সুরু করতে লাগলেন। সিরাজ নিজের বুদ্ধি প্রয়োগ করে তাদের পরাস্ত

ও কর গত করলেন। কিন্তু ইংরেজদের ঔদ্ধত্য তাঁর অসহ্য লাগল ইংরেজরা তাঁর অনুমতি ছাড়াই, কলিকাতায় দুর্গ নিমার্ণ ও সম্প্রসারণ কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। বানিজ্য সুবিধার অপ ব্যবহার করতে লাগল। সিরাজ এই দুর্গ নির্মান না করতে আদেশ দিলেন। ইংরেজরা তার আদেশ না মানায় সিরাজ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আক্রমন করলেন। সিরাজের আক্রমনের ভয়ে ইংরেজ গর্ভনর ড্রেক ও তার অনুগামী গন নদী পার হয়ে পালিয়ে গেলেন, ড্রেকের স্থানে হনওয়েলও আরও কয়েকজনকে বন্দী করে এক অন্ধকার ঘরে আবদ্ধ করে রাখলেন। বন্দীরা সেই ঘরে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গেল।

এটা অন্ধকূপ হত্যা নামে পরিচিত। সিরাজের কলিকাতা আধকারের খবর পেয়ে ক্লাইভ এবং ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন্ মাদ্রাজ থেকে কলিকাতা এলেন। কলিকাতা পৌঁছে ক্লাইভ চন্দন নগর অধিকার করে সিরাজের সঙ্গে সন্ধি করলেন। ফলে ইংরেজরা করিকাতায় দূর্গ নিমানের অনুমতি পেয়ে ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মিরজাফর ও রায় দুর্লভ সিরাজকে সিংহাসন থেকে

তুমি জান কি?

সিরাজদ্দৌলা ২৫শে জুন ১৭৫৬ তে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গের মধ্যে ১৮ ফুট লম্বা ও ১৪ ফুট ১০ ইঞ্চি প্রস্থের একটি অন্ধকার কক্ষে ১৪৬ জন ইংরেজকে বন্দী করে রেখেছিল। প্রচন্ড উত্তাপ ও তৃষ্ণায় শ্বাস রূদ্ধ হয়ে ১২৩ জন প্রান ত্যাগ করেছিল। একে ইংরেজার ''অন্ধ কূপ হত্যা'' নামে নামিত করেছিল।

বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করলেন। এই ষড় যন্ত্রে ক্লাইভ সামিল হলেন। ক্লাইভ এবং ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন্ মাদ্রাজ থেকে কলিকাতা এলেন। কলিকাতা পৌঁছে ক্লাইভ চন্দন নগর অধিকার করে সিরাজের সঙ্গে সন্ধি করলেন। ফলে ইংরেজরা কলিকাতায় দূর্গ নির্মানের অনুমতি পেয়ে ছিলেন। সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মিরজাফর ও রায় দূর্লভ সিরাজকে সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করার ষড়যন্ত্র করলেন। এই ষড়যন্ত্রে ক্লাইভ সামিল হলেন। ক্লাইভ সিরাজ কে তাড়িয়ে মীর জাফরকে নবাব করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

পলাসীর যুদ্ধ ঃ ইংরেজ ও সিরাজের মধ্যে হওয়া সন্ধি, সিরাজ অবমাননা করেছেন অভিযোগ করে ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করলেন। ভাগীরথী নদীর কূলে পলাশী নামক স্থানে ১৭৫৭ জুন ২৩ তারিখে সিরাজ ও ক্লাইভের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে মীরজাফর ও রায় দুর্লভ বিশ্বাস ঘাতকতা করলো। তারা যুদ্ধ না করে নীরব দ্রষ্টার অভিনয় করে গেলেন। ফলতঃ সিরাজ এই যুদ্ধে পরাস্ত হলেন। ইংরেজরা সিরাজ কে মুর্শিদাবাদে বন্দী করে রেখে ছিলেন। মীরজাফরের পুত্র মিরন, বন্দী শালায় সিরাজকে হত্যা করেন। এই যুদ্ধ পলাসীতে হওয়ায় একে পলাশী যুদ্ধ বলা হয়। যুদ্ধের পরে ইংরেজরা মীরজাফরকে বঙ্গের নবাব করেছিল।

মীরজাফর ঃ মীরজাফর নবাব হওয়ার পর ক্লাইভ ও অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের প্রচুর অর্থ প্রদান

করেছিলেন। ইংরেজদের চব্বিশ পরগনা অঞ্চলকে জমিদারী ভাবে দিয়ে দিয়েছিলেন। কোম্পানীর কর্ম চারীদের সন্তুষ্ট করতে বারম্বার অর্থ দিতে হওয়ায় তাঁর আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লো। এমনকি সৈন্যদের মাইনে দেবার মতো অর্থ ও রইল না। এই সময় ক্লাইভ ইংল্যান্ডে ফিরে গেল। ইংরেজ কর্মচারীরা অধিক বিশৃঙ্খল হয়ে অধিক অর্থের লোভে মীরজাফর কে সিংহাসন থকে বিতাড়িত করে তাঁর জামাই মির কাশিম কে সিংহাসনে বসালো।

মীরকাশিম ঃ মীরকাশিম নবাব হওয়ার পরে স্বাধীন ভাবে শাসন করা স্থির করলেন। ইংরেজদের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে শাসন বাজায় রাখার জন্য তিনি রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে তুলে নিয়ে মুঙ্গের চলে গেলেন। শাসন ক্ষেত্রে কিছু কর্মচারীদের অপসারন করেছিলেন। সেই সময় কেবল ভারতীয় বনিকরা বানিজ্য কর দিতেন। কিন্তু কোম্পানীর বনিকরা বানিজ্য কর ছাড় পেতেন। মীরকাশিম ভারতীয় বনিকদের বানিজ্য কর ছাড় করেছিলেন। ফলে ইংরেজ বানিজ্য কারবারে বাধা সৃষ্টি হলো। ইংরেজরা মীরকাশিম কে নবাব পদ থেকে অপসারন করার জন্যে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করলো। যুদ্ধে মীরকাশিম পরাস্ত হয়ে অয্যোধ্যার নবাবের কাছে আশ্রয় নিয়ে থেকে গেলে।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মীরকাশিমকে সাহয্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন, মোগল সম্রাট শাহ আলম মীরকাশিমের সাহায্যের জন্য হাত বাড়ালেন। এবার মোগল সম্রাট শাহ আলম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও মীর কাশিম মিলিত ভাবে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিলেন।

বক্সার যুদ্ধ ঃ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের বিরোধিতায় বঙ্গের নবাব মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও

মোগল সম্রাট শাহআলম মিলিত ভাবে বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলো। একে বক্সার যুদ্ধ বলা হয়। এইযুদ্ধে ইংরেজরা বিজয়ী হলো। সুজাউদ্দৌলা ইংরেজের কাছে আত্ম সমর্পন করলেন। ইংরেজরা তাঁকে সসম্মানে অযোধ্যার নবাব করলেন। ভারতীয় শাসকদের মিলিত ত্রিশক্তি ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সামরিক শক্তি দ্বারা পরাজিত হওয়ার ফলে ভারতে কোম্পানীর শাসন সুদৃঢ় হোলো।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন কার্য্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলো। কোম্পানীকে শৃঙ্খলিত ভাবে পরিচালনা করার জন্যে ক্লাইভকে পূণর্বার বঙ্গের গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করা হল। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ বঙ্গের গভর্নর হিসেবে ভার গ্রহন করলেন। প্রথমে তিনি বাহ্য ও আভ্যন্তরীন সমস্যা গুলির সম্মুখিন হলেন। ক্লাইভ প্রথমে কাউন্সিলার সদস্যদের এজেন্সি প্রথা রদ করে দিলেন। কাউন্সিলার সদস্যরা কিম্বা কর্মচারীরা কোনো উপহার বা সুবিধা গ্রহন করতে পারবেনা বলে আইন করে দিলেন। কর্মচারীদের অবৈধ বানিজ্য ব্যবসায় বন্ধ করে ছিলেন। সামরিক কর্মচারীদের প্রাপ্য ভাগ প্রথার পরিবর্ত্তন করা হল।

বক্সার যুদ্ধের পরে ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে এক চুক্তি সাক্ষর করেছিলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী অযোধ্যার নবাব কোরা ও এলাহাবাদ ইষ্ট ইন্ডিয়াকে হস্তান্তর করলো। যুদ্ধের ক্ষতি পূরণ বাবদ নবাব ইংরেজদের পঞ্চাস লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলো। নিজের নিরাপত্তার দায়িত্বর জন্য নিজের খরচে নিজের রাজ্যে ইংরেজ সৈন্যদের রাখতে হলো। ফলে অযোধ্যায় ইংরেজদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হোলো। ক্লাইভ চুক্তি অনুযায়ী মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বঙ্গ, বিহার এবং ওড়িশার দেওয়ানী লাভ করলো। এর দ্বারা এই অঞ্চলের রাজস্ব আদায় করার ভার কোম্পানী নিজের হাতে নিলো।

দ্বৈত শাসন ঃ বক্সার যুদ্ধের পরে ইংরেজরা বঙ্গের প্রকৃত শাসক হলেন। ক্লাইভ বঙ্গের শাসন ব্যবস্থাকে দুভাগে বিভক্ত করিয়ে দিলেন। বঙ্গের নবাবের হাতে শাসন ও বিচার ব্যবস্থা ও কোম্পানীর হাতে সামরিক ও আদায় দায়িত্ব রাখা হলো। একে দ্বৈত্য শাসন বলা হয়। কিন্তু এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা শাসন গত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। প্রজাদের দুঃখ দূর্দশা বেড়ে গেল। এর সাথে বঙ্গে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বহুলোকের মৃত্যু হল। ১৭৭১ সালে এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে দেওয়া হল।

পলাশী যুদ্ধ ও বক্সার যুদ্ধের পরে ভারতে ইংরেজদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পেল। তারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ক্ষমতা বিস্তার করার চেষ্টা করতে লাগল। দাক্ষিনাত্যে নিজেদের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করল।

প্রথম মহীশুর সমর ঃ দাক্ষিনাত্যে মহীসূর স্বীধান রাজ্য ছিল। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে হায়দর আলী এর শাসক ছিলেন। তিনি তার প্রতি বেশী রাজ্যগুলি অধিকার করা চেষ্টা করলেন। যার ফলে মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের সঙ্গে মিশে হায়দর আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করল।১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ।

এই যুদ্ধে হায়দর আলী মিলিত বাহিনী কে বরাস্ত করল। ফলে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ বাধ্য হয়ে তাঁর সঙ্গে সন্ধি করলো। সন্ধি চুক্তি অনুযায়ী উভয়ে উভয়কে যুদ্ধের সময় সাহায্য করবে।

দ্বিতীয় মহীশুর সমর ঃ সন্ধি শর্ত অনুযায়ী ইংরেজরা হায়দার আলীকে সাহায্য করল কিন্তু হায়দার আলী কর্নাটক আক্রমন করার সময়ে ইংল্যান্ডের কর্নেল বেরিং ইংরেজ

সৈন্য নিয়ে হায়দার আলীকে প্রতিরোধ করল। হায়দার আলীর পুত্র টিপুসুলতান কর্নেল বেরিং কে পরাস্ত করে আর্কট অধিকার করে নিলেন। ইংরেজরা হায়দারের রাজ্যে অবস্থিত মাহে নামক ফরাসী বানিজ্য

কুঠি দখল করায় হায়দার আলী ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ হলো। যুদ্ধ চলা কালীন ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলী প্রান ত্যাগ করলেন। কিন্তু তাঁর সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বজায় রাখলেন। টিপু ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ম্যাথুস ও তার সৈন্যদের বন্দী করলেন। ইংরেজ ও টিপুর মধ্যে একটি শান্তি চুক্তি হল। ওই চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষ যুদ্ধে হারানো রাজ্য ফিরে পেল।

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ ঃ টিপু সুলতানের শক্তি ও ক্ষমতা দেখে নিজাম ও মারাঠাগন ভয়ভীত হয়ে ইংরেজদের সঙ্গে জোট বাঁধল।। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে টিপু ইংরেজদের মিত্র রাজ্য ত্রিবাঙ্কুর আক্রমন করায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ লেগে গেল। কর্ণওয়ালিস সৈন্যবাহিনী নিয়ে টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গাপট্টনম অধিকার করে নিলেন। টিপু বাধ্য হয়ে ইংরেজ দের সঙ্গে সন্ধি করলেন। একে শ্রীরঙ্গাপট্টনম সন্ধি বলা হয়। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী টিপু নিজের রাজ্যের অর্ধেক অংশ ইংরেজ মারাঠা ও নিজাম কে ছেড়ে দিলেন।

চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ ঃ টিপু পরাজয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সৈন্যবাহিনী কে ফরাসী দের দ্বারা তালিম দিয়ে বেশী শক্তিশালি করিয়েছিল। ১৭৯৯ সালে ইংরেজ গর্ভনর ওয়েলেসলি মারাঠা ও নিজামের সঙ্গে মিশে পুনরায় টিপুর রাজ্য আক্রমন করলো। টিপু সাহসের সঙ্গে লড়াই করলেন। এবং যুদ্ধে নিহত হলেন। পরে মহীসূর রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হল। দক্ষিন পশ্চিম জেলা গুলো ইংরেজদের অধিকারে গেল। উত্তর পূর্বের কিছু জেলা নিজামের রাজ্যে মিশে গেল। মারাঠারা মহীশূরের উত্তর পশ্চিম অংশ থেকে কিছু পেয়ে ছিল।

তুমি জান কি ?

টিপু সুলতান একজান স্বাধীনচেতা বীরপুরুষ এবং প্রবীন রাজীতি জ্ঞ ছিলেন। তার অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার জন্য তিনি 'মহীসুররে বাঘ' নামে পরিচিত।

এর পরে ইংরেজরা ভারতের অন্যান্য অঞ্চল জয় করে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করতে উদ্যাম করলো।

ইংরেজ রা মারাঠাদের অন্তর্বির্বাদ এর সুযোগ নিল। মারাঠারা গায়কোয়াড় ভোঁসলে, সিন্ধিলা ও হোলকার বংশ নিয়ে পরস্পরের মধ্যে কলহে লিপ্ত ছিল। ইংরেজরা এই সুযোগ নিয়ে মারাঠা দের যুদ্ধে হারিয়ে তাদের শক্তি ধ্বংশ করে দিল।

সামন্ত সন্ধি প্রথা ঃ ভারতীয় রাজ্য গুলোর ওপর ইংরেজ দের প্রভাব বিস্তারের জন্য ওয়েলেসলি একটি প্রথা প্রচলন করল তাকে সামন্ত সন্ধি বা অধীনতা মূলক মিত্রতা বলা হয়। এই সন্ধির শর্ত্ত অনুযায়ী যে দেশীয় রাজ্য সকলের রাজা এই অধীনতা স্বীকার করবে, তারা মিত্র হয়ে থাকবে ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে কোনো দেশীয় বা বিদেশী শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারবে না। সামন্ত সন্ধি গ্রহন করে থাকা রাজ্যে নিজ খরচে একদল ইংরেজ সৈন্যকে নিজের রাজ্য রাখবে। সৈন্যদের খরচ বহন করতে অসমর্থ হলে সেই খরচ বাবদ নিজের রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজদের দেবে।

তোমার জন্য কাজ ঃ

টিপু সুলতানের সাহস ও বীরত্বের সম্পর্কে বই বড়ে অধিক তথ্য জোগাড় কর।

প্রথমে হায়দ্রাবাদের নিজাম এই শর্ত সন্ধি গ্রহন করলেন। পরে অযোধ্যার নবাব সামন্ত সন্ধি গ্রহন করে নিজ রাজ্যের এক অংশ ইংরেজদের দিয়েছিল। তান্ডোর, সুরাট, রাজপুতানা অঞ্চলের জয়পুর, ও উদয়পুর অঞ্চল প্রভৃতি রাজ্যে শাসন কর্ত্তারা ও সামন্ত সন্ধি গ্রহন করেছিলেন। যার ফলে তারা নিজস্ব স্বাধীন তা হারিয়ে ছিল।

রাজ্যস্বত্ত লেপনীতি ঃ ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহাউসি এক জন সাম্রাজ্য বাদী শাসক ছিলেন। ভারতে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য এক নূতন পন্থা প্রয়োগ করলেন তা হোলো রাজ্যস্বত্ত্ব লোপনীতি। কোনো দেশীয় রাজ্যের রাজা অপুত্রক হলে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করতেন। রাজার মৃত্যুর পরে পোষ্য পুত্র উত্তরাধিকারী ভাবে রাজা হতেন। কিন্তু উক্ত নীতি অনুসারে কোনো অপুত্রক রাজা পোষ্য পুত্র গ্রহণ করতে পারবেনা। ব্যাখ্যা করা হল রাজার মৃত্যুর তার রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হওয়ার ব্যবস্থা রইল। এই নীতি অনুসারে সাতার ঝাঁসী, নাগপুর, সম্বলপুর, জৈতপুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য গুলি ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়েছিল।

শাসন ব্যবস্থা ঃ

নিয়ামক্ আইন - (১৭৭৩) ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কেম্পানী বানিজ্য করার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে রাজ্য বিস্তার করে মন ইচ্ছা শাসন চালালো। এটা ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সহ্য করতে পারলো না। ১৭৭৩ খ্রী ষ্টাব্দে ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ ভারতের কোম্পানী শাসন কে নিয়ন্ত্রন করতে, পার্লামেন্টে একটি আইন গৃহীত করিয়ে নিলেন তাকে রেগুলেটিং এ্যাক্ট বানিয়ামক আইন বলা হয়। এতে উল্লেখ করা ছিল যে বঙ্গের গর্ভনর ইংরেজ শাষিত সমস্ত অঞ্চলের বড়লাট বা গভর্নর হবে। মাদ্রাজ ও বম্বের গভর্নর তার অধীনে থেকে কাজ করবে। বড় লাটকে সাহায্যর জন্যে চারজন সভ্য নিয়ে একটি শাসন পরিষদ বা কাউন্সিল গঠন হবে এবং প্রত্যেক সভ্য পাঁচ বছরের জন্য নিযুক্তি পাবে। এই আইন অনুযায়ী কর্মচারীদের দোষ ত্রুটির বিচারের জন্য কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট স্থাপন করা হল এবং ভারত শাসনের সমস্ত খবর বিলেত পার্লামেন্টকে জানানোর জন্যে কোম্পানীকে বাধ্য করা হোলো।

পিটের ভারত শাসন আইন (১৭৮৪) ঃ নিয়মক আইনে কিছু দোষ ত্রুটি ছিলে। তার সুযোগ নিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস ভারতে মনোইচ্ছা শাসন চালালেন। নানা অন্যায় কার্য্য করতে লাগলেন। সেই ত্রুটি শোধরাতে বিলেতের

তুমি জান কি ?

পুরাতন	পরিবর্তিত নাম
পুনা	পুনে
ত্রিবান্দ্রম	মরুঅন্তপূরম
কোচিন	কোচি
ব্যাঙ্গাঁলোর	বেঙ্গালুরু

পার্লামেন্টে প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম পিট সাহেব একটি আইন করলেন। সেটা পিট সাহেবের ভারত শাসন আইন নামে নামিত। এই আইন অনুযায়ী বিলেতে বোর্ড অফ কন্ট্রোল বা নিয়ন্ত্রিন পরিষদ গঠন করা হোলো। বিলেতের মন্ত্রী পরিষদের একজনকে তার সভাপতি রূপে নিযুক্ত করা হল। এই বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলের হাতে ভারত শাসনের সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা রইল। গর্ভনর জেনারেলের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া হল। শাসন কার্য্যে তাঁকে পরামর্শ দিতে সভা রইল। এই সভায় তিনজন সভ্য রইলেন। বম্বে, মাদ্রাজের গর্ভনরের ওপরে গর্ভনর জেনারেলের পূর্ণনিয়ন্ত্রণ রইল।

সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার পরিসর স্পষ্টে করা হলো ঃ

এই আইনের দ্বারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ইংরেজ সরকার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারল।

তোমার জন্য কাজ ঃ

বর্ত্তমানের পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও মধ্য প্রদেশ, বিট্রিশ শাসনকালে কি নামে পরিচিত ছিল, তা সংগ্রহ কর।

এই ভাবে এক শতাব্দির মধ্যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটি বানিজ্য সংস্থা থেকে ভারতের শাসক হতে পেরেছিল।

আমরা কি শিখলাম ?

- মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ফলে পাশ্চাত্য শক্তিদের উত্থান
- নাদির শাহের ভারত আক্রমন এবং লূণ্ঠন
- তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয় এবং সাম্রাজ্য গঠনের আশা ক্ষীন।
- ভারতে কোম্পানী শাসনের ভিত্তি স্থাপন।
- ভাস্কো ডা গামার জল পথ আবিস্কারের ফলে নৌবানিজ্য সুগম।
- যথাক্রমে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার, ইংরেজ ও ফারসীদের ভারতে উপনিবেশ স্থাপন।
- ফরাসীর ফ্রাঙ্কো এ মার্টিন এবং ডুপ্লের যথাক্রমে পন্ডিচেরী ও চন্দন নগর অধিকার।
- সিরাজদ্দৌলার বুদ্ধি প্রয়োগ ও অন্ধকূপ হত্যা
- সেনাপতি মিরজাফর এবং রায় দুর্লভের সিরাজদ্দৌলার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা।
- টিপু সুলতানের অসাধারণ বীরত্ব এবং সাহসিকতা।

প্রশ্নাবলী

১। প্রত্যেক উত্তর প্রায় ৭৫টি শব্দে লেখ।

ক) নাদিরশাহ কবে ও কোন পরিস্থিতিতে ভারত আক্রমন করেছিল? সে ভারত আক্রমন করে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল? সে ভারত থেকে নিজের দেশে কি নিয়ে গেছিল?

খ) পর্ত্তুগীজদের ভারত আগমন ও বানিজ্য কুঠি স্থাপনের ওপরে ধারনা দাও।

গ) ফরাসী ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে কি প্রকারে স্থিতি সুদৃঢ় করতে পেরেছিল?

ঘ) দ্বিতীয় কর্নাটক সমরের ওপরে বিবরনী প্রদান কর।

ঙ) মিরকাশিম কিভাবে বঙ্গের নবাব হলেন ও কোন কারনের জন্য ইংরেজরা তাঁকে নবাব পদ থেকে অপসারন করতে চাইছিল?

চ) সামন্ত সন্ধি কে কি উদ্দেশ্যে প্রনয়ন করেছিল? এর শর্ত্ত গুলো কি ছিল ও কারা এই সন্ধি গ্রহন করেছিল?

ছ) রাজ্য স্বত্ব লোপনীতি কে প্রনয়ন করেছিল? এই নীতিতে কি প্রকার ব্যবস্থা ছিল ও কোন রাজ্য গুলো এতে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছিল।

জ) ''পিট্ সাহেবের ভারত শাসন আইন'' সম্পর্কে ধারনা দাও।

২। **প্রত্যেক উত্তর প্রায় ২০ টি শব্দে লেখ।**

ক) আমীর গন কোন কোন দলে বিভক্ত হয়েছিল ? তারা কি কায়দা হাসিল করতো ?

খ) যোধপুর রাজা অজিত সিংহ কোন কোন রাজ্যে শাসন কর্ত্তা হলেন ? তিনি কোন অঞ্চলের শাসন দায়িত্ব গ্রাহন করেছিলেন ?

গ) কোন স্থান গুলোয় পর্ত্তুগীজদের বানিজ্যকুঠি ছিল ? কোন গুলো ১৯৬১ পর্য্যন্ত অধিকারে ছিল ?

ঘ) ইংরেজ ও ফরাসীরা কোন স্থানগুলিতে বানিজ্য দুর্গ নির্মান করেছিল ?

আলীবর্দ্দি খাঁ কবে প্রান ত্যাগ করেছিলেন ? তাঁর পরে কে বঙ্গের শাসক হয়েছিল ?

চ) পলাশী যুদ্ধে কে পরাজিত হয়েছিল ? ও তাকে কোথায় বন্দী করে রাখা হয়েছিল ?

ছ) কোন আইনের বলে ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কে নিয়ন্ত্রন করতে পেরেছিল ? এটা কোন আইনের ভুল ত্রুটি সংশোধনের জন্য করা হয়েছিল ?

জ) টিপু সুলতান কোন যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন ? তাঁর পরে মহীশূর রাজ্যের পরিনতি কি হযেছিল ?

৩। **শূন্যস্থান পূরন করঃ-**

ক) নিজাম উলমূলক ———— র গভর্নর রূপে নিযুক্ত পেয়েছিলেন।

খ) ময়ূর সিংহাসন ———— নির্মান করেছিল।

গ) শাহূজীকে ———— বন্দী করে রেখেছিল।

ঘ) ১৬১৫ খ্রীঃ অঃ তে ———— ইংল্যান্ডের রাজদূত হয়ে ভারতে এসেছিলেন।

ঙ) পন্ডিচেরীতে সামরিক শিবির ———— গন প্রতিষ্ঠা করেছিল।

চ) ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ ———— ফরাসী বানিজ্যকুঠি চন্দননগর অধিকার করেছিলেন।

ছ) অন্ধকূপ হত্যা ———— র দ্বারা হয়েছিল।

জ) বকসার যুদ্ধের পরে সুজাদ্দৌল্লা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ———— ও ———— হস্তান্তর করেছিলে।

ঝ) হায়দার আলী ———— প্রথা প্রচলন করেছিলেন।

ঞ) ওয়েলেসলি ———— প্রথা প্রচলন করেছিলেন।

৪। **রেখাঙ্কিত শব্দগুলি পরিবর্ত্তন না করে ভ্রম সংশোধন কর।**

ক) **টিপু সুলতান** কর্নেল বেরিকে পরাস্ত করে শ্রী রঙ্গপট্টনম অধিকার করেছিলেন।

খ) **নিয়ামক আইন** ভারত পার্লামেন্টে গৃহীত হয়েছিল।

গ) **নাদির শাহকে মোগলে সেনা** লাহোরে প্রতিরোধ করেছিল।

ঘ) **ফোর্ট সেন্ট জর্জ** কলিকাতায় অবস্থিত।

ঙ) **উজির পদবী** মোগল শাসন কালে রাজস্ব আদায়কারীকে বোঝাত্রে।

৫। **'ক' স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের শব্দকে মেলাও ।**

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
তারাবাই	পারস্যের শাসক
এলিজাবেথ	সেনাপতি
ড্যুপ্লে	কোলাপুরের শাসিকা
নাদির শাহ	ইংল্যান্ডের শাসিকা

৬। **নিম্নের সম্ভাব্য উত্তরদের মধ্যে সঠিক উত্তর বেছে লেখ।**

ক) কুলি খাঁ উপাধি কে পেয়েছিলেন।

১) নাদির সাহ ২) নিজাম - উল - মূলক

৩) সাদত খাঁ ৪) চেঙ্গিজ খাঁ

খ) শিখেরা কতটি সংঘে সংগঠিত হয়েছিল।

১) ১১ ২) ১২ ৩) ১৩ ৪) ১৪

গ) প্রথম কর্নাট সমরের সময় সীমা কত ?

১) ১৭৪০ - ১৭৪৪

২) ১৭৫০ - ১৭৫৪

৩) ১৭৫৮ - ১৭৬০

৪) ১৭৫৭ - ১৭৬০

ঘ) ''মহীসুর বাঘ'' নামে কে পরিচিত ?

১) রবার্ট ক্লাইভ ২) হায়দর আলী

৩) টিপু সুলতান ৪) কর্ন ওয়ালিস

৭। **বন্ধনীর মধ্যে থেকে উপযুক্ত শব্দ বা সংখ্যা বেছে শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ**

ক) ভারত .....আবিষ্কার করেছিলেন।

(ভাস্কো ডা গামা, আলবুকার্ক, কলম্বাস, ক্যাপটেন কুক্)

খ) পলাশী যুদ্ধে ..... র বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য সিরাজদ্দৌলা হারলেন।

(মীর কাশিম, মিরজাফর, সুজাউদ্দৌল্লা, শাহ আলম)

গ) টিপু সূলতান ..... খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে নিহত হলেন।

(১৭৯০, ১৭৬১, ১৭৯৯, ১৮০০)

● ● ●

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রভাব

১৭৫৭ সালে বঙ্গের নবাব সিরাজদৌল্লা পলাশীতে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দ্বারা পরাজিত হলেন। ইহা পলাসীর যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধ জয় করে প্রথমে ইংরেজরা বঙ্গে শাসন আরম্ভ করলো। যা ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে বিস্তৃত হল। প্রথমে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বানিজ্য করার জন্য ভারতে এসেছিল। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে পরে শাসন করতে লাগল। পলাশী যুদ্ধের একশো বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহের সময় পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত ইংরেজ শাসনের অধীনস্ত হয়ে গেছিল। ইংরেজ পূর্ববর্ত্তী শাসন যথা তুর্ক ওমোগল শাসন থেকে ইংরেজ শাসন সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। ইংল্যান্ডের জন্য

তুমি জান কি ?

শিক্ষা ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী আগাপাশতলা পরিবর্তনকে শিল্প বিপ্লব বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প ক্ষেত্রে কিছু উদ্ভাবন ও আবিষ্কার হওয়ার ফলে মানব জাতির জীবন ধারন অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হল। শিল্প বিপ্লবের পূর্বে লোকে নিজের হাতে নিজের নিত্য ব্যবহার্য্য জিনিষ তৈরি করত। ১৭৭৯ তে স্যামুয়েল ক্রম্পটনের স্পিনিংমিউল, ১৭৬৪ তে জেমস হাসগ্রিভসের স্প্রিনিং জোন ১৭৮৫ তে এডমন্ড কার্ট রাইটের পাওয়ার লুম, ১৭৮৫ তে জেমস ওয়াটের বাষ্পশক্তি ও নিউক ম্যানের স্টিম ইঞ্জিন এক নূতন যন্ত্র যুগের সৃষ্টি করলো।

অধিক থেকে অধিক ধন সম্পত্তি নেওয়া ইংরেজ শাসকদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সেই সময় ইংল্যান্ডে শিল্পে বিপ্লব আরম্ভ হয়েছিল। নতন নুতন কলকারখানা বসাবার জন্যে আবশ্যক কাঁচা মাল ভারত থেকে সংগৃহীত হতে লাগল। আবার কলকারখানায় উৎপাদিত সামগ্রীর বিক্রীর জন্যে ভারতে ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। আবশ্যক কাঁচা মাল ও খাদ্যশষ্য বহুল পরিমানে ভারত থেকে রপ্তানী হলো। ইংরেজরা দেশের শাসন হাতে নিয়েছিল বলে এদেশ থেকে এভাবে ধন সম্পত্তি বয়ে নিয়ে যাওয়া সহজ হলো।

তোমার জন্য কাজ

তোমার অঞ্চলে স্থাপিত যে কোনো শিল্প দ্বারা কি কি প্রকার পারি পার্শিক পরিবর্ত্তন ঘটছে তা পর্য্যবেক্ষন করঃ।

তুর্ক ও মোগলরা নিজের বাসস্থান মনে করে দেশে শাসন করতো। কিন্তু ইংরেজ শাসনে ভারত একটি উপনিবেশ। ইংল্যান্ডের স্বার্থ রক্ষার্থে ভারতের শিক্ষা সংস্কৃতি ও আর্থিক বাবস্থায় পরিবর্ত্তন করা হোলো। ইংরেজরা জানতো যে সমাজের সব ক্ষেত্রে এই আমূল পরিবর্ত্তন না হলে তাদের জন্যে ভারত শাসন করা লাভ দায়ক হবেনা।

শিক্ষাঃ

ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতে প্রচলিত শিক্ষাঃ

মাদ্রাসা ও মকতর মুসলমানদের জন্যে এবং পাঠাশালা, টোল ও মঠ হিন্দুদের জন্য প্রমুখ পারম্পরিক শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। মাদ্রাসা ও মকতবে বিশেষ করে আরবী ও ফার্সি ভাষা শিক্ষা এবং মঠ ও টোলে সংস্কৃতি শিক্ষা প্রদান করা হত। পাঠশালায় স্থানীয় ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। ধর্ম শাস্ত্র ব্যতীত গণিত ও তর্ক শাস্ত্রে ছিল প্রধান শিক্ষানীয় বিষয়।

নূতন শিক্ষা ব্যবস্থাঃ

শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসনের গভীর প্রভাব দেখা গেছিল। সে সময় দেশে পারম্পরিক ভঙ্গীতে শিক্ষা দেওয়া

হত। পাঠশালা মাদ্রাসা, মকতব, মঠ, টোল প্রভৃতি গ্রামে গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল সেখানে বিশেষ করে অক্ষর শিক্ষা গণিত, সাহিত্য ও দর্শন প্রভৃতি পড়ানো হতো। ইংরেজ শাসন আরম্ভ হওয়ার পরে প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরে সরকার পারম্পরিক শিক্ষার বদলে আধুনিক শিক্ষা দিতে কোনো যত্ন নেয়নি। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি লাভদায়ক বানিজ্য সংস্থার হাতে সরকারের নিয়ন্ত্রন ছিল। আধুনিক শিক্ষার প্রসার হলে কোম্পানীর কোনো লাভ হবে বলে সরকার মনে করত না। অপর পক্ষে দেশের প্রচলিত সামাজিক নিয়মনীতি জানা সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের অতি আবশ্যক ছিল। তা না হলে আবশ্যক স্থলে শাসন পরিচালনা করা কঠিন হয়ে পড়ত। এই কারনে শুরুতে শিক্ষার প্রসারে দেশের পারম্পরিক দেশীয় শিক্ষাকে অল্প স্বল্প সাহায্য দেওয়া হল। উদাহরন স্বরূপ বড় লাট ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলিকাতাতে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। এর দশ বছর পরে জ্যোনাথন ডানকান বেনারসে হিন্দু আইন ও দর্শন শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি সংস্কৃতি কলেজ স্থাপন করলেন।

ইংল্যান্ডে আধুনিক শিক্ষার প্রভূত প্রসার চলা কালীন ভারতে পারম্পরিক শিক্ষাকে সহযোগে করাতে সরকারকে খ্রীষ্টান মিশনারীরা ঘোর বিরোধ করলেন। দেশে সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা শিক্ষার অধিক প্রচলন হলে ভারতের লোকেরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হবে না। বলে খ্রীষ্টান মিশনারীরা মনে করলেন, তারা দাবী করলেন যে সরকার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করুন, যদ্বারা শিক্ষিত বর্গ পাশ্চাত্যের ধর্মস সংস্কৃতি তথা আচরন প্রতি আগ্রহী হবে।

১৪১৩ সালে ইংল্যান্ডে চার্টার আইন প্রনীত হল। শিল্প বিপ্লবের আবশ্যকতা পূরণ করতে ভারতের মতো এক বিশাল উপনিবেশে শিক্ষা সংস্কৃতিতে পরিবর্ত্তন আনা আবশ্যক হল। চার্টার আইন অনুযায়ী প্রথম করে কোম্পানী সরকার আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে একলক্ষ টাকা খর্চা করার নিষ্পত্তি নিল। এই অর্থ সমগ্র ভারতের জন্য অতি অপ্রতুল সাদৃশ ছিল। দীর্ঘ দশ বছরেও সেই অল্প টাকা খর্চা করা গেল না।

চার্টার আইন ঃ

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে কর্ত্তৃত্বধীন করার উদ্দেশে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিভিন্ন সময়ে গৃহীত আইনের মধ্যে এটি অন্যতম। প্রথমে চার্টার আইন ১৭৯৩ সালে গৃহীত হয়েছিল। তারপরে প্রতি কুড়ি বছরের ব্যবধানে ১৮১৩, ১৮৩৩ এবং কোম্পানী বিলয় হওয়ার পূর্বেশেষ বারের জন্য ১৮৫৩ সালে এই আইন প্রনীত হয়েছিল। ১৮১৩ তে প্রনীত চার্টার আইন অনুযায়ী খ্রীষ্টান মিশনারিদের ভারতে ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য কোম্পানীকে অনুমতি দিতে হলো।

পাশ্চাত্য শিক্ষার আরম্ভ ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় চতুর্থ দশকে ভারতে কি প্রকার শিক্ষা নীতির প্রচলন হবে সেটা নিয়ে ইংল্যান্ডের বুদ্ধিজীবি মহলে ভীষণ তর্ক বিতর্ক আরম্ভ হলো। একদল যুক্তি দিল যে ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার করা হোক। এর দ্বারা আধুনিক বিজ্ঞান ও সমাজ শাস্ত্র সম্বন্ধিত জ্ঞান আহরনে সুবিধে হবে। এই শিক্ষার জন্যে ভারতীয়রা ইংরেজ সংস্কৃতির প্রতি সহজে আকৃষ্ট হবে। যার ফলে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্টির সহায়তায় ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য সুদৃঢ় হবে। অন্য দিকে দ্বিতীয় গোষ্টীর বুদ্ধি জীবীরা যুক্তি দিল যে ভারতে পারম্পরিক দেশীয় শিক্ষা অব্যাহত থাক। আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে' ভারতীয় রা এলে তারা স্বাধীনতা ও গনতন্ত্রের চিন্তা ধারায় অনুপ্রানীত হবে এবং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধাচরন করবে।

দ্বিতীয়ত আধুনিক শিক্ষার নামে সরকার যদি কোনো পস্পরায় হস্তক্ষেপ করে সেটা তারা সহ্য করতে পারবেনা।

মোট কথা হলো উভয় বুদ্ধিজীবির গোষ্টীই ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে এই যুক্তি পেশ

করলো। আবার শিক্ষায় মাতৃভাষার মহত্বকে কেউ গুরুত্ব দিল না। আধুনিক শিক্ষার জন্য ইংরাজীর বদলে মাতৃভাষা মাধ্যম হলে শিক্ষা গ্রহন যে সহজ হবে এটা তারা বুঝতে পারলে না।

লর্ড ম্যাকলের নীতিঃ

১৮৩৫ সালে কোম্পানীর কার্য্যকারী পরিষদের আইন সভ্য লর্ড ম্যাকলে ইংরাজী মাধ্যমে ভারতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচলন হবে বলে সরকারের নিষ্পত্তি শোনালেন। তাঁর যুক্তি ছিল যে ভারতের প্রাচীন শিক্ষা যথেষ্ঠ নয়, আবার দেশের লোকেদের সম্পূর্ণ ভাবে আধুনিক শিক্ষা দিতে সরকার এত অর্থ খর্চা করতে রাজি নয়। তাই অল্প কয়েকজনকে ইংরাজী মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা দিলে, তাদের মাধ্যমে শিক্ষা ও জ্ঞানের আলো অন্যদের কাছেও পৌছবে। তাছাড়া কিছু লোক শিক্ষিত হলে, কেরানী ও সাধারণ কাজের জন্য সহজেই লোক পাওয়া যাবে। ইংরাজী কেরানী ভারতে নিয়ে এসে শাসন পরিচালনা করা যথেষ্ট ব্যায় বহুল হয়ে যাবে সেটা ম্যাকলে ভালো জানতেন, মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রদান করলে এবং ইংরাজী কে দ্বিতীয় ভাষা রূপে অধ্যয়ণ করলে ভারতে উপনিবেশ বাদী স্বার্থের হানি হবে বলে ইংরেজ সরকার জানত তাই মাতৃ ভাষায় শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট ধ্যান দেওয়া হল না।

ম্যাকলের দ্বারা প্রনীত শিক্ষা নীতিকে ইংরেজ সরকার অবশেষে পালন করলেন। একে কিন্তু ভারতের আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি রা বিরোধ করলেন। আবার অনেক ইংরেজ বুদ্ধিজীবিও সরকারের এই নীতির সমর্থন করলেন না। তাদের মতে ভারতের সবাইকে শিক্ষিত করার দায়িত্ব সরকারের নেওয়ার কথা স্বয়ং উপনিবেশবাদী ইংরেজ সরকার ও নিজের নীতি কে যুক্তি সঙ্গত বলে দাবি করতে পারছিল না। ফলে ১৮৪৪ সালে উড্‌স ডেসপ্যার নামে শিক্ষা সম্বন্ধিত এক দস্তাবেজ সরকার প্রস্তুত করলেন। এটির প্রনেতা ছিলেন কোম্পানী নিয়ন্ত্রন বোর্ডের সভাপতি চালর্স উড্‌। এই দস্তাবেজ অনুসারে এবার থেকে সরকার গড় শিক্ষাকে মহত্ব দেবে বলে আশ্বাসনা দিল। কেবল ওপরে স্তরে অল্প কিছু লোককে শিক্ষা দিয়ে তারা সামাজিক শিক্ষার ভার নেবে বলে সরকার নিজ দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে গেল। ফল স্বরূপ এবার থেকে প্রত্যেক প্রদেশে স্বতন্ত্র শিক্ষা বিভাগ গঠিত হলো ও ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বম্বে ও মাদ্রাজে তিনটি বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হল। বাংলার প্রসিদ্ধ উপন্যাস ''আনন্দ মঠ'' উপন্যাসের লেখক ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম ভারতীয় যিনি ১৮৬৮ তে বিশ্ব বিদ্যালয় উপাধি লাভ করেছিলেন। দেশে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এরপরে স্থাপিত হয়েছিল। ওড়িশার ১৮৬৮ সালে প্রথমে কটকে একটি কলেজ আরম্ভ হয়েছিল। সেখানে কলেজ শিক্ষার প্রথম দুবছর মাত্র পড়ার ব্যবস্থা ছিল। ওখানে থেকে উর্ত্তীন হলে ছাত্ররা বি.এ. ডিগ্রী পাবার জন্য কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে নাম লেখাত। পরবর্ত্তী কালে এই কলেজ কে স্বনামধন্য ইংরেজ প্রশাসক টি. ই রেভেন্সার নামে নামঙ্কিত করে একে রেভেন্সা কলেজ বলা হল।

উড্‌স ডেসপ্যার ঃ এটি কোম্পানী নিয়ন্ত্রন বোর্ডের সভাপতি চার্লস উডের অধ্যক্ষতায় প্রস্তুত শিক্ষা সম্বন্ধীয় এক তদন্ত রিপোর্ট। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নির্দ্দেশে এই তদন্ত ১৮৫৩ সালে আরম্ভ হয়েছিল এবং ১৮৫৪ সালে দাখিল হয়েছিল। আগেকার ঘরোয়া প্রচেষ্টায় চলা শিক্ষা ব্যবস্থা, এই রিপোর্ট সরকারী নিয়ন্ত্রনে আনার প্রস্তাব ছিল। উডস্‌ ডেসপ্যাডের পরে ভারতে বেশী বেশী শিক্ষা অনুষ্ঠান স্থাপনের জন্য সরকার অনুমতি দিলেন। ১৮৫৭ সালে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপন করা হলো। এরপরে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা ও ভারতীয় ভাষা শিক্ষা ও বিধিবদ্ধ ভাবে অল্প কিছু প্রোভসাহস পেল।

পারম্পরিক শিক্ষার অধঃপতন ঃ

আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার পরে পাঠশালা মাদ্রাসা, মকতব টোল প্রভৃতি পারম্পরিক দেশীয় শিক্ষা কেন্দ্র গুলিকে অবহেলা করা হল। এই শিক্ষা সংস্থান গুলোকে রাজা ও জমিদার গণ পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের মতো সহযোগ করল না। সরকার সেগুলিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও সাহিত্য ইত্যাদি শিক্ষার জন্যে ব্যবহার পর্য্যন্ত করল না।আবার ১৮৪৪ সালে নিয়ম জারী হলো যে সরকারী চাকরীর জন্যে ইংরাজী জ্ঞান জরুরী। অর্থাৎ পারম্পরিক শিক্ষা সংস্থা থেকে পাশ করা ছাত্র সরকারী চাকরীতে অযোগ্য বিবেচিত হলো। ক্রমশঃ এই শিক্ষা সংস্থা গুলি লোপ পেয়ে গেল।

আধুনিক শিক্ষার প্রসারের জন্য খ্রীষ্টান মিশনারীরা অনেক স্কুল কলেজ স্থাপন করেছিলেন। দেশে শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি বর্গ ও বুঝে ছিলেন যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হলে সমাজ থেকে কুসংস্কার দূর হবে এবং রাষ্ট্রের বিকাশ হবে। অপর পক্ষে অধিক সংখ্যায় স্কুল কলেজ স্থাপন করে উচ্চশিক্ষিতদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে সরকার চাইছিলেন না। কেবল কেরানী বর্গ দৈরী করে শাসন কার্য্য সহজ সুগম করা তাদের লক্ষ ছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষা পেয়ে শিক্ষিত লোকেরা বিদেশী সংস্কৃতি ও বিদেশী দ্রব্য কে ভালো বাসবে। ফলে ভারতে বিদেশী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া শিক্ষা মাধ্যমে ইংরেজীর মহানতা প্রচার করতেও সহজ হবে বলে সরকার মনে করতেন।

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পরে স্বল্প খর্চায় চলতে থাকা দেশী শিক্ষানুষ্ঠান গুলি লোপ পেয়েগেল। অপর পক্ষে বিনা সরকারী সহায়তায় খর্চা সাপেক্ষ নতুন স্কুল কলেজ স্থাপন সম্বভ পর ছিল না। সরকার শিক্ষার প্রসার আবশ্যক মাত্রায় খরচ করতে আগ্রহী হলো না। ১৮৮৬ সালে মোট আয় ৪৭ কোটি কাটা থেকে সরকার মাত্র ১ কোটি টকা শিক্ষায় খরচ করেছিলেন।

নারী শিক্ষার প্রতি অবহেলা ঃ নতুন শিক্ষা ব্যবস্থায় নারী শিক্ষা প্রতি বিশেষ ধ্যান দেওয়া হল না। নারী শিক্ষিত হলেও ঘরের কোনে থাকবে এবং অফিসে কেরানীর চাকরী করবেনা- এই আশঙ্কায় সরকার নারী শিক্ষাকে অবহেলা করল। ফলতঃ ১৯২১ সালে নাগাদ দেশে মাত্র ২২ শতাংশ। মহিলা শিক্ষা লাভ করে ছিল। ওড়িশায় প্রাথম বার নারী শিক্ষার জন্য ১৮৭৩ সালে কটকে রেভেন্সা হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় আরম্ভ হয়েছিল।

বৈষয়িক শিক্ষা ঃ

ইংরেজ সরকার বিজ্ঞান ও বৈষয়িক শিক্ষার প্রতি ও যথেষ্ঠ ধ্যান দেয়নি, ১৪৯৯ সালে প্রথমবার বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানে স্নাতোকত্তার ডিগ্রী দেওয়া হল। তখন স্কুলের মত কলেজের অধ্যাপককে পদার্থ ও বিজ্ঞানে, জীব বিজ্ঞান ইত্যাদি সর্ব বিষয় পড়াতে হত। ১৮৭৫ সাল নাগাদ সমগ্র দেশে কেবল বম্বে মাদ্রাজ ও কলিকাতায় তিনটে মেডিক্যাল কলেজ ছিল। ওড়িশায় প্রথমবার ১৮৭৬ সালে কটকে একটি মেডিক্যাল স্কুল আরম্ভ হয়েছিল। ইংরেজ শাসন কালে বৈষয়িক শিক্ষা বিশেষ প্রগতি করেনি। প্রথমে সরকার উত্তর প্রদেশের রুরকির কাছে একটি ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তাতে কেবল ইউরোপীয় ছাত্রদের প্রবেশ অধিকার ছিল। ১৯৩০ সালে সমগ্রদেশে মাত্র ১০ টি ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইঞ্জিনিয়ারীং শিক্ষার আবশ্যকতা অনুভব করে সরকার অনেক ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজ খুলতে বাধ্য হন। ওড়িশায় প্রথমবার১৮৮৪ সালে বালেশ্বরের কাছে একটি শিল্প তালিম স্কুল ও কটকে সার্ভে স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। সার্ভে স্কুলটি পরে ইঞ্জিনিয়ারীং কলেজে পরিনত হল। বর্তমানে এটি ভবনানন্দ ওড়িশা স্কুল অফ ইঞ্জিনিয়ারিং নামে পরিচিত।

দেশীয় ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন ও জাতীয় শিক্ষার বিকাশ ঃ মোট কথা হল যে দেশের সামাজিক স্তরে ঔপনিবেশিক পরিবর্তন আনতে সরকার নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করলেন। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ উপনিবেশবাদের স্বার্থরক্ষা। এর জন্য পারম্পরিক দেশীয় শিক্ষার পতন হল। সরকার শিক্ষখাতে আবশ্যক খরচা না করায় নিরক্ষরতা ও বৃদ্ধি পেল। নারী শিক্ষা ও বৈষয়িক শিক্ষাকে ও প্রাথমিকতা দেওয়া হল না। মাতৃ ভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা না দেওয়াতে প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশ হতে পারল না। এতসব ত্রুটি বিচ্যুতি সত্বে নতুন শিক্ষা

দ্বারা দেশের অনেক মঙ্গল হল। শিক্ষিত লোকেদের মধ্যে অনেক বুদ্ধিজীবি এক নির্দ্দিষ্ট বর্গ ভাবে জনচেতনার প্রতি নিধিত্ব করলেন এবং জাতীয়তা আন্দোলনকে নেতৃত্ব দিলেন। পাশ্চাত্য ও আধুনিক বিচার সম্পন্ন হয়ে তারা দেশের স্বাভিমান এর জন্য স্বর উত্তোলন করলেন। ইংরেজ শাসনের এক উচিত বিকল্প রূপে এই বুদ্ধিজীবি গন জন সমর্থন লাভ করলেন। ফলে ইংরেজ শাসনের পরে দেশ প্রাচীন সামন্তবাদী শক্তির হাতে না গিয়ে জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবি বর্গের নেতৃত্ব লাভ করলো। পরবর্ত্তী সময়ে দেশের বিকাশ ও উন্নতির জন্যে এই নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা ভিত্তির কাজ করল। ইংরেজ সরকার ঔপনিবেশিক স্বার্থের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা আরম্ভ করেছিল। এতে কিন্তু অনেক সুপরিনাম ভারতে দেখা গেল। নতুন স্কুল, কলেজ সকল দেশের বিকাশের জন্য পরবর্ত্তী কালে মার্গপ্রস্তুত করল।

তোমার জন্য কাজ

পারম্পরিক শিক্ষার স্থানে পাশ্চাত্যে শিক্ষার প্রচলনের সপক্ষে ও বিপক্ষে এক তর্ক সভার আয়োজন কর।

নারী এবং সংস্কারঃ

অনেক কাল থেকেই ভারতের সামাজিক জীবনে জাতি প্রথা বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, তথা নরবলি প্রভৃতি নানা ধরনের কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। ইংরেজরা নিজের দেশে এরকম প্রথা দেখেনি। দেশের অবনতির জন্য তারা ওই প্রথা গুলোকে দায়ী কর।, কারন তার পেছনে কোনো বিজ্ঞান সম্মত যুক্তি ছিল না। কিন্তু শাষনের বিরোধের ভয়ে সরকার এতে হস্তক্ষেপ করলো না। পরবর্তী কালে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হলো। ভারতের মতো বিশাল উপনিবেশকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুগামী করতে সামাজিক পরম্পরায় হস্তক্ষেপ করার আবশ্যকর হলো। তাই যে সামাজিক, প্রথায় হস্তক্ষেপ করলে ইংরেজ স্বার্থ সাধিত হবে, সরকার কেবল সেই প্রথায় হস্তাক্ষেপ করল। জাতি প্রথার মতো কুসংস্কার কে বিশেষ ধ্যান দেওয়া হলো না, কারন লোকেদের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি করতে এটি সহায়ক হতো এবং ভেদভাবের জন্যে লোকেরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে একত্রিত হতে পারছিলনা । অর্থাৎ জাতি প্রথা থাকলে ঔপনিবেশিক স্বার্থসাধিত হওয়ার সম্ভাবন রয়েছিল।

বিশেষ করে উত্তর ভারতে এবং বঙ্গ প্রদেশের কুশীল ও উচ্চবর্গের সতীপ্রথা নামে এক কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুসারে মৃত পতির চিতায় পত্নীকে আত্মদাহ করতে হতো। এভাবে দাহ হওয়া পত্নী কে সতী আখ্যা দেওয়া হত। ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ র মধ্যে কেবল বঙ্গ প্রদেশে ৪০০ মহিলা সতী প্রথার শিকার হয়েছিল। সমাজের রক্ষনশীল গোষ্ঠী একে এত সমর্থন করতেন যে মোগল সম্রাট আকবর, ঔরঙ্গজেব, মারাঠা, পেশত্বা তথা জয়পুর রাজা জয়সিংহ পর্য্যন্ত একে রদ করতে পারেন নি।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজরা এই অমানবিক প্রথা উচ্ছেদ কারা জন্য দৃঢ় পারকর হলো। ১৮২৯ সালে বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিং সতীদাহ প্রথাকে আইনতঃ অপরাধ বলে ঘোষনা করিলেন। সরকারী নির্দ্দেশের বিরুদ্ধে সতী প্রথার সমর্থকরা অনেক প্রতিবাদ করলেও তিনি মাথা নত করলেন না। কন্যা হত্যাছিল আরও একটি অমানবিক কুসংস্কার। বিশেষ করে রাজপুত জাতি বংশে তথা আরও কযেকটি জাতিতে কন্যা সন্তান সহজে গ্রহন করা হত না। যুদ্ধে পুরুষরা অধিক সংখ্যায় নিহত হওয়ার জন্য কন্যার বিবাহ কে একটি সমস্যা বলে মনে করা হত।

উইলিয়াম বেন্টিংক

আবার যৌতুক ব্যাপারটাও কন্যার বিবাহে বাধক ছিল। কৃষি কার্য্যে আবশ্যক কঠিন পরিশ্রমের জন্য কন্যা উপযুক্ত নয় বলে মনে করা হত। এই সব কারনের জন্য কন্যা সন্তানকে শিশু অবস্থাতেই হত্যা করা প্রথায় পরিনত হয়েছিল। কন্যা সন্তান হত্যার বিরুদ্ধে প্রথমে ১৭৯৫ এবং পরে ১৮০৪ সালে সরকার নিষেধাজ্ঞা জারি

করেছিল। বেন্টিং ও হাতিস্ত এর সময়ে সেটা কড়াকড়ি ভাবে লাগু করা হোলো। এতদ ব্যাতীত কিছু অঞ্চলে আদি বাসীদের প্রচলিত নরবলি প্রথাও সরকার বন্ধ করেছিল। ১৮৫৬ সালে আইনের বলে বিধবা বিবাহ আইন সম্মত বলে আদেশ জারি হলো।

বাল্যবিবাহ প্রথা উচ্ছেদ পদক্ষেপ স্বরূপ ১৮৭২ সালে দেশীয় বিবাহ আইন ও ১৮৯১ সালে সম্মতি প্রকাশ বয়স আইন প্রনীত হলো। পরে ১৯৩০ সালে সারদা আহনে পুরুষদের বিবাহ বয়স সর্বনিম্ন ২১ বছর ও মহিলাদের জন্য ১৮ বছর ধার্য্য করা গেল।

ইংরেজদের তরফে সামাজিক কুসংস্কার উচ্ছেদ করার পেছনে কিছুটা ঔপনিবেশিক স্বার্থ জড়িত ছিল। প্রথমতঃ জাতি প্রথার মত কুসংস্কারকে ধ্যান দেওয়া হলো না, কারন এদ্বারা সরকারের স্বার্থ সাধিত হবে না। দ্বিতীয়তঃ সমাজ সংস্কার দ্বারা ভারতে পাশ্চাত্যের অনুগামী করা সহজ হবে। তৃতীয়তঃ ভারতের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি বর্গ ও খ্রীষ্টান ধর্ম যাজকেরা ও সরকার কে সমর্থন জানাবে। রাজ্য রামমোহন রায় ও ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বিচারবন্ধ ব্যাক্তিত্ব এইসব কুসংস্কার উচ্ছেদ করতে সমাজ সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন। সরকারের পদক্ষেপের জন্য তাঁরা সরকারকে আকুণ্ঠ সহযোগে প্রদান করলেন। তাঁদের সহযোগ বিনা সরকারকে সংস্কারের ক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা হাসিল হতোনা। এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। বিশেষ করে বাল্য বিধবার মত সামাজিক কুসংস্কার দমন করার জন্য সরকারী নিয়ম কানুন প্রনীত হলো সত্যি কিন্তু সমাজ সংস্কার আন্দোলন সেই দিকে অধিক সচেতনতা সৃষ্টি করলো।

ভারতীয় নব জাগরণ সামাজিক ধার্মিক সংস্কার আন্দোলনঃ

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন হওয়ার পরে উনবিংশ শতাব্দী তে দেশে এক আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবি বর্গের অভ্যুদয় হল। এই বর্গের সংখ্যা বেশী ছিল না। কিন্তু পাশ্চাত্য ও আধুনিক বিচারযুক্ত হয়ে এই বর্গ দেশের সামাজিক ওসামুহিক উন্নতির কথা চিন্তা করলেন এবং দেশের অধঃপতনের জন্য সামাজিক কুসংস্কার গুলি অন্যতম কারন বলে বিবেচনা করলেন। দেশকে একটি উন্নত ও আধুনিক রাষ্ট্র রূপে গড়তে হলে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে কুসংস্কার দুর করতে এরা সংস্কারকের ভূমিকা নিয়ে জনজেতনা সৃষ্টি করলেন এবং কুসংস্কার উচ্ছেদে ইংরেজ সরকারকে সহযোগ করলেন।

রাজা রাম মোহন রায় ও ব্রাহ্ম সমাজঃ

উনবিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হওয়া সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পুরোধা হলেন রাজা রাম মোহন রায়। তিনি জানতের যে ধর্মে কুসংস্কার গুলোর অনুপ্রবেশ ভারতীয় সমাজের দুর্গতির কারন। তাই সমাজে সংস্কার আনতে তিনি ১৮২৮ সালে কলিকাতায় ব্রাহ্ম সভা স্থাপন করেছিলেন। এটি ১৮৩০ সালে ব্রাহ্ম সমাজ নামে নামি হয়েছিল।

এই সংগঠন মূর্ত্তিপূজা, সতীপ্রথা, বহু বিবাহ প্রথা, জাতি প্রথা তথা পর্দা প্রথা কে বিরোধ করত। নারী শিক্ষার প্রসার ও সতী প্রথার উচ্ছেদের জন্য সরকারকে সহযোগ করতো। কেশব চন্দ্র সেন ও মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের অন্য দুই প্রমুখ সংস্কারক। সংস্কার আন্দোলন কে ব্যাপক করার উদ্দেশ্যে এই সমাজের শাখা মাদ্রাজ ও বম্বেতে গঠিত হয়েছিল। রাজা রাম মোহন রায় সংস্কৃত, ফার্সি, আরবী হিন্দী, ইংরাজী, ল্যাটিন, ফরাসী ও বাংলা ভাষা জানতেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের সমন্বিত অধ্যায় বিনা প্রকৃত জ্ঞান সম্ভব নয় বলে তিনি বলতেন।

রাজা রামমোহন রায়

স্বামী বিবেকানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশনঃ

নিজের গুরু রামকৃষ্ণ পরম হংশের নামে স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৯৭ সালে সমাজ সংস্কারের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বিবেকানন্দ ছিলেন একজন

মানববাদী। মানব সেবাই ঈশ্বর সেবা বলে তিনি বলতেন। সমাজে সমানতা, ব্যাক্তি স্বাধীনতা ও মুক্ত বিচার ধারা কে মহত্ব দিতে হলে জাতিপ্রথা, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসকে বিরোধিতা করতে হবে বলে তিনি তর্ক করতেন। জন সেবাকে ধর্ম সংস্কারের মূল আধার রূপে প্রতিষ্ঠা করার পথে রামকৃষ্ণ মিশন বহুসংখ্যায় বিদ্যালয় পাঠাগার চিকিৎসালয় তথা অনাথ আশ্রম স্থাপন করলো।

রামকৃষ্ণ পরমহংস

মহাদেব গোবিন্দ রানড়ে ও প্রার্থনা সমাজ ঃ ধর্ম ও সমাজকে কুসংস্কার মুক্ত করার চিন্তাধারা বঙ্গদেশ থেকে আরম্ভ হয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে প্রসারিত হল। মহাদেহব গোবিন্দ রানাডে বম্বেতে ১৮৬৭ সালে প্রার্থনা সমাজ প্রতিষ্ঠঅ করেন রামকৃষ্ণ ভান্ডারকর ছিলেন তাঁর প্রমুখ সহযোগী। প্রার্থনা সমাজ জাতি প্রথা ও অস্পৃশ্য কাতরের তীব্র বিরোধীতা করত এবং বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা ও হিন্দু মুসলমান একতার বড় সমর্থক ছিলেন। রানাডে বলতেন যে হিন্দু মুসলমান একতা বিনা ভারতের মতো এক বিশাল রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব নয়। লোকহিতকারী জ্যোতিবা রাওপুলে ও গোপালহরি দেশমুখ মহারাষ্ট্রের অন্যদুজন প্রমুখ সমাজ সংস্কারক ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩) ও আর্য্য সমাজ ঃ

পশ্চিম ও উত্তর ভারতে দয়ানন্দ সরস্বতী ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ব্যাপক করেছিলেন। এর জন্যে তিনি ১৮৭৫ সালে আর্য্যসমাজ স্থাপন করিছিলেন। দয়ানন্দের মত ছিল বেদ হচ্ছে সকল জ্ঞানের মূল উৎস। তাতে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের স্থান নেই। বেদের প্রচারকভাবে

তোমার জন্য কাজ

তোমারে স্থানীয় অঞ্চলে কিকি প্রকারে কুসংস্কার পরিলক্ষিত হচ্ছে? সেগুলো নিরাকরনের জন্য সম্বাদ পত্রের মাধ্যমে জন সচেতনতা সৃষ্টি কর।

তিনি জাতিভেদ, বাল্য বিবাহ ও সামাজিক ভেদাভেদকে বিরোধ করতেন, এবং বিধ্বা বিবাহকে দৃঢ় সমর্থন করতেন।

ওড়িশায় সমাজসংস্কার আন্দোলন ঃ

ওড়িশায় ফকীর মোহন সেনাপতি , মধূসূদন রাও, ও প্যারী মোহন আচার্য্য প্রমূখ নিজ রচনার মাধ্যমে বাল্য বিবাহের তীব্র বিরোধে করেছিলেন এবং বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা ও মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রসারে যুক্তি রেখে ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরঅর্ধে হরিহর দাসশর্মা নামে জনৈক পন্ডিত সংস্কৃতের সহিত ইংরাজী, গ্রীক ও ল্যাটিন ইত্যাদি শিক্ষার

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

তুমি কি জান ?

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেরলের নারায়ন গুরু আদি, আরও অনেকে এই সময় সমাজ সংস্কারে আন্দোলনকে তীব্র করেছিলেন।

জন্যে পূরীতে এক নতুন ধরনের সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন রক্ষনশীল হিন্দূগণ, কাগজ কলমের সাহায্যে অধ্যায় করলে জ্ঞাত যাবে বলে বলতো এর বিরোধ হরিহর লোকেদের কাজ কলম ব্যবহার করতে উৎসাহিত করলেন। সামাজিক ধার্মিক সংস্কার আন্দোলনের একটি দূর্বলতা ছিল যে এটা কেবল

ফকির মোহন সেনাপতি

সমাজের মধ্যম ও উচ্চ বর্গের মধ্যে সীমিত ছিল। সমাজের সাধারন বর্গে এর প্রভাব বিশেষ ভাবে অনুভুত হয়নি। দ্বিতীয়ত ঃ এই সামাজিক আন্দোলনের পেছনে সংস্কারক গনের যে উদ্দেশ্য ছিল তাহা ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। কয়েকটি নির্দিষ্ট কুসংস্কার উচ্ছেদ করার জন্য আইন প্রনয়নের কালে ঔপনিবেশির স্বার্থ সাধন সরকারের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সংস্কারক গন রাষ্ট্র গঠন ও রাষ্ট্রের উন্নতি চাইতেন। এই কারনে তাঁদের আবশ্যক মাত্রায় সরকারের পক্ষ থেকে সাহায্য সহযোগ প্রাপ্ত হতো না। উদাহরণ স্বরূপ সংস্কারক গন চাইতেন মাতৃভাষার মধ্যমে আধুনিক শিক্ষা ও নারী শিক্ষার প্রসার। কিন্ত এর জন্যে সরকারের সহযোগ পাওয়া গেল না। উনবিংশ শতাব্দীর এই আন্দোলন পরপর্ত্তী সময়ে লোকেদের মন থেকে নিজ সংস্কৃতি ও সামাজিক পরম্পরা নিয়ে হীন মন্যতা দূর করতে তথা স্বাধীনতা সংগ্রাম দৃঢ় করতে সহায়ক হয়েছিল।

আমরা কি শিখলাম ?

- সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ
- ব্রহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ ও আর্য্য সমাজের রাজত্ব।
- সমাজিক সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব
- চার্টর আইন প্রণয়ন
- ভারতের নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা
- নারী শিক্ষার মহত্ব।

প্রশ্নাবলী

১। প্রায় ৭৫টি শব্দে উত্তর দাও।

ক) সামাজিক সংস্কার আন্দোলন কেন আরম্ভ হয়েছিল ?
খ) ওড়িশায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ওপরে টিপ্পনী লেখ।
গ) বিজ্ঞান ও বৈষয়িক শিক্ষার প্রতি ইংরেজদের মনোভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।
ঘ) ইংরেজ শাসন কালে শিক্ষার সম্বন্ধে তাদের মধ্যে হওয়া বিতর্কের সূচনা দাও।
ঙ) স্বামী বিবেকানন্দর বিচার ধারা বিশ্লেষন কর।

২। নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ২০ টি শব্দে দাও।

ক) সতী প্রথা কি ?
খ) কন্যাহত্যার প্রমুখ কারন দর্শাও।
গ) ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে কি প্রমূখ উদ্দেশ্য ছিল ?
ঘ) প্রার্থনা সমাজ কে এবং কেন আরম্ভ করেছিলেন ?
ঙ) রাম কৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা কে ?

৩। **শূন্যস্থান পূরণ কর।**

ক) উড্‌স ডেসপ্যাচ .....সালে অনুমোদিত হয়েছিল।

খ) ১৮৬৮ তে ওড়িশার ..... নামক স্থানে কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

গ) কলিকাতায় .....সালে বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

ঘ) ওড়িশায় প্রথম মেডিক্যাল স্কুল ..... সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ঙ) আর্য্য সমাজ ..... সালে স্থাপিত হয়েছিল।

৪। **'ক' স্তম্ভের সহিত 'খ' স্তম্ভ যোগ করঃ**

'ক' স্তম্ভ	**'খ' স্তম্ভ**
বিবেকানন্দ	আহমদিয়া আন্দোলন
মহাদেব গোবিন্দ রানাডে	আর্য্য সমাজ
রাজা রাম মোহন রায়	রামকৃষ্ণ মিশন
দয়ানন্দ সরস্বতী	ব্রাহ্ম সমাজ
মির্জা গোলাম আহমেদ	প্রার্থনা সমাজ

৫। ভারতীয় নবজাগরণের ধার্মিক ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলনে মূখ্য ভূমিকা যাঁরা গ্রাহন করেছিলেন, তাদের ফটো সংগ্রহ করে একটি অ্যালবাম তৈরী কর।

●●●

তৃতায় অধ্যায়

ইংরেজ শাসনকে প্রতিরোধ

জয়ী রাজগুরু

ইংরেজরা ভারতে বানিজ্য করতে এসে ধীরে ধীরে রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রবেশ করল। তারা একটার পর একটি রাজ্য তাদের সাম্রাজ্য জুড়তে লাগল। ১৮০৩ সালে তারা ওড়িশা অধিকার করে নিল। এর প্রতিবাদ হল। খোর্দা তে ১৮০৪ সালে বিদ্রোহ হল। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন জয়ী রাজগুরু।

জয়ী রাজগুরু

বাল্যাবস্থাঃ

শহীদ জয়ী রাজগুরু ১৭৩৯ অক্টোবর ২৯ তারিখে পবিত্র কার্ত্তিক মাসের শুক্ল নবমী তিথিতে পুরি নিকটস্থা বীর হরে কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম চাঁদ রাজগুরু ও মাতার নাম হারমনি তাঁর পূর্বপুরষেরা খোর্দা রাজাদের উপদেষ্টা ও আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন। তাই পারম্পরিক রীতি তে তাঁদের রাজগুরু বলা হত। বাল্যকালে জয়ী রাজগুরসিংস্কৃতে অগাধ পান্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। তিনি বেদ, পুরনে ও ধর্ম গ্রন্থ প্রভৃতি অধ্যয়ন করে হাজার হাজার শ্লোক রচনা করায় পন্ডিত গনের মধ্যে তাকে বিদ্বান আখ্যা দেওয়া হয়েছিল।

রাজ সভায় আবির্ভাবঃ

জয়ী রাজগুরু রাজা দিব্যসিংহ দেবের রাজসভায় প্রথমে একজন পন্ডিত হয়ে নিযুক্তি পেয়েছিলেন। তার পিতা চাঁদ রাজগুরুর মৃত্যুর পরে তিনি মন্ত্রী তথা রাজগুরু ভাবে অধিষ্ঠিত হলেন।

তাঁর জ্ঞান গরিমায় মুগ্ধ হয়ে আটগড়ের রাজা ধনঞ্জয় হরিচন্দন জয়দেব তাঁকে রাজসভায় নিতে চাইলেন, কিন্তু তিনি যাননি। রাজা দিব্য সিংহের মৃত্যুর রাজার নাবালক পুত্র ২য় মুকুন্দদেব রাজা হলেন। জয়ী রাজগুরু তাঁর অভিভাবক রূপে কার্য্য করলেন। তিনি ১৭৯৮ সালে সমস্ত প্রকার শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রন নিজের হাতে নিলেন। রাজা দিব্যসিংহের মৃত্যুর পরে ছোট ছোট

তোমার জন্য কাজঃ

জয়ী রাজগুরুর মত ওড়িশার অন্য বিপ্লবী গনের তালিকা প্রস্তুত কর।

রাজ্যগুলির মধ্যে অন্তযুর্দ্ধ হল। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এরকম এক সংকট কালীন সমস্যাবহুল সময়ে জয়ী রাজগুরুর ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিলঃ

প্রশাসনিক তথা সামরিক পরিচালনাঃ

এই সময়ে খোর্দ্দাতে পাইকরা একত্রিত হলেন। জয়ী রাজগুরু পাইকদের যুদ্ধ বিদ্যায় উপযুক্ত প্রশিক্ষন দেওয়ার জন্যে বিভিন্ন স্থানে আখড়া স্থাপন করলেন পাইকরা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হলেন। ইংরেজরা খোর্দ্দা অধিকার করার উপায় খুজঁতে লাগল। ইংরেজ প্রশাসক কর্ণেল হারকোর্ট খোর্দ্দা রাজ্য কে কবলিত করতে কূটনীতি অবলম্বন করে নানা প্রকার প্রলোভন দেখান। একলক্ষ টাকা পুরষ্কার পাওয়ার সাথে সাথে।

(পাইক আখড়া)

তুমি কি জান ?

যেখানে যুদ্ধনৃত্য ইত্যাদি অভ্যাস করা হয় তাকে আখড়া শালা বলে আখড়ায় পাইকরা সময় অভ্যায় করেন।

তিনি হারানো ৩টি মারাঠা কবলিত প্রগনা যথা রাহাঙ্গ, সরাই, চব্বিশকু ও লেম্বাই ফিরে পাবেন বলে তাঁকে প্রলোভন দেখানো হল। রাজা মুকুন্দ দেবের লোভ হল। তিনি ইংরেজদের সাহায্য করলেন। জয়ী রাজগুরু ইংরেজদের বিশ্বাস করতে মানা করলেন। কিন্তু রাজা মানলেন না। ইংরেজরা বিশ্বাসঘাতকতা করল। মুকুন্দদেব কোনো প্রগনা পেলেন না।

প্রতিক্রিয়া ও যুদ্ধঃ

ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে জয়ী রাজগুরু মুকুন্দদেবকে পরামর্শ দিলেন। রাজা মুকুন্দদেব ইংরেজদের কোনো আদেশ মানলেন না। তিনি মারাঠাদের সাহায্যে খোর্দ্ধা থেকে ইংরেজদের তাড়ানোর স্থির করলেন। পাইক সেনাদের সাহায্যে ১৮০৪ অক্টোবর মাসে পিপিলিতে ইংরেজদের আক্রমন করলেন। কর্ণেল হারটোর্ক মেজর ফ্লোচারকে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যদের নেতৃত্ব নিয়ে আসতে নির্দ্দেশ দিলেন। মেজর ফ্লেচার অনেক সৈন্য নিয়ে এসে পৌছালেন। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে প্রবল যুদ্ধ চলল, পাইকরা বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করলেন। কিন্তু ইংরেজ দের রনকৌশল ও আধুনিক অস্ত্রের কাছে পাইক সেনারা হার মানলো। ১৮০৪ ডিসেম্বর ৪ তারিখে খোর্দ্ধা ইংরেজ অধিকৃত হল। ইংরেজরা বরুনেই দূর্গ অধিকার করল। রাজা দ্বিতীয় মুকুন্দদেব ও জয়ী রাজগুরু দূর্গ ত্যাগ করে পলায়ন করলেন। ডিসেম্বর ৫ তারিখে রাজাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে ঘোষনা করা হল। জয়ী রাজগুরুকে বহুচেষ্টায় ধরা হল। মুকুন্দ দেবকে বারবাটী দুর্গে বন্দী করে রাখা হল, তারপরে মুক্ত করে জগন্নাথ মন্দিরের দায়িত্বে পূরীতে রাখা হল।

জয়ী রাজগুরু শহীদ হলেনঃ

ইংরেজরা বিচার করে জয়ী রাজগুরু কে দোষী সাব্যস্ত করল। দন্ড স্বরূপ মেদনীপুরে একটি বট গাছের দুটো ডালকে একত্রিত করে তাতে ওনাকে বেধে নিষ্ঠুর ভাবে ফাঁসী দেওয়া হল। শহীদ বিপ্লবি জয়ী রাজগুরুর দেশ প্রেম, দেশভক্তি, ও ত্যাগের কোনো তুলনা নেই।

তোমার জন্য কাজঃ

শ্রেনী শিক্ষকের সহায়তায় জয়ী রাজগুরুর নাটিকা প্রস্তুত কর।

ওড়িশায় পাইক বিদ্রোহ (১৮১৭) ও বক্সী জগবন্ধুর ভূমিকাঃ

ইংরেজরা ১৮০৩ সালে ওড়িশার উপকূলবর্ত্তী অঞ্চল অধিকার করে শাসন প্রতিষ্ঠা করার ফলে ওড়িশার শাসন মারাঠাদের কাছ থেকে ইংরেজদের হাতে গেল। জয়ী রাজগুরু ইংরেজদের বিরোধিতা করে শহীদ হলেন। এর পরে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। ফলে মোর্দ্ধায় পাইক বিদ্রোহ সংগঠিত হল। ওড়িশাষ মোগল ও মারাঠা শাসন কালে

পাইক বিদ্রোহ

পদাতিক সৈন্য বাহিনী ছিল। তারা সাধারন সময়ে কৃষি কার্য্য করতো ও যুদ্ধের সময় সৈন্য ভাবে যুদ্ধ করতো। তাই তাদের পাইক বলা হত। নিম্ন লিখিত কয়েকটি কারনের জন্য পাইক গণ ইংরেজর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

রাজনৈতিক কারণঃ

ইংরেজ সরকার খোর্দ্ধার রাজাকে বন্দী করা ও জয়ী রাজগুরুকে ফাঁসি দেওয়ায় জন্য সাধারন ক্ষুদ্ধ হয়েছিল।

সামাজিক তথা অর্থনৈতিক কারনঃ

ইংরেজ শাসক গন ওড়িশা বাসীর প্রতি অন্যায় করল। তাতে ওড়িশাবাসী খুব অসন্তুষ্ট হল। জন সাধারন আর্থিক অনটনের সম্মুখীন হল। কৃষি কার্য্য পাইকদের জীবিকা ছিল। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তারা যুদ্ধ করত বলে বিনা খাজনায় জমি উপভোগ করত।

ইংরেজরা ওড়িশা দখল করার পরে সেই জমির জন্য পাইকদের খাজনা দিতে হল। খাজনা আদায়ের সময় সরকারী কর্মচারীরা পাইকদের ওপরে অন্যায় অত্যাচার

চালালো খাজনার হার বাড়িয়ে দেওয়া হল। ফসল হানির সময়ও অধিক রাজস্ব আদায় করা হল। সাধারন প্রজাদের প্রতি শাসক সম্বেদন শীল হল না। রাজার সময় কড়িছিল বিনিময় মাধ্যম। ইংরেজরা টাকায় খাজনা দিতে বাধ্য করল।

তোমার জন্য কাজঃ

পাইকরা ব্যবহার করা অস্ত্র শস্ত্র, পোষাক, এবং যুদ্ধের শৈলীর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কর।

টাকা দিতে না পারলে তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করা হতে লাগল। সরকারী আইন ও নীতি নিয়ম সব ওড়িয়া ভাষায় অনুবাদ করা হলো না। কেবল বাংলা ও ফার্সীতে অনুবাদিত হল। এর ফলে প্রজারা সরকারী নীতি নিয়ম ঠিকমত বুঝে উঠতে পারল না। এই সুযোগে প্রশাসনিক অফিসার ও পুলিশ কর্ম চারী ওড়িয়াদের প্রতি অত্যাচার করল।

স্বল্প মেয়াদী স্বরাজস্বপ্রথা প্রচলিত হল। ওড়িয়া জমিদার গন ঠিক সময়ে রাজস্য প্রদান করতে না পেরে জমিদারী হারালেন। বঙ্গের ধনীক শ্রেনীর লোকেরা এই জমিদারী কিনলেন তারা সাধারন লোকের কাছ থেকে বেশী করে রাজস্ব আদায় করতে লাগলেন। এর ফলে লোকেরা অর্থনৈতিক অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে পড়ল। সরকার লবন নীতিতে একচেটে মনোভাব পোষন করল। আগে তারা মুক্ত ভাবে নুন তৈরী করে ব্যবহার করতে পারছিল। ইংরেজ শাসন কালে লোকেরা নুন তৈরী করে ব্যবহার করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। নুনের দাম আগের থেকে ৬ গুন বেশী হয়ে গেল। নুনের মত অত্যাবশ্যক নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য লোকেরা কিনতে পারল না। সরকারের নুন তথা অন্যান্য অর্থনীতির ওপরে সাধারন অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল

তোমার জন্য কাজঃ

গ্রাম সভা ডেকে লবন সমস্যার ওপর অলোচনা কর।

প্রত্যক্ষ কারনঃ

ইংরেজ সরকারের প্রিয়াপ্রীতি, তোষন ভাব, অন্যায়, অত্যাচার, আমলাদের দুর্নিতি, বাংলার অফিসারদের ওড়িয়াদের প্রতিখারাপ ব্যবহার ও সর্বোপরি সর্বরাকারদেরে কূট চক্রান্ত দ্বারা খোর্দ্দা রাজার সেনাপতি জগবন্ধু কে তাঁর জমিদারী থেকে বঞ্চিত করার জন্য খোর্দ্দায় পাইক বিদ্রোহ হয়েছিল।

তুমি কি জান ?

খাজনা উসুল করে জমিদার বা সরকারের কাছে দাখিল করার কর্মচারীকে সব্বরাকরে বলা হয়।

বক্সি জগবন্ধুর পুরো নাম ছিল বক্সি জগবন্ধু বিদ্যাধর ভ্রমরবর রায় মহাপাত্র। 'বক্সি' কথার মানে হচ্ছে সেনাপতি। ইংরেজ সরকারের চক্রান্ত তিনি রাজার কাছ থেকে পাওয়া চোড়ঙ্গ মন্ডলের জাগিরী হারিয়ে ছিলেন। তাই তিনি ক্ষুদ্ধ হলেন। আগেই সাধারন জনতা ও পাইকারা অসন্তুষ্ট ছিল। এই সুযোগে বক্সি জগবন্ধু ক্ষুদ্ধ পাইকদের নেতৃত্ব নিলেন জগবন্ধুর প্রতি অন্যায় হয়েছে বলে বিদ্রোহী জনতা অনুভব করল। বক্সির নেতৃত্বে পাইকরা সংগঠিত হল।

বক্সি জগবন্ধু

তুমি কি জান ?

সৈনিক বা অন্যান্য কোনো কার্য্য করার জন্য পুরস্কার স্বরূপ নিষ্কর জমিকে জাগিরী বলে।

বিদ্রোহী পাইকরা বানপুর থানা আক্রমন করল। অনেক পাইক ও সাধারন জনতা বিদ্রোহে সামিল হলো। বিদ্রোহী রা খাজনা খানা লুট করল। সরকারী কমচারীরা স্থান ছেড়ে পালাল। ইংরেজ কর্মচারীদের বনে জঙ্গলে লুকিয়ে লুকিয়ে আক্রমন করল। বিদ্রোহীরা পূরীতে পৌঁছে রাজা দ্বিতীয় মুকুন্দ দেবকে খোর্দ্দার রাজা রূপে ঘোষনা করল।

তাকে খোর্দ্দা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করায় ইংরেজ সরকারে

তাঁকে বারবাটী দূর্গে বন্দী করে রাখলো। এই বিদ্রোহ পূর্বী জেলার বানপুর, পিপিলি ও গোপ অঞ্চলে বিস্তারিত হয়েছিল। কটক জেলার ঝঙ্ক ও কুজঙ্গ পর্য্যন্ত এটা বিস্তৃত হয়েছিল। বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজরা আপ্রান উদ্যাম করল। অনেক বিদ্রোহী আত্ম সমর্পন করল। বক্সি জগবন্ধু সমর্পন করলেন না। ১৮২৩ সালে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে দেওয়া হল। তিনি আত্ম গোপন করলেন। তাঁকে সম্মানে বৃত্তি প্রদান করা হবে বলে ইংরেজ সরকার ঘোষনা করল। তাই তিনি দীর্ঘ দিনের আত্মগোপনের পরে ১৮২৫ সালের মে মাসে কটক শহরে ইংরেজ সরকারের কাছে আত্ম সমর্পন করলেন। তাঁকে কটক শহরে নজর বন্দী করে রাখা হল। ১৮২৯ শে জানুয়ারী ২৪ তারিখে তিনি হইনীলা সম্বরন করেন।

তোমার জন্য কাজঃ
বক্সি জগবন্ধুর নামে নামিত ওড়িশার শিক্ষানুষ্ঠান গুলির নাম লেখ এবং কোথায় অবস্তিত লেখ।

ওড়িশায় আদিবাসী বিদ্রোহঃ

ঘুমুসরে কন্ধ বিদ্রোহঃ

১৮৩৫ সালে ইংরেজ সরকার দক্ষিন ওড়িশার ঘুমুসর অধিকার করে কন্ধদের ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করল। কন্ধরা ইংরেজদের প্রতিরোধ করল। একে ঘুমুসর বিদ্রোহ বলা হয়। দোরা বিশোই ও চকরা বিশোই এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিয়েছিল।

ঘুমুসর রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জ ইংরেজ সরকারকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কর দিতে পারলেন না। তাই ১৮৩৫ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করল। দোরা বিশোই কন্ধদের মুখ্য নেতা ছিল। সে রাজা ধনঞ্জয়ের একান্ত বিশ্বস্ত অনুগামী ছিল। তিনি কন্ধদের একত্রিত করে বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল। কন্ধরা ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমন করে প্রভুত ক্ষতি করল। কন্ধ বিদ্রোহ দমন করার জন্য মাদ্রাজ থেকে সেনাবাহিনী এসেছিল।

দোরা বিশোই এর নেতৃত্বে কন্ধরা ইংরেজ সৈন্যদের আক্রমন করল। ১৩ জন সৈন্য ৩২ জন সেনাপতি নিহত হলো।

তোমার জন্য কাজঃ
ওড়িশাতে বাস করতে থাকা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আদিবাসীদের বেশভূষা চাল চলন প্রভৃতির বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কর।

ইংরেজরা যুদ্ধ বন্ধ করলো। কন্ধদের আর কর দিতে হবে না বলে ঘোষনা করা হল। তবুও কন্ধরা না মেনে বিদ্রোহ চালু রাখলো। ইংরেজ সরকার দোরা কে ধরিয়ে দিতে ৫ হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষনা করল। দোরা বিশোইকে অনুগুলে ধরে মাদ্রাজে পাঠানো হল। সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। চকরা বিশোই দোরা বিশোই এর ভাইপো ছিল। ইংরেজরা কন্ধদের আর্থিক অবস্থার প্রতি ধ্যান দিল না।। ১৮৪৬ সালে কন্ধরা আবার বিদ্রোহ করল। বনজঙ্গলে লুকিয়ে চুরিয়ে চকরা ও তাঁর সহযোগীরা ইংরেজদের আক্রমন করতে লাগল। ইংরেজ সৈন্যরা তার আক্রমন প্রতিরোধ করতে পারল না। তখন গর্ভনর জেনারেল ডেলাহাউসি চকরা কে ধরিয়ে দিতে তিন হাজার টাকা পুরষ্কার ঘোষনা করেছিল। চকরা বিশোই সোনপুর রাজার আশ্রয়ে আছেন বলে ইংরেজ সরকার জানতে পা রল। ইংরেজ চকরা বিশোইকে সমর্পন করতে আদেশ দিল। বৌদের রাজা চকরা বিশোইকে সাহায্য করছে সন্দেহ করে, রাজার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ধমক দিয়েছিল।

চকরা বিশোই যুব কন্ধদের নিয়ে বিদ্রোহ চালু রেখেছিল। ইংরেজ শাসক বিদ্রোহ দমন করতে প্রত্যক্ষ শাসন নিজের হাতে নিলেন। কন্ধমাল ইংরেজর হাতে গেল। চকরা বিশোই ঘুমুসর গেলেন। ঘুমুসরের রাজ পরিবার তাঁর থাকা চাইলেন না। ফলে তিনি কালাহান্ডির মদনপুর ও পরে বলাঙ্গীরের পাটনায় চলে এলেন। তাঁকে ধরতে চারিদিকে পরোয়ানা জারি করা হলো, কিন্তু সব বিফল হল। তিনি ধরা পড়লেন না।

১৮৫৬ পর্য্যন্ত তাঁর বিষয়ে কোনো খবর পাওয়া গেল না। তিনি নিখোঁজ হয়ে রইলেন। বহু বাধা বিঘ্নর পরেও

তুমি জান কি ?
সরকারী নির্দ্দেশ নামা ও আজ্ঞাপত্রকে পরোয়ানা বলা হয়।

শক্তিশালী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে তিনি আমৃত্যু নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্রোহ জারি রেখে ছিলেন।

কেন্দুঝর ভূইঁয়া বিদ্রোহ ঃ

ওড়িশায় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যে সব আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রতিরোধ সংগ্রাম বিভিন্ন স্থানে দেখা

তোমার জন্য কাজ ঃ
ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে দোরা বিশোই এংব চকরা বিশোই এর ভূমিকার বিষয়ে অধিক তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা কর।

গিয়েছিল, তার মধ্যে কেন্দুঝরের ভূইঞাঁ বিদ্রোহ অন্যতম। ১৮৬৮ সালে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন রত্না নায়ক। তাই এই বিদ্রোহ কে 'রত্নমেলি' ও বলা হয়।

কেন্দুঝরের রাজা ছিলেন গদাধর ভঞ্জ। তাঁর পরে তাঁর পোষ্য পুত্র বৃন্দাবন ভঞ্জকে রাজত্ব করার সুযোগ দেওয়া হল না। তখন কমিশনার ছিলেন রেভেন্সা। তিনি বৃন্দাবন ভঞ্জকে রাজত্ব থেকে বঞ্চিত করে ধনঞ্জয় ভঞ্জকে গদিতে বসাতে সাহায্য করল।

গদাধর ভঞ্জের রানী বিষ্ণুপ্রিয়া ধনুর্জয় ভঞ্জকে সমর্থন করতেন না। আদীবাসী ভূইঁয়ারাও ধনুর্জয় ভঞ্জকে সমর্থ করতো না। ভূইঞারা কোল ও জুয়াঙ্গ প্রভৃতি আদিবাসী সম্প্রদায়ের সহায়তা ও সমর্থনে ইংরেজ সরকারের এতদৃশ মনোমুখী কার্য্য কলাপকে। বিরোধ করল। রত্না নায়ক এই সংগঠনের নেতৃত্ব নিলেন। রত্নানায়কের সঙ্গে নন্দনায়ক, নন্দা প্রধান, বাবু নায়ক ও পদু নায়ক প্রভৃতি অনেক নেতা যোগ দিলেন। তারা ১৮৬৮ সালে রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। তারা তরোয়াল, খন্ডা, কুড়ুল, তীরধনুক প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে কেঁউঝর দুর্গ অবরোধ করল।

দেওয়ান ও পুলিশদের করায়ত্ব করা হোলো। ইংরেজ সরকার অসুবিধায় পড়ল বলে অনুভব করল। ইংরেজদের সৈন্য শিবির নষ্ট করে দেওয়া হল। অন্য দিকে বলাই, পাল লহড়া, ডেঙ্কানাল, ও ময়ুরভঞ্জের রাজারা ইংরেজদের সাহায্য করল। বিদ্রোহ দমন করা হল। ভূইঁয়ারা আত্মসর্ম্পন করল। রত্না নায়ক ও নন্দ নায়ককে প্রানদন্ড দেওয়া হল।

তোমার জন্য কাজ ঃ
ভূইঞাদের জীবন যাপন প্রনালীর বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ কর।

১৮৯৮ সালে ভূইঁয়া সম্প্রদাযেৰ ধরনীধর ভূইঁয়া ইংরেজদের বিরোধে এক সংগঠনের নেতৃত্ব নিলেন। একে ধরনী মেলি বলা হত। রাজা ধনঞ্জয় ভঞ্জের শাসনে প্রজারা শোসিত ও নির্যাতিত অনুভব করত। প্রজাদের বিভিন্ন কর দিতে হতো। বেঠি প্রথার প্রচলন ছিল। প্রজাদের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে পড়ল। ১৮৯১ সালে বেঠিতে একটি বাঁধ নির্মান করতে রাজা আদেশ দিলেন। প্রজারা এর বিরোধ করে একত্রিত হলেন। ধরনী ধর এর নেতৃত্ব নিলেন। রাজ কোষ ও কারাগার আক্রমন করা হল। কিন্তু ধরনীধর কেউঁঝর গড় দখল করতে পারলেন না। শেষে তিনি বন্দী হলেন। এই ভাবে 'ধরনীমেলি'র যবনিকা পড়ল। বিদ্রোহ দমন করা হলেও ইংরেজ সরকারের কিন্তু চোখ খুলে গেল।

তুমি জান কি ?
বিনা বেতন বা পারিশ্রমিকে বাধ্যতা মূলক সেবা কে বেষ্টি বলা হয়।

কো'ল বিদ্রোহ ঃ

ময়ূর ভঞ্জ বাসীরা ইংরেজদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রেখেছিল। ১৮১০ সালে ইংরেজ শাসক ত্রিবিক্রম ভঞ্জকে ময়ূর ভঞ্জের রাজা হিসেবে স্বীকার করল। তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পুত্র যদুনাথ ভঞ্জ রাজার স্বীকৃতি পেল।

ময়ূর ভঞ্জের আদিবাসী সম্প্রদাযের মধ্যে কোল, সাওঁতাল, ও ভূমিজ প্রভৃতি প্রধান ছিল। ঘটনা ক্রমে কোল সম্প্রদায় ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ করল।

কোল অধিকৃত ভূমি দখল করতে সিংহভূমির রাজা উদ্যম করলেন। ১৮২০ সালে কোলেরা সিংহ ভূমি রাজা ঘনশ্যাম সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। রাজা বিদ্রোহ দমন করতে না পেরে ইংরেজ শাসকের সহায়তা চাইলেন বিদ্রোহ দমন হল। বামন ঘাটার জমিদার ময়ূর ভঞ্জের রাজার নিয়ন্ত্রন থেকে স্বাধীন থাকতে চাইলেন।

অপর দিকে রাজা জমিদারদের সমস্ত প্রকার ক্ষমতা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইলেন। এই বিবাদে জমিদারদের পক্ষে কোলরা সমর্থন করল।

১৮৩১ সালে ডিসেম্বর মাসে ইংরেজ কমিশনার স্টকওয়েল রাজা ও জমিদারদের বিবাদের সমাধান করতে বালেশ্বরে ডেকে পাঠালেন।

আলোচনা বিফল হল। কোলরা আবার বিদ্রোহ করল। স্টকওয়েল রাজাকে বল পূর্বক বিদ্রোহ দমন করতে নির্দ্দেশ দিল। বঙ্গ সরকার টমাসে উইলকিলসন্ কে বিদ্রোহের তদন্তের নির্দ্দেশ দিল। উইলকিনসন বিদ্রোহ করতে বঙ্গ সরকারকে পরামর্শ দিল। সরকার হস্তক্ষেপ করায় মাধব দাস মহাপাত্র বামন খাটীর জমিদার হল। সরকারের এই নীতি স্টকওয়েলে পছন্দ হল না। যার ফলে তিনি ১৮৩২ সালে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিলেন।

কোলেরা আবার হত্যা এবং লুণ্ঠন কার্য্যে মেতে উঠল। তারা বারম্বার বিদ্রোহ লিপ্ত থেকে বহু দুর্দ্দশায় ভূগল। অসন্তুষ্ট কোলেরা জমিদার মাধবদাস মহাপাত্রকে মেরে ফেলার হুমকি দিল। মাধব দাস নরসিংহ গড় পালিয়ে গেল। এই সুযোগে ময়ূরভঞ্জ রাজা সৈন্যদের সহায়তায় কোলদের বামন ঘাটী থেকে তাড়িয়ে নিজের অধীনে আনলেন। কিন্তু কোলরা তাদরে বিদ্রোহ অব্যাহত রাখল। উইলকিনসন বঙ্গ সরকারকে, এতে হস্তক্ষেপ করতে পরামর্শ দিল, কটকের কমিশনার হেনরী রিকেট ও সামরিক কার্য্যনুষ্ঠানের জন্য বঙ্গ সরকারকে পরামর্শ দিল। যার ফলে বিদ্রোহ দমন করতে সৈন্য বাহিনী পাঠানো হল। বিদ্রোহীরা আত্ম সমর্পন করল। এর ফলে কোল বিদ্রোহের অবসান ঘটল।

তোমার জন্য কাজ ঃ
কোলদের সমাজিক জীবনের বিষয়ে জানতে চেষ্টা কর।

সাঁওতাল বিদ্রোহ ঃ

ময়ূর ভঞ্জের রাজা শ্রীরাম চন্দ্র ভঞ্জদে ১৯১২ সালের ফেব্রুয়ারী ২২ তারিখে মৃত্যু বরন করলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে ইংরেজ সরকারের তরফ থেকে তিন জন প্রশাসনিক অধিকারী ময়ূর ভঞ্জের শাসন ভার গ্রহন করল। তারা বিদেশী হওয়ায় শাসন ভার সুপরিচালনার জন্য অঞ্চলিক সর্দার, প্রধান ও আমলাদের ওপর নির্ভর করল, শাসক ও শাষিতের মধ্যে প্রত্যেক্ষ সম্পর্ক রইল না। লোকেরাও নিজ রাজ্যে বিদেশী মুখ্য কে স্বাগত করল না। তারা বিদ্রোহ সাওঁতাল নেতা কঙ্কা মাঝি ও কালিয়া মহান্তর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল বলে একে ''সাঁওতাল বিদ্রোহ'' বলা হয়। নিম্ন লিখিত কারনগুলি সাঁওতাল বিদ্রোহের জন্য দায়ী।

রাজস্ব আদায় ঃ

ভঞ্জশাসন কালে সর্দ্দার, প্রধান, মুখিরা ও ছাটিয়া রা রাজস্ব আদায় করত। তারা সংগৃহীত রাজস্বের কিয়দংশ নিজের জন্য রেখে বাকিটা জমা দিত। শষ্যহানি হলেও রাজস্ব আদায় হচ্ছিল। রাজস্ব দিতে না পারলে আদায় কারীরা লোকেদের গরুমোষ বিক্রী করে দিত। তাদের বাস গৃহে তালা দিয়ে দিত।

তোমার জন্য কাজ ঃ
কোলদের সমাজিক জীবনের বিষয়ে জানতে চেষ্টা কর।

আমলাদের অবহেলা ঃ

রাজার শাসনকালে আমলারা বাহির অঞ্চলের লোক ছিলেন। রাজার পরে ইংরেজ শাসন কালে এরা তাদের নিজ কর্ত্তব্যে অবহেলা করতে লাগলেন। তারা গরীব আদিবাসী লোকেদের শোষন করতে লাগলেন। যার জন্য সাধারণ জনতা অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল।

সমাজে শ্রেনী বিভাগ ঃ

১৯১৭ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বে সমাজে প্রধানতঃ দুই শ্রেনীর লোকছিল। তারা হলেন শোষক ও শোষিত।

উচ্চ শ্রেনীর ধনী গোষ্ঠী ছিলেন শোষক। কৃষক, শিল্পী, ও গরীব সাঁওতালরা ছিল শোষিত। সমাজে এই বৈষম্য তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করল।

প্রতক্ষ কারন ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ফ্রান্সে কাজ করার জন্য আদিবাসীদের পাঠাবার চেষ্টা করল। এটাকে ময়ূর ভঞ্জের যুবরাজ পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জদের সমর্থন করলেন। যুব আদিবাসীদের চয়নকরার জন্য সর্দ্দারদের নির্দ্দেশ দেওয়া হল। এতে আদিবাসী যুব সম্প্রদায় উৎক্ষিপ্ত হল।

বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি ঃ

আদিবাসী সম্প্রদায় ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহের পরিকল্পনা করল। সাংস্কতিক কার্য্যক্রমের অছিলায় তারা একত্রিত হল। গাঁয়ের মুবিয়ারা নেতৃত্ব দিলেন। যুবকরা ঘরে ঘরে গিয়ে বিদ্রোহের বীজ বপন করতে লাগল। সাধারন জনতা ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগঠিত হল। রেনু গাঁয়ের কালিয়া মহান্ত, বেতনটীর কঙ্কা মাঝি, চিত্রডার নয়ন সিং ও ভীম মহান্ত প্রভৃতি নেতৃত্ব নিলেন।

বিদ্রোহের অগ্রগতি ঃ

১৯১৭ সালে বিদ্রোহীরা ইংরেজ বিরোধী অভিযান আরম্ভ করল। প্রথমে বেতনটীর হাটে ইংরেজ শাসক ও জমিদারের শোষন কে প্রতিবাদ করা হল। দোকান বাজার লুঠ করা হল। ব্রিটিশ অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হল। ব্রিটিশ অফিসার ভয়ে পালিয়ে গেল।

বিদ্রোহীরা বেতনটী আয়ত্ব করে নিল ইংরেজ সরকার ভয়ভীত হয়ে পড়ল। বিদ্রোহীরা রাস্তা পুল ভেঙ্গে দিল। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা কঙ্কা মাঝিকে রাজা, কালিয়া মহান্ত কে মন্ত্রী ও নযন সিংকে সেনাপতি রূপে সর্বসম্মতি ক্রমে নির্বাচিত করলো। কঙ্কা কালিয়া সরকার গঠন করা হল।

বিদ্রোহ দমন ঃ

ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমন করতে ময়ুর ভঞ্জের রাজ পরিবারের শরনাপন্ন হল। রাজা ও ইংরেজ সরকারের মিলিত বাহিনী ওপর বিদ্রোহীরা তীর নিক্ষেপ করতে লাগল কিন্তু বিদ্রোহীরা ইংরেজদের কামানের আক্রমন প্রতিহত করতে পারল না। সাধারন জনতা সমেত নেতা গ্রেফতার হল। প্রায় ৫ হাজার বিদ্রোহী বন্দী হল। এই ভাবে বিদ্রোহের যবনিকা পতন হল।

১৮৫৭ সালের মহান বিদ্রোহ

ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রথমে দুটি বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছিল। প্রথমে হল বানিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটে কারবার, করা ও দ্বিতীয়টি হল ভারতীয় বনিকরা যাতে কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতা না করে ইংরেজেরা নিজের দ্রব্য সকল অধিক মূল্যে বিক্রি করতে লাগল। কোম্পানী বম্বে কলিকাতা ও মাদ্রাজে বানিজ্য কুঠি নির্মান করেছিল। বানিজ্য কুঠি ও দূর্গ গুলি রক্ষা করার জন্য এবং সাম্রাজ্যর সুরক্ষা ও বিস্তারের জন্য কোম্পানী সৈন্য বাহিনী গঠন করল। যে সব ভারতীয় এই সৈন্য বাহিনী তে যোগ দিল তাদের সিপাই বলা হত। ১৮৫৭ সালে সেই সিপাহীরা কোম্পানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। এই বিদ্রোহের জন্য নিম্ন লিখিত কারনগুলি দায়ী।

রাজনৈতিক কারন ঃ

ইংরেজরা বানিজ্য করতে এসে শাসনের দড়ি হাতে ধরার লক্ষ পোষন করল। একটার পরে একটা দেশীয় শাসককে জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলল। এতদব্যাতীত ওয়েলেসলির সামন্ত সন্ধি প্রথা ও ডেলাহাউসির রাজ্যস্বত্ব লোপ নীতির দ্বারা অনেক দেশীয় রাজ্য ইংরেজ সাম্রাজ্য ভুক্ত হয়ে গেল। মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে লাল কেল্লা থেকে কুতুবে পাঠিয়ে দেওয়া হল। অযোধ্যাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যে মিশিয়ে দেওয়া হল। পেশবা ২য় বাজীরাও এর মৃত্যুর পরে তাঁর পোষ্য পুত্র নানা সাহেবের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হল।

সামাজিক কারন ঃ

ইংরেজ শাষনের পূর্বে ভারতীয় সমাজে কতগুলি

কুসংস্কার ছিল। ইংরেজ শাসনের সময় সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছিল। বিধবা বিবাহের প্রচলন হল। অন্য ধর্ম গ্রহন করলে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে না বলে আইন হল। রেল গাড়ি চলাচল ও ডাক - তার ব্যবস্থা প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি হস্তক্ষেপ বলে ভারতীদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি হল এর ফলে ভারতীয়দের মদ্যে ইংরেজ বিরোধী মনভাব সৃষ্ঠি হল।

ধর্মগত কারন ঃ

ইংরেজ শাসন কালে প্রাদ্রীরা লোকেদের মধ্যে খ্রীষ্ট ধর্ম প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করল। ধর্মান্তর হলে পৈতৃক সম্পত্তি প্রবাবিত না হওয়ার আইন পাশ হল। হিন্দুরা তাদের মৌলিক ধর্ম প্রতি এটা অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বলে অসন্তুষ্ট হলেন।

তুমি জান কি ?

স্বামীর চিতাগ্নিতে স্ত্রীকে পুড়ে মরতে বাধ্য করে স্ত্রীর সহ মরন প্রথাকে সতীদাহ প্রথা বলা হয়

সামাজিক কারন ঃ

ইংরেজ শাসন কালে সিপাহীদের নগন্য দৃষ্টিতে দেখা হত। তাদের প্রতি উত্তম ব্যবহার করা হত না। দুর দুরান্তে যুদ্দে গেলে তাদের অধিক আর্থিক সুবিধা দেওয়া হত না। তারা স্বল্প বেতনভুক্ত ছিলেন। ভারতীয় সৈনদের তুলনায় গোরা সৈন্যরা অধিক সুযোগ সুবিধা পেত। সিপাহীরা তাদের ব্যক্তি গত ধর্ম বিশ্বাসে সরকার অযথা হস্তক্ষেপ করছে বলে অনুভব করতে লাগল। যে সব সিপাহীরা মাথায় তিলক লাগাত সেসব নিষিদ্ধ করা হল। স্থানীয় টুপি বা পাগড়ি পরার ওপরে নিষেধ জারি করে সামরিক টুপি পরা বাধ্যতা মূলক করা হল এই ব্যবস্থা সিপাহীদের ক্ষুদ্ধ করল।

অর্থনৈতিক কারন ঃ

লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করলেন। জমিদার রা মনইচ্ছা ভূরাজস্ব আদায় করতে লাগল। এরফলে কৃষক শ্রেনী দরিদ্র হয়ে বড়ল এবং অসন্তুষ্ট হল। দেশীয় রাজারা তাঁদের রাজ্যহারা বার ফলে তাদের অধস্তন কর্মচারীরা বেকার হয়ে গেল। অনেক জমিদারের কাছ থেকে জমিদারী কেড়ে নেওয়া হল। তখন ডেলাহাউসীর সময় অনেক জমির মালিক জমি হারাল। রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীরা কৃষকদের শোষন করল। ভারত থেকে কার্পাস ইংল্যান্ডে পাঠানো হল। সেখানকার কারখানায় কাপড় তৈরী হয়ে ভারতে বিক্রী হত। ব্রিটিশ শিল্পে নীতির জন্য দেশীয় কুটির শিল্প লুপ্ত হয়ে গেল। লোকেরা বেকার হয়ে যাওয়ায় তাদের মনে বিদ্রোহ ভাব সৃষ্টি হল।

প্রত্যক্ষ কারন ঃ

১৮৪৭ সালে সিপাহীদের এক প্রকার বন্দুক ব্যবহার করতে দেওয়া হল। একে এনফিল্ড বন্দুক বলা হত। তাতে যে গুলির ব্যবহার হতো সেটা একধরনের খোলের ভেতরে থাকত। এই খোলে গরু ও শুয়োরের চর্বির লেপন আছে বলে প্রচারিত হয়ে গেল বন্দুকে ব্যবহারের আগে খোলের মুখকে দাঁতে করে ছিড়ঁতে হত।

উভয় হিন্দু ও মুসলমান সিপাহি তাঁদের ধর্মের ওপর হস্তক্ষেপ ইংরেজ রা করছে বলে মনে করল। তাই তারা এনফিল্ড বন্দুক ব্যবহার করতে নারাজ হল।

তোমার জন্য কাজ ঃ

বেশীক্ষন কারখানা হলে কুঠীর শিল্পের ওপর কি প্রভাব পড়বে, শ্রেনী গৃহে আলোচনা কর।

১৮৪৭ সালের মার্চ ২৯তারিখে সিপাহী মঙ্গল পান্ডে বঙ্গের ব্যারাকপুর শিবিরে এনফিল্ড বন্দুক ব্যবহার করব না বলে স্পষ্ট মানা করেছিল।

ইংরেজ অফিসার তাঁকে বাধ্য করাতে তিনি রেগে গিয়ে সেই বন্দুক দিয়ে ইংরেজ অফিসারকে হত্যা করল। মঙ্গলপান্ডে হত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত হলেন।। সে বছর মে মাসের ১০ তারিখে মীরাটের সিপাহীরা ও সেই বন্দুক ব্যবহার করতে মানা করেছিল।

এটা ১৮৫৭ র ইংরেজ দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গের কাজ করল। এবং অতি শিঘ্র বিদ্রোহের আগুন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ঝড়াল।

মঙ্গল পান্ডে

বিদ্রোহের অগ্রগতিঃ

বিদ্রোহীরা ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করল। তারা তাদের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিল। বৃদ্ধ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহুদুর শাহ জাফরকে বিদ্রোহীরা ভারতের সম্রাট বলে ঘোষনা করল। এই বিদ্রোহ মহারাষ্ট্র মধ্যভারত, বিহার ও রাজ পুতানার ছড়িয়ে পড়ল। দিল্লী, লক্ষ্মৌ, কানপুর, বরেলি, ও ঝাঁসী তে এই বিদ্রোহ আরও ব্যাপক রূপ নিল। কানপুরে নানা সাহেব ও তাঁর মন্ত্রী তাঁতিয়া টোপে সংগ্রামের নেতৃত্ব নিলেন।

ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাই ও নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। ওড়িশার সম্বলপুরের বীর সুরেন্দ্র সাএ এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহের সময় লর্ড ক্যানিং ভারতের গর্ভনর জেনারেল ছিলেন। বিদ্রোহ দমন করতে তিনি আপ্রান উদ্যাম করেছিলেন। এর জন্য পাঞ্জাব, নেপাল, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতির শাসকরা লর্ড ক্যানিং কে সাহায্য করতে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। দিল্লীতে বিদ্রোহ দমন করে মোগল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুরশাহকে বন্দী করা হল। তাকে মিয়াঁমারের রেঙ্গুনে ম্যান্ডালে জেলে বন্দী করে রাখা হল।

নানা সাহেব

ঝাঁসী রানী লক্ষ্মীবাঈ

তিনি ছিলেন ভারতের শেষ মোগল সম্রাট। কানপুরে নানা সাহেব যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে নেপালের জঙ্গল অঞ্চলে পলায়ন করলেন। যুদ্ধ শেষে রানী লক্ষ্মীবাই প্রান হারালেন। তাঁতিয়া টোপে পরাস্ত হয়ে বন্দী হল। জগদীশপুরে

তোমার জন্য কাজঃ

ক) বিদ্রোহীরা মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট বলে কেন ঘোষনা করেছিল অন্যদের সঙ্গে আলোচনা কর।

খ) ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের বিষয়ে অধিক জানার চেষ্টা কর।

গ) স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেওয়া ওড়িশার নারীদের তালিকা প্রস্তুত কর।

কনওয়ার সিং নিহত হলেন। এই ভাবে বিদ্রোহ বিফল হয়ে গেল।

তাঁতিয়া টোপে

এই মহান বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে বলা হয়।

ফলাফলঃ

বিলেতে ইংরেজ সরকার জানতে পারল যে ভারতীয়রা বিদ্রোহাভিমুখী। তারা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কিছু দোষ দুর্বলতা আছে বলে মনে করলেন। তাই ১৮৫৮ সালে কোম্পানীর হাত থেকে বিলেত সরকারের হাতে ক্ষমতা আনার জন্য আইন প্রনীত হল। এর ফলে ভারতের শাসন ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে বিলেত সরকারের হাতে গেল।

বিলেত সরকারের একজন মন্ত্রী ভারত শাষনের দায়িত্ব রইল। ভারত নিযুক্ত গভর্নর জেনারেল ইংল্যান্ডের রানীর প্রতিনিধি হিসাবে ভাইসরায় রূপে পরিচিত হলেন। ভারত ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হল।

ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারত শাসন ক্ষমতা হাতে নিল বলে এলাহাবাদে ১৮৫৮ সালের ১লা নভেম্বর এক ঘোষনা পত্র পাঠ করলেন। এই ঘোষনা পত্রে কয়েকটি ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হল।

ক) কোম্পানীর শাসন কালে দেশীয় রাজ্যাদের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অপরিবর্ত্তিত থাকবে।

খ) দেশীয় রাজাদের ক্ষমতা, পদমর্যাদা এবং সম্মান অক্ষুন্ন থাকবে।

গ) ভারতীয়দের মোলিক ধর্ম বিশ্বাসের ওপরে হস্তক্ষেপ করা হবে না।

ঘ) ভারতীয়দের মৌলিক পরম্পরা, সামাজিক রিতিনীতির ওপরে হস্ত ক্ষেপ করা হবে না।

ঙ) জাতি, ধর্ম বর্ণ,নির্বিশেষে ভারতীদের যোগ্যতা ভিত্তিক নিযুক্তি দেওয়া হবে।

সৈন্যবাহিনীর জন্য নূতন রেজিমেন্ট গঠন করা হল। বিদেশী শাসন থেকে স্বাধীনতা পাবার জন্য বিদ্রোহের আরও ব্যাপক আবশ্যকতা ভারতীয়রা অনুভব করলেন।

১৮৫৭ র বিদ্রোহে ওড়িশার ভূমিকা ঃ

১৮৫৭ সালে জাতীয় বিদ্রোহের কালে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত ওড়িশাতে ও উল্লেখনীয় ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটল।

এই সময় বীর সুরেন্দ্র সাত্রর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ।

বীর সুরেন্দ্র সাত্র ঃ

বীর সুরেন্দ্র সাত্র সম্বল পুরের খিন্ডা গ্রামে ১৮০৯ সালে চৌহান রাজপুত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ধরম সিং। তিনি চৌহান রাজবংসের বলিয়ার সিংযেৰ উত্তরাধিকার ছিলেন। ১৮২৭ সালে রাজা মহারাজা সা এর মৃত্যুর পরে তার বিধবা পত্নী রানী মোহন কুমারীকে ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক অফিসার শাসন ক্ষমতা অর্পন করল। এর দ্বারা সুরেন্দ্র সাএকে তাঁর ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। যার ফলে সুরেন্দ্র সাত্র ক্ষুদ্ধ হলেন। গন্ড ও বিন্ধান আদিবাসীরা সুরেন্দ্র সাএ এর দাবী সমর্থন করল এবং বিদ্রোহ হল। রানী বিদ্রোহ দমন করতে পারল না। ইংরেজ সরকার রানীর স্থানে ১৮৩৭ সালে নারায়ন সিংহকে বসাল। এতে সুরেন্দ্র সাত্র, আরও ক্ষুদ্ধ হল, জনতা তাঁর পক্ষে সমর্থন জানাল। ইংরেজ সরকার বিদ্রোহ দমন করল। তাঁকে ১৮৪০ সালে বন্দী করে হাজারী বাগ জেলে পাঠানো হল। বীর সুরেন্দ্র সাত্র ১৮৫৭ র বিদ্রোহ সম্বলপুরের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন তিনি তাঁতিয়া টোপে, লক্ষ্মী বাঈ ও নানা সাহেবের সমকক্ষ ছিলেন।

বীর সুরেন্দ্র সাএ

১৮৫৭ জুলাই ৩১ তারিখে বিদ্রোহীরা হাজারী বাগ জেল ভেঙে বন্দীদের মুক্ত করেদিল। মুক্ত বন্দীদের মধ্যে সুরেন্দ্র সাত্র ও তাঁর ভাই উদন্ত সাত্র ছিল।

তাঁরা সম্বলপুরে ফিরে এসে ইংরেজের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের সংগঠিত করলেন। জমিদার, গৌন্তিয়া ও মান্য গন্য ব্যক্তিরা তাঁকে স্বাগত অভর্থনা জানালেন। সুরেন্দ্র সাত্রর সশস্ত্র আবির্ভাবে ইংরেজ সেনাপতি লি ভয়ভীত হয়ে গেল। তার নিবেদন পত্র উচ্চ কর্ত্তপক্ষের বিচারের জন্য পাঠিয়ে দেওয়ার তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন তার পরামর্শ ক্রমে তিনি কিছুদিন সম্বল পুরে অপেক্ষা করলেন। কিছুদিন অপেক্ষা করার পর কোনো বিচার না পাওয়ায় তিনি নিজেকে গৃহবন্দীর মত অনুভব করলেন। কাল বিলম্ব না করে পুলিশ পাহারাদারের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি নিজের জন্ম ভূমি ঘিন্ডায় প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর আহ্বানে সম্বলপুরের জমিদার, গৌন্তিয়া, আদিবাসী ও সাধারন জনতা বিদ্রোহে সামিল হল।

তোমার জন্য কাজ ঃ
বীর সুরেন্দ্র সাত্র কে মুখ্য চরিত্রে নিয়ে নাটক প্রস্তুত কর।

বীর সুরেন্দ্র সাত্র তাঁর বিদ্রোহী সমর্থকদের ৪ ভাগে বিভক্ত

করল। একটা দল ভাই উদন্ত সাত্রর সেনাপতিত্বে রইল। তার দল ঝড়সুগড়া ঘাটীতে অবস্থাপিত হল। এর হাজারী বাগ ও রাজীর সঙ্গে সম্বলপুরের যোগা যোগ কেটে দিল। তৃতীয় দল লোইসিংহা জমিদারের নেতৃত্বে কটক সম্বলপুর রাজ পথে থাক বট ঘাটীতে অবস্থাপিত হল। চতুর্থ দল ঘেঁস জমিদার মধো সিংহের নেতৃত্বে সম্বলপুর - নাগপুর রাজপথে থাকা সিংগোডাঘাটীতে অবস্থাপিত হয়ে এই রাস্তা করায়ত্ত করল। মাধো সিংহ যুদ্ধে বন্দী হল এবং মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত হল।

সুরেন্দ্র সাত্র আরও অধিক পাইক সংগ্রহ করলেন। বিদ্রোহীদের মোকাবিলা করার জন্যে নাগপুর থেকে ক্যাপটেন ই.জি.উড কিছু অশ্বারোহী সৈন্য সহ সম্বল পুরে পৌছে কুড়োপল্লী তে বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমন করল। ৫৩ জন বিদ্রোহী সহ সুরেন্দ্র সাত্রর ভাই ছবিল সাত্র নিহত হল। বিদ্রোহীরা ক্যাপ্টেন উডকে হত্যা করল।

কর্নেল ফরেষ্টার ১৮৫৮ সালের ২৯ শে মার্চ বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে সম্বলপুর পৌঁছল। সেভীষন অত্যাচার কর। বিদ্রোহী জমিদারদের বন্দী করে ফাঁসি দিল। নিষ্ঠুর ভাবে বিদ্রোহ দমন জারি রইল ১৮৬১ সালের সেপ্টেম্বর ২৪ তারিখে কমিশনের মেজর ইম্পে ঘোষনা করল। যে সুরেন্দ্র সাত্র, তার ভাই উদন্ত সাত্র ও পুত্র মিত্রভানু ব্যাতীত অন্য সমস্ত বিদ্রোহী কে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। এর ফলে অনেক বিদ্রোহী জঙ্গল থেকে এসে সরকারের কাছে আত্ম সমর্পন করলো। সুরেন্দ্র সাত্রর রাজসিংহা সন প্রশ্ন কে প্রত্যাখান করা হল।

১৮৬৩ সালে সম্বলপুরের ডেপুটি কমিশনার কিউম্বার লেস, সুরেন্দ্র সাত্র ও তাঁর সহযোগীদের বন্দী করার আদেশ দিল। ১৮৬৪ সালে জানুয়ারী মাসের ২৩ তারিখে সুরেন্দ্র সাত্র বন্দী হলেন। তিনি আশির গড় দুর্গে আজীবন বন্দী হয়ে হইলেন। বীর সুরেনদ্র সাত্র ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারী ২৮ তারখে প্রান ত্যাগ করলেন।

আমরা কি শিখলাম ?

জয়ী রাজগুরু ও বক্সি জগবন্ধুর মত মহান যোদ্ধাদের কর্ম নিষ্ঠা, ত্যাগ ও দেশপ্রেম সম্পর্কীয় জ্ঞান।

স্বাধীনতা সংগ্রামে খোর্দ্দার পাইক বিদ্রোহ, খুমুসরের কন্ধ বিদ্রোহ, কেন্দুঝরের ভুঁইয়া বিদ্রোহ ও ময়ুর ভঞ্জের কোল ও সাঁতালদের আন্দোলনের প্রভার।

১৮৫৭ সিপাহি বিদ্রোহের বিভিন্ন কারন ও ফলাফল।

মঙ্গল পান্ডে, নানা সাহেব, তাঁতিয়া তোপে, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ, বীর সুরেন্দ্র সাত্র প্রভৃতির মত সংগ্রামীদের অবদান।

প্রশ্নাবলী

১) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ৭৫টি শব্দে দাও ঃ

ক) রাজা দ্বিতীয় মুকুন্দ দেবের রাজত্বে প্রারম্ভিক অবস্থার কিকি সমস্যা দেখা গেল ?

খ) ইংরেজদের খোর্দ্দা রাজার সঙ্গে কেন যুদ্ধ হল ?

গ) বিপ্লবী জয়ী রাজগুরুকে কেন ফাঁসী দেওয়া হল ?

ঘ) পাইক বিদ্রোহের মুখ্য কারন গুলি কি ?

ঙ) কন্ধ বিদ্রোহে দোরা ও চকরা বিশোই এর ভূমিকার বিবরন প্রদান কর।

চ) ''ধরনী মেলি'' কি, এটা কেন সৃষ্টি হল ?

ছ) ভূইয়াঁ রা ইংরেজের বিরুদ্ধে কেন বিদ্রোহ করল ?

জ) কোল রা কেন বিদ্রোহ করল ?

ঝ) সাঁওতাল বিদ্রোহ কিভাবে অগ্রগতি করল ?

ঞ) সিপাহি বিদ্রোহের মুখ্য কারনগুলি কি ?

ট) সিপাহি বিদ্রোহের ফলা ফল কি হল ?

ঠ) শুরেন্দ্র সাত্র কেন বিদ্রোহ করলেন ?

২। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ২০ টি শব্দে লেখ।

ক) শহীদ রাজগুরু কবে ও কোথায় জন্ম গ্রহন করেছিলেন ?

খ) রাজা মুকুন্দ দেবকে কোথায় বন্দী করা হল ও মুক্ত করে কোথায় রাখা হল ?

গ) জগবন্ধুর পুরো নাম কি ? তিনি কি ছিলেন।

ঘ) পাইক বিদ্রোহ কোন কোন অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছিল ?

ঙ) কে কে কন্ধ বিদ্রোহে নেতৃত্ব নিয়ে ছিলেন ?

চ) ভূইঁঞা বিদ্রোহ কবে সংগঠিত হল ও কে এর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন।

ছ) কে কে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতৃত্ব নিয়েছিলেন।

জ) কে রাজস্বত্ব লোপে নীতি প্রবর্ত্তন করেছিল ?

ঝ) এনফিল্ড বন্দুকের ব্যবহার করতে উভয় হিন্দু ও মুসলমানরা কেন বিরোধ করেছিল ?

ঞ) মঙ্গল পান্ডে কে কেন মৃত্যুদেন্ড দেওয়া হল ?

ট) রানী ভিক্টোরিয়া কোন স্থানে ঘোষনা পত্র পাঠ করেছিলেন ?

ঠ) সুরেন্দ্র সাত্র লির সঙ্গে কবে দেখা করেছিলেন ?

৩) বন্ধনীর মধ্য থেকে ঠিক উত্তর বেছে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক) জয়ী রাজগুরু ..... সালে শাসন নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা হাতে নিল।

(১৮৫৭, ১৮০৪, ১৭৯৮, ১৮০৩)

খ) বিদ্রোহীরা হাজারীবাগ জেল ভেঙে দেবার ফলে ..... মুক্ত হয়েগেলেন।

(চকরা বিশোই, বক্সি জগবন্ধু, জয়ী রাজগুরু , সুরেন্দ্র সাত্র)

গ) ১৮১৭ সালে ..... বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল।

(পাইক, সাঁওতাল, সিপাহি, কোল)

ঘ) চকরা বিশোই কে ধরিয়েদিলে তিন হাজার টাকার পুরস্কার ..... ঘোষনা করেছিল।

(ক্যানিং, ডেলাহাউসী, ওয়েলেসলী, কর্নওয়ালিস)

৪। রেখাঙ্কিত অংশ পরিবর্ত্তন না করে ভ্রম সংশোধন কর।

ক) রাজা ২য় মুকুন্দদেবকে পূরীর রাজা রূপে ঘোষনা করা হল।

খ) ১৮৯৮ সালে ভুইঁঞা সম্প্রদায়ের রওনা এক মেলির নেতৃত্ব নিলেন।

গ) সাওঁতাল বিদ্রোহ ১৮১৭তে হয়েছিল।

ঘ) কানওয়ার সিং নানা সাহেবের মন্ত্রী ছিলেন।

৫। নিম্ন লিখিত 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভকে প্রাঙ্গিক মিল অনুযায়ী সংযোগ কর।

'ক'	'খ'
১৮০৪	কৃষিকার্য্যে ও যুদ্ধ
পাইক	এনফিল্ড বন্দুক
ঘুমুসর	খোর্দ্দা অধিকৃত
কঙ্কামাঝি	ধনঞ্জয় ভঞ্জ
মঙ্গলপান্ডে	কালিয়া মহান্ত

●

তোমার জন্য কাজঃ

শিক্ষকের সহায়তায় উনবিংশ শতাব্দিতে ওড়িশায় বিভিন্ন বিপ্লবে নিম্নলিখিত বিপ্লবীগনের জীবনীর সহিত তাঁদের অবদান সংক্ষেপে লেখ।

জয়ী রাজগুরু, বক্সি জগবন্ধু, দোরা বিশোই, চকনা বিশোই, সুরেন্দ্র সাএ, রত্না নায়ক।

চতুর্থ অধ্যায়

বিভিন্ন আর্থিক নীতি ও ভারতে এর প্রভাব

কৃষি শিল্পের উপরে প্রভাব ঃ

ভারতের রাজনীতি ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে আার্থিক অবস্থা ও ইংরেজ শাসনের দ্বারা বহু মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছিল। পারম্পরিক আর্থিক ব্যবস্থায় গ্রাম গুলি প্রায়তঃ স্বাবলম্বী ছিল। নিজের চাহিদানুসারে লোকে খাদ্য ও অন্যান্য সমাগ্রী উৎপাদন করত। বাজারের ওপর তারা বিশেষ নির্ভরশীল ছিল না। গ্রামবাসীদের এই আর্থিক স্বাবলম্বন শীলতার জন্য দেশের ও এক প্রকার আর্থিক স্বাধীনতা ছিল। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মতো এক বানিজ্য সংস্থার দ্বারা পরিচালিত ইংরেজ সরকার ভারতের আর্থিক আত্ম নির্ভরশীলতা নষ্ট করেদিল। ফলে ভারত, সাম্রাজ্য বাদী তথা উপনিবেশ আর্থিক ব্যবস্থাদ্বারা কবলিত হল এবং এর জন্য লোকেদের স্বার্থে জলাঞ্জলি হল বা বলি পড়ল।

ভারতে পূর্বে শাসন করতে থাকা তুর্ক ও মোগলদের থেকে ইংরেজরা সম্পূর্ন ভিন্ন ছিল। তারা কোনোদিন ভারত কে নিজের বাসস্থান বলে গ্রহন করেনি। ভারত থেকে নিরন্তর অর্থ ধন শোষন করে ইংল্যান্ডের ঔপনিবেশিক অর্থ ব্যবস্থার উন্নতির কথা চিন্তা করত। ওদের পাওয়া উচ্চ বেতন বিদেশ চলে যেত। খাজনার অর্থ ও ভারতথেকে চলে যেত। সাম্রাজ্য বিস্তার ও সুরক্ষার জন্য এক বিশাল সৈন্য বাহিনী রাখতে হত। যার মোট ব্যায় ভার ছিল ভারতের ওপরে। তাছাড়া শিল্প বিপ্লবের পরে শস্তায় ভারত থেকে কাঁচামাল ও খাদ্য শষ্য নিয়ে বিদেশ থেকে সামগ্রী এলে বেশী লাভে বিক্রী করা হত। এই সব আবশ্যকতা পূর্ণ করার ক্ষেত্রে ভারতের স্বাবলম্বী পারম্পরিক আর্থিক ব্যবস্থা সমর্থ ছিল না। ফলে আর্থিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্ত্তনের জরুরী প্রয়োজন হয়ে পড়ল।

কষি্ ব্যবস্থায় পরিবর্তনঃ

ইংরেজ আমলে সরকারী খরচা বৃদ্ধি পেল। সেটা পূরণ করার জন্য জমির খাজনা অনুরূপ মাত্রায় বৃদ্ধি করা আবশ্যক হল দ্বিতীয়ত ঃ ধার্য্য করা যোজনা ঠিক সমরে দেওয়া জরুরী হল। অন্যথা যোজনা অনুসারে আগে থেকে ব্যায়ের হিসাব করা সম্ভব ছিল না। এই উপনিবেশিক আবশ্যকতাকে নজরে রেখে সরকার নূতন জমি বন্দোবস্ত আরম্ভ করলেন। ফলে কৃষক ও কৃষি জমির মধ্যে সংজ্ঞা বদলে গেল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা ঃ

১৭৯৩ সালে ভারতের গর্ভনর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস বঙ্গে চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু করলেন। এই ব্যবস্থায় জমির ওপরে খাজনা স্থায়ী ভাবে ধার্য্য হল সেটা সরকারের পক্ষ থেকে জমিদার আদায় করবে বলে স্থির হল। ধার্য্য মতে এক নির্দ্দিষ্ট তিথিতে বা তার পূর্বে যদি জমিদার খাজনা সরকারী তহবিলে জমানা করেন তাহলে সূর্য্যাস্তের আইনের বলে তাঁর জমিদারী উচ্ছেদ হবে বলে আইন হল।

নিয়ম কড়াকড়ি ভাবে পালিত হওয়ায় অনেক জমিদারী উচ্ছেদ হল এবং তাদের স্থানে নতুন জমিদাররা নিযুক্ত হলেন আবার অনেক জমিদার উচ্ছেদের ভয়ে সময় হবার আগেই প্রজাদের কাছ থেকে সময় হবার আগেই প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা উসুল করতে লাগল। খাজনা দেবার জন্য প্রজা হয়ত বোকা, সুদে মহজনের কাছ থেকে ঋন ও সুদের পরিমান অধিক হয়ে যাওয়ার কারনে জমি বাজেয়াপ্ত হল। অর্থাৎ এধারে জমি ক্রয় বিক্রয় হল এবং প্রকৃত প্রজা ভূমি জমিহীন হতে বাধ্য হল।

রায়তওয়ারী বা অস্থায়ী বন্দোবস্ত ঃ

মাদ্রাজ ও বম্বেতে সরকার স্যার টমাস মুনরো দ্বারা প্রস্তুত রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত আরম্ভ করল। এতে রায়ত বা প্রজা সরাসরি সরকারী তহবিলে খাজনা জমা দিল। এই বন্দোবস্ত প্রতি ২০ বা ৩০ বছরে খাজনা স্থির হবে বলে নিয়ম হল। জমিদার না থাকলে নিজে সরকার জমিদারের মত কড়াকড়ি ভাবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের আগেই খাজনা উসুল করতে লাগল। সুতরাং বঙ্গের মত এখানেও প্রজাবেশী সুদে ঋন করে খাজনা জমা দিতে বাধ্য হল। এবং সেই প্রক্রিয়াতে মহাজনের ঋন জালে পড়ল এমনকি তাদের জমি হাতছাড়াও হতে লাগল।

তুমি জান কি?

স্যার টমাস মুনকে রায়তওয়ারী জমি জমা বন্দোবস্তের প্রবর্তক ছিলেন। ১৮২০ তে তিনি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির গর্ভনর ছিলে। তার অভিমত ছিল যে সরকার যদি প্রজাদের সঙ্গে জমি জমা বন্দোবস্ত করে তবে, সরকার অধিক জমি কর বা খাজনা উসুল করতে পারবে।

মাগানওয়াড়ী বন্দোবস্ত ঃ

পাঞ্জাব ও পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কিছু অঞ্চলে প্রজাদের মহাল বা গ্রামের মাধ্যমে খাজনা জমা করতে হল। মাহাল এর সঙ্গে সরকারের জমিজমা বন্দোবস্ত চুক্তি হওয়ায় একে মহাল ওয়াড়ী বন্দোবস্ত বলা হত। এটা ছিল একটি অস্থায়ী বন্দোবস্ত। খাজনা আদায় করতে প্রজার ওপরে গ্রাম সমাজ খুব চাপ প্রয়োগ করতো। ফলে খাজনা জমা দিতে হলে প্রজাদের ঋন নিতে হত।

মোট কথা হল যে এই নতুন জমি জমা বন্দোবস্তের ফলে জমি এবার বিক্রীলব্দ সামগ্রী হয়ে গেল।

খাজনা দিতে না পেরে অথবা খাজনা দেবার জন্যে আনা ঋন ও সুদ পরিশোধ না করতে পেরে প্রজারা জমিহীন হল। অন্য পক্ষে সাহুকার ও মাহজনেরা জমির মালিকানা নিজের নিজের নামে করে নিল। এই নতুন জমি মালিকরা প্রত্যক্ষ ভাবে কৃষি করত না। অন্য দিকে ভাগচাষী জমিহীন প্রজারা দারিদ্র্যের জন্য কৃষির উন্নতি করতে পারলনা। এই ভাবে কৃষি ও কৃষকের আর্থিক অবস্থা দিনকে দিন শোচনীয় হতে লাগল।

কুটীর শিল্পের অবনতি ঃ

অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত হস্তশিল্প ও কারিগরীর জন্য ভারত বিশ্ব প্রসিদ্দ ছিল। হস্ত শিল্প থেকে প্রস্তুত গয়না, তসরের কাপড় পশম বস্ত্র ইত্যাদি সৌখীন ও বিলাস সামগ্রী বিদেশে ও রপ্তানী হত। লক্ষ লক্ষ কারিগর এতে নিযুক্ত হতেন। এই কারিগররাও ক্ষুদ্রচাষী ছিলেন। কৃষিও কারিগরীর ওপরে ভরসা করে তারা যথেষ্ট আত্ম নির্ভর শাল ছিলেন। গোয়া, সুরাত, ঢাকা, বারানসী, চট্টগ্রাম ও লাহোর প্রভৃতি শহর হস্তশিল্পের মূখ্য কেন্দ্র ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পরে ভারতে কলের তৈরী কাপড় ও অন্যান্য মেসিনে প্রস্তুত বিদেশী সামগ্রী সস্তায় কিনতে পাওয়া গেল। নিজেদের শিল্পের বিকাশের জন্য ইংরেজ সরকার বিদেশী সামগ্রী আমদানীর ওপরে শুল্ক ছাড় দিলেন। আবার পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবে লোকেরা অনেকেই পারিবারিক হস্তশিল্পে প্রস্তুত স্বদেশী বস্তকে অপছন্দ করল। হস্ত শিল্পের অধোপতনের জন্য কারিগরের কৃষির ওপর নির্ভর করলেন। যদিও কৃষি খুব অনুন্নত অবস্থায় ছিল।

অনেক কারিগর দিন মজুর হয়ে দিন কাটাতে লাগল। এই কারনে দেশে দারিদ্র্য বৃদ্দি পেল এবং আর্থিক স্থিতি শোচনীয় হল।

দুর্ভিক্ষতে লক্ষ লক্ষ মানুষ পোকা মাকড়ের মত অনাহারে মরল। এর পেছনে বড় কারন ছিল দারিদ্রা। ১৮৬৬ সালের ন অঙ্ক দুর্ভিক্ষে ওড়িশায় দশলক্ষের বেশী মানুষ মারা গেছে বলে অনুমান করা হয়।

বিংশ শতাব্দীর আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঃ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব আরম্ভ হল। তখন ভারতকে কেবল এক কাঁচা মালের উৎস ও শিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রীর বাজার হিসেবে ইংরেজরা

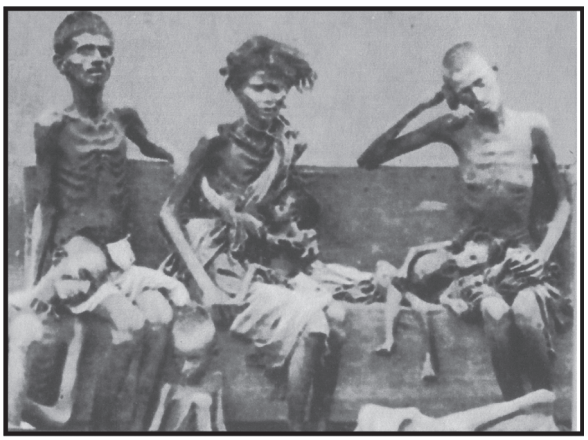

নঅঙ্ক দুর্ভিক্ষ

দেখত। কিন্তু, ১৮৫০ সালের পরে ভারতেও কার্পাস, পাট ও পাথর কয়লার ক্ষেত্রে আধুনিক শিল্পায়ন আরম্ভ হল।

তুমি জান কি?

পূরী রাজ দিব্য সিংহেদেবের রাজত্বের নবম অংকে দেখা দেওয়ার জন্য ১৮৬৬ সালের ওড়িশার দুর্ভিক্ষকে নঅংকে দুর্ভিক্ষ বলা হয়।

এই কলকার খানাতে হাজার হাজার শ্রমিক নিযুক্ত হল। যদিও দারিদ্র্য শ্রমিক নিযুক্ত হল। যদিও দারিদ্র ভুগতে থাকা মোট বেকারের সংখ্যা ছিল অনেক বেশী।

ভারতে প্রথম কাপড়ের কল ১৮৫৩ সালে বম্বেতে স্থাপিত হল। দুই বৎসর পরে ১৮৫৫ সালে বঙ্গের রিসড়া তে প্রথম চট কল স্থাপিত হল। উভয় কাপড় কল ও চটকল মুখ্যতঃ বঙ্গে এবং কাপড় কল মহারষ্ট্রে ও গুজরাটে ছিল ১৯১৫ সাল নাগাদ দেশে সর্ব মোট ২০০ টি কাপড় কল বসানো হয়েগেছিল। তাতে কর্মরত শ্রমিকদের সংখ্যাছিল প্রায় দুই লক্ষ। সেই ভাবে ১৯০১ সালে মোট ৩৬ টি চটকলে ১ লক্ষেরও বেশী শ্রমিক নিযুক্ত ছিল।

এই সময়ে কয়লা খনিতেও প্রায ১লক্ষ শ্রমিক কাজ করত। এছাড়া চিনি, চামড়া লৌহ, ইস্পাত, সিমেন্ট প্রভৃতি তৈরীর জন্য নতুন নতুন কারখানা বসল।

ভারী যন্ত্র আধারিত কারখানা বাদ দিলে এই সময়ে চা, কফি ও নীল চাষের উদ্যোগ আরম্ভ হল। চা বাগান মুখ্যতঃ আসাম ও বঙ্গের দার্জিলিং অঞ্চলে ছিল। কফি চাষ দক্ষিণ ভারতে ও নীল চাষ বিহার ও বঙ্গে আরম্ভ হল। চা, কফি ও নীলের ইউরোপের বাজারে খুব চাহিদা ছিল। কিন্তু এই উদ্যোগের মালিকানা ইউরোপীয়দের হাতে ছিল। নীল চাষের জন্য চাষীদের ওপর খুব অত্যাচার করা হত।

চা ও কফি বাগানের কুলির পাওনা খুব কম ছিল। কাজে বাধ্য করে ওদের ওপর শারিরীক অত্যাচারত করা হত। ইংরেজদের সরকার থাকায় অত্যাচারী বাগান মালিক বা সাহেবদের ওপরে কচিত কার্য্য অনুষ্ঠান হত।

আসাম চা বাগান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-র (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়ে ইংল্যান্ডের উৎপাদিত সামগ্রী যথেষ্ট না হওয়ায় ভারতে অনেক নতুন কলকারখানা স্থাপিত হল। তবুও দেশে আবশ্যক মাত্রায় শিল্পের বিকাশ ঘটেনি। পারম্পরিক হস্ত শিল্পের অধঃপতনের পরে তার তুলনায় নিযুক্ত হওয়া শ্রমিকের সংখ্যা অতিকম ছিল। আবার অধিকাংশ কারখানায় মালিকানা ইউরোপীয়দের হাতে ছিল। শ্রমিকদের কম মজুরীতে অনেক খাটতে হত। সুতরাং শ্রমিকদের মধ্যে একতা ভাব সৃষ্টি হল, যা জাতীয় আন্দোলন কে সাহায্য করল। যে অল্প কয়েকজন ভারতীয়

তোমার জন্য কাজ।

তোমার গ্রামাঞ্চলে গরীব লোকেদের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্য কার্য্য ক্রম প্রস্তুতকর।

শিল্প পতি সৃষ্টি হলেন, তারাও ইংরেজ শিল্প পতিদের দ্বারা উপেক্ষিত হলেন। ফলে জাতীয় আন্দোলনে তাদের ও সহযোগ রইল।

মোট কথা হল, ইংরেজ শাসনে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থায় ঘোর পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হল।

পারম্পরিক আর্থিক ব্যবস্থার বদলে এক নতুন আর্থিক ব্যবস্থা আর আরম্ভ হল। পারম্পরিক শিল্প ও কারিগরী শিল্পের অথঃপতন হল এবং নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু যে ব্যাপক সংখ্যায় কারিগররা বেকার হলো, তার তুলনায় অতি অল্প লোক কে নতুন শিল্পে শ্রমিক ভাবে নিযুক্তি দেওয়া হল। কৃষি ক্ষেত্রে নতু নজমি বন্দোবস্তর জন্য অনেক প্রজা জমিহীন হল এবং নতুন জমি মালিক কৃষির উন্নতির জন্য আবশ্যক পদক্ষেপ নিল না।এই ভাবে দেখলে, ইংরেজ শাসন কালে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা উপনিবেশিক হয়ে রইল।

এটা বিশেষ ভাবে আধুনিক ও উন্নত হতে পারল না।

আমরা কি শিখলাম ?

বিভিন্ন বন্দোবস্ত প্রচলন

১৮৬৬ সালের নঅংক দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা

ভারতে আধুনিক শিল্পের আরম্ভ হস্তশিল্প ও কারিগরী শিল্পের বিলয়ের পেছনের কারন

প্রশ্নাবলী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ৭৫টি শব্দে দাও -

ক) নতুন কলকারখানা স্থাপনের পরেও ভারতে বেকারত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল কেন ?

খ) বঙ্গে অধিকাংশ চটকল স্থাপন করা হল কেন ?

গ) উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে পারস্পরিক হস্তশিল্প পতনোনু হল কেন ?

ঘ) ইংরেজরা ভারত থেকে কি কি উপায়ে ধন লুণ্ঠন করে নিয়ে যেত ?

ঙ) কোন কোন আর্থিক কারনে ভারতে জাতীয়তা আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল বলে তুমি মনে করেছ ?

চ) ইংরেজ শাসনে আরম্ভ হওয়া নতুন আর্থিক ব্যবস্থা গুলি কি ?

ছ) বাগিচা (বাগান) উদ্যোগ ভারতে কি ভাবে স্থাপিত হল তা ব্যাখ্যা কর।

জ) ইংরেজ শাসন কালে হস্তশিল্পের স্থিতি বর্ণনা কর।

২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

ক) বঙ্গে অধিক সংখ্যায় চটকল স্থাপিত হবার কারন কি হতে পারে।

খ) আসাম চা বাগানের কুলির দুরাবস্থার কারন কি ?

গ) ভারতের কোন অঞ্চলে নীল চাষ আরম্ভ হয়েছিল ?

ঘ) শ্রমিকের মনে জাতীয়তা ভাব জাগ্রত হওয়ার কারন কি হতে পারে ?

৩।শূন্যস্থান পূরণ করঃ

ক) বহু পরিমানে ..... ইংল্যান্ড থেকে ভারতে আমদানী হচ্ছিল।

খ) ওড়িশায় .....সালে নঅংক দুর্ভিক্ষা হয়েছিল।

গ) ভারতে প্রথমে .....সালে কাপড় কল স্থাপিত হয়েছিল।

ঘ) ..... জায়গায় (স্থানে) ভারতের প্রথম চটকল স্থাপিত হয়েছিল।

৪। 'ক' স্তম্ভের শব্দের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের শব্দের মিলন কর।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১৯৯৩	ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব
১৮৫৫	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন
১৯৩৯	নঅংক দুর্ভিক্ষ
১৮৬৬	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ

পঞ্চম অধ্যায়

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকাশের কারণঃ

উনবিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে বিভিন্ন সময়ে ইংরেজ শাসন বিরোধী সংগঠন গুলির আবির্ভাব হল। আঞ্চলিক বিদ্রোহ থেকে আরম্ভকরে জাতীয় বিদ্রোহ পর্য্যন্ত অনেক বিদ্রোহ এদের দ্বারা সংগঠিত হল। কৃষক ও আদিবাসী বিভিন্ন সময়ে বিদ্রোহ করেছিল। তাদের মধ্যে ওড়িশার পাইক বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ও কোল বিদ্রোহ প্রভৃতি প্রনিধান যোগ্য। ১৮৫৭ র বিদ্রোহ এক জাতীয় বিদ্রোহের উদাহরন। ভারতের জনগন কোনো কালেই বিদেশী শাসনকে স্বাগত করেনি। সর্ব কালেই তাঁরা জাতীয় চেতনায় উদবুদ্ধ হয়েছেন। ভালো হোক বা মন্দ হোক, ''এটা আমার দেশ'' এই ভাবনায় দেশ প্রেমী জনতা বিহ্বলিত হয়েছেন।

তুমি জান কি?

ঐক্য ভাবের মহামন্ত্রে নিজের দেশ তথা মাতৃ ভূমিকে ভালবাসার ভাবকে ''জাতীয়তাবাদ'' বলা হয়।

ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশের জন্য নিম্নলিখিত কারনগুলি প্রনিধান যোগ্য।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য ঃ

প্রাচীন যুগে মুনি ঋষিরা হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভূখন্ডকে ভারতবর্ষ নামে নামিত করেছিলেন। এখানকার সমস্ত অধিবাসী ভারতীয় সন্ততি নামে পরিচিত হতেন। ভারত বর্ষে হিমালয় পর্বত এবং গঙ্গা যমুনার মত নদীকে সমস্ত লোকে পবিত্র মনে করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থানে সমস্ত ধর্মের তীর্থ স্থান আছে। জাতি, ধর্ম ,বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত ভারতীয় পালন করতে থাকা উৎসব, রিতি নীতি তথা সামাজিক প্রথা ও চলনে সামঞ্জস্য রয়েছে। খাদা পেয় ও পোষাকের আঞ্চলিক ভিন্নতা থাকলেও দেশের সর্বস্থানে সেগুলোর সমাদর আছে। এই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যভাব ভারতীয়দের মনে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করতে সহায়ক হয়েছে।

রাজনৈতিক একতা ঃ

ঐতিহাসিক যুগের বিভিন্ন পর্যায়ে এক শাসনাধীন থেকে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্য ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। ইংরেজ শাসন কালে ভারতের সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে রাজনৈতিক একতা দৃঢ় হোলো।

সমগ্র দেশ ইংরেজদের সাম্রাজ্য রুপে পরিচিত হওয়া ও ভারতের সমস্ত দেশীয় রাজ্য ব্রিটিশ শাসনাধীন হওয়ায় ভারতীয়দের মনে জাতীয়বাদ সৃষ্টি করতে পরোক্ষ ভাবে সাহায্য করেছিল। ইংরেজরা হয়ত আশা করেনি যে তাদের দ্বারা সৃষ্টি হওয়া রাজনৈতিক একতা একদিন ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করবে।

ইংরাজী ভাষার প্রচলন ঃ

আঞ্চলিকতার ভিত্তিতে ভারতে বহুবিধ ভাষাভাষির অধিবাসীর বাস করেন। ব্রিটিশ শাসন কালে উইলিয়াম বেন্টিংক ভারতে ইংরাজী ভাষা ও শিক্ষা প্রচলন করেছিল। ইংরাজী ভাষার প্রচলন হেতু ভারতের ইংরাজী শিক্ষিত ব্যাক্তি গণ পরস্পর সেই ভাষায় ভাব বিনিময় করতে সক্ষম হলেন। এটাও ভারতীয়দের মনে ঐক্য ভাব সৃষ্টি করতে সহায়ক হল। এর ফলে জাতীয়তাবাদ বিকাশ ঘটল। ইংরাজী শিক্ষালাভ করে ইংরাজী শিক্ষিত বুদ্দিজীবি সম্প্রদায় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, রুশ বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লব, ইংল্যান্ডের গৌরবময় বিপ্লব, ইটালী ও

জার্মানীর স্ব স্ব একত্রী করন প্রভৃতি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সম্বন্ধে জ্ঞান আহরন করলেন। রুষ্যো, ভলটায়ার ও মন্টেস্ক্যু প্রভৃতি বিদেশী দার্শনিকের জাতীয়তা বানীতে উদ্বুদ্ধ হলেন। ভারতীয়রা পাশ্চাত্য গনতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও ইতিহাসের সম্বন্ধে জানার সুযোগ পেলেন। তাঁরা ভারতে এসব প্রয়োগ করতে চাইলেন এবং বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন হওয়ার প্রয়াস করলেন।

তোমার জন্য কাজ।

ভারতে ইংরেজী শিক্ষার সপক্ষে ও বিপক্ষে তর্ক সভার আয়োজন কর।

নব জাগরণ ঃ

ভারতে বৌদ্ধিক ও আধ্যাত্মিক জাগরণ সৃষ্টি করতে রাজা রাম মোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্বামী বিবেকানন্দ প্রবৃতি জ্ঞানী সমাজ সংস্কারক গন, অগ্রনী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পীড়িত দের সেবা সম্পর্কে, পাশ্চাত্য চিন্তা ধারার সপক্ষে তথা বেদের মহানতা সর্ম্পকে জনসাধারনকে অবগত করে ছিলেন। তাঁদের এই উদ্যোগ কে নবজাগরন বলা হয়। অথবা ভারতে পূর্ণজাগরন সৃষ্টি করেছিলেন।

ব্রিটিশ শাসনের অবদান ঃ

বেন্টিংয়ের দ্বারা কিছু সামাজিক কু প্রথা উচ্ছেদ ও ইংরাজী ভাষার প্রচলন ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাভাব সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের প্রচলনও ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদ সঞ্চার করেছিল। গর্ভনর লর্ড ডেলাহাউসীর দ্বারা ভারতে রেল ও ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হল।

এর দ্বারা দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তি গনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকরতে সাহায্য করল। যার দ্বারা ভারতীয়রা এসব সুত্রে আবদ্ধ হতে পারলেন। লর্ড রিপনের দ্বারা প্রচলিত স্বায়ত্ব শাসন ব্যবস্থা ভারতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সৃষ্টি করল।

ব্রিটিশদের ত্রুটিপূর্ণ শাসন নীতি ঃ

ইংরেজ শাসন কালে ভারতীয়দের শাসন ক্ষেত্রে অংশগ্রহন করার কোনো সুযোগ ছিল না। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রধান বড়লাট, ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা প্রনীত আইন অনুসারে শাসন করতেন। বড় লাট তাঁর কার্য্যকরী পরিষদ ও ব্যবস্থাপক পরিষদ দ্বারা শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। এই পরিষদে অধিকাংশই ইংরেজ সভ্য ছিল। এতে ভারতীয়রা খুব অসন্তুষ্ট ছিল।

তোমার জন্য কাজ।

১। ভারতে ইংরেজ শাসন আর্শীবাদ না অভিশাপ এব্যাপারে একটি তর্ক সভার আয়োজন কর।

২। সর্ব ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা (**IPS**) য় যোগ দিতে হলে তোমাকে কি করতে হবে অন্যদের কাছ থেকে বুঝে লেখ।

ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের দমন ও শোষন করতে লাগল। উচ্চশিক্ষাও ভারতীয়দের 'প্রশাসনিক সেবা' পরীক্ষা দিতে হলে খুববেশী খর্চা করতে হত কারন সেটা ভারতে না হয়ে ইংল্যান্ডে হত। ফলে গরীব মেধাবী ছাত্রেরা এর থেকে বঞ্চিত হত। এই সব অন্যায় আচরন কে প্রতিবাদ জাতীয়তাবাদ চেতনায উদ্বুদ্ধ হলেন।।

ব্রিটিশ শাসন কালে ভারতীয়রা নিজের দুখ দুর্দ্দশার প্রতি বিশেষ ভাবে সচেতন হলেন। ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতি সর্বশ্রেনীর লোকেদের স্বার্থ বিরোধী ছিল।

ব্রিটিশদের অর্থনৈতিক শোষন ঃ

ব্রিটিশ শাসন কালে তাদের শোষন মূল অর্থনীতি সাধারনের স্বার্থ বিরোধী ছিল, কর, রাজস্ব ও বানিজ্যের মাধ্যমে ভারত থেকে প্রচুর অর্থ ইংল্যান্ডে যাচ্ছিল। ভারতে উৎপাদিত তুলো গিয়ে ইংল্যান্ডের কাপড় কলে কাপড় বোনার কাজ চলত, আবার সেটা ভারতের বাজারে এসে

বিক্রী হত। এর দ্বারা ভারতীয় শিল্পের প্রভূত ক্ষতি হল। ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতিও শিল্প নীতির জন্য ভারতের কুটির শিল্পের অবনতি হয়ে গেল। জমি জমা আইন চাষীদের স্বার্থ বিরোধী হল। জমিদাররা গরীব কৃষকদের শোষন করতে লাগল। ফলে গরীব কৃষকবা অসন্তুষ্ট হল। এর বিরুদ্ধে ভারতীয়রা সংঘবদ্ধ ভাবে স্বর উত্তোলন করল।

বর্ণ বৈষম্য নীতিঃ

ইংরেজরা নিজেদের গোরা সম্প্রদায় ও ভারতীয়দের কৃষ্ণ সম্প্রদায় রূপে বিবেচনা করতো। এধরনের পার্থক্যভাব পোষন করে তারা ভারতীয়দের হীন দৃষ্টিতে দেখত। তারা স্বতন্ত্র রেল বগি, হোটেল, ডাক্তার খানা, ক্লাব প্রভৃতি ব্যবহার করত। উচ্চশিক্ষিত ভারতীয়রাও ইংরেজদের জন্য নির্দ্দিষ্ট রেল বগি ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারতনা। ভারতীয় বিচার পতিদের ও ইংরেজ অপরাধীর বিচারের ক্ষমতা ছিল না। শিক্ষিত ভারতীয়রা যোগ্যতা অর্জ'ন করে যথেষ্ঠ যোগ্য হলেও তাদের উচ্চ পদে কখনো নিয়োগ করা হত না। ভারতীয়রা বিভিন্ন ভাবে বঞ্চিত হতেন।

উপরোক্ত কারন গুলির জন্য ভারতীয়রা ইংরেজ সরকারের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং তাদের মনে স্বদেশী প্রীতি ভাব জাগ্রত হল। তারা জাতীয়তাবাদে উদবুদ্ধ হয়ে ইংরেজ বিরোধী অভিযান যোগ দিলে এই জাতীয়তাবাদের বিকাশ স্বাধীনতা সংগ্রামকে প্রেরনা যোগাল।

তুমি জান কি?

গোরা কালোর অবাঞ্ছিত ভেদভাবকে 'বর্ণ বৈষম্য' বলা হয়। এই ভাবাপন্ন ইংরেজরা কৃষ্ণকায় ব্যাক্তিকে ঘৃনার চোখে দেখত

সাহিত্য ও সম্বাদ পত্রের ভূমিকাঃ

জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করার পেছনে সংবাদ পত্রগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ ছিল। ইংরাজী, হিন্দী, উর্দ্দ ও আঞ্চলিক বহু সংবাদ পত্রে ভারতীয় নেতাদের জাতীয়তাভাব সূচক মতামত, ইংরেজ শাষনের সমালোচনা এবং ইংরেজ দের অত্যাচার সর্ম্পকে লেখা বেরোত। কয়েকটি মূখ্য সংবাদপত্রের মদ্যে মারাঠা কেশরী, দি ইন্ডিয়ান মিরার সংবাদ কৌমুদী, মিরিট -উল-আখবার, অমৃত বাজার পত্রিকা, দি হিন্দু, মুখ্য ভাবে ভারতীয় জনমত কে প্রভাবিত করত।

তুমি জান কি?

জাতীয় গীত বন্দেমাতরম বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে লিখিত। এই গান স্বদেশী আন্দোলনের সময় লোকেদের মনে উৎসাহ ও ুদ্দিপনা সৃষ্টি করেছিল।

অনেক ভারতীয় লেখক সাহিত্যের মাধ্যমে জাতীয় চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীন বন্ধু মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লক্ষ্মীনাথ বেজু বড়ুয়া, সুব্রমনিয়াম ভারতী, ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র এবং আলতাফ হুসেন প্রভৃতি অগ্রগন্য।

অতীত ভারতের গৌরবের পূণরাবিষ্কারঃ

স্যার উইলিয়াম জোন্স, প্রফেসর ম্যাক্স মুলার, মোনিয়ার উইলিয়ামস, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডর কর এবং হর প্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষি গন ভারতের ইতিহাস গবেষনা ও লেখার মাধ্যমে ভারতের গৌরব উপস্থাপন করেছিলেন এবং বেদ ও উপনিষেদের উৎকর্ষতা প্রতিপাদন করেছিলেন। এটা ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাভাব সঞ্চারিত করেছিল।

ভারতায় জাতীয় কংগ্রেসঃ

জাতীয়তাবাদী মহা চিন্তাধারাতে উদ্‌বেলিত হয়ে ভারতীয় রাজনীতির আকাশে কয়েক জন মহামনীষির আবির্ভাব হল। তাঁদের জাতীয় স্তরের বৌদ্ধিক সমাবেশকে ''জাতীয় কংগ্রেস'' বলা হয়। ইংরেজ শাসক আমাদের জাতীয় স্বার্থ বিরোধী থাকলেও সময়ে সময়ে তাঁদের মধ্যে থেকে কিছু উদার মহামহিম ব্যক্তিত্ব আমাদের ভারতীয় সংগঠনকে

আল্যান অক্টাভিয়ান হিউম্

সমর্থন ও সহায়তা করতেন। তাঁদের মধ্যে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম অন্যতম। তিনি একজন অবসর প্রাপ্ত ইংরেজ প্রশাসনিক অধিকারী ছিলেন। তিনি ভারতীয়দের সংগঠনিক সমাবেশ কে দিগদর্শন দিতেন।

জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম ঃ

১৮৮৫ সালে অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম, শিমলায় বড়লাট ডাফরিন কে সাক্ষাৎ করলেন। ভারতীয়দের জন্য একটি সংগঠনের আবশ্যকতা আছে বলে ডাফরিন কে অবগত করালেন। হিউমের পরামর্শ অনুযায়ী এই সংগঠন সরকারকে দেশ হিউমের বাসীর অভাব, অভিযোগ জানাবে। প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল এই সংঘ ভারতীয়দের অবশ্যম্ভাবী বিদ্রোহ থেকে নিবৃত্ত করবে। বড়লাট ডাফরিন ও অনুভব করলেন যে ইংল্যান্ড সরকারের কার্য্যকলাপ কে সমালোচনা করে, তার দোষ ত্রুটি জানিয়ে সতর্ক করার মত একটি বিপক্ষদল কিছু নেই। তিনি একথা হৃদয়ঙ্গম করে ''জাতীয় কংগ্রেস'' প্রতিষ্ঠা করতে হিউম কে উৎসাহিত করলেন।

তোমার জন্য কাজঃ

১। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত ভারতে থাকা অন্য সংগঠন গুলির সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ কর।

এই ভাবে 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' আবির্ভুত হল। অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

প্রথম অধিবেশন ঃ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন ১৮৮৫ র ডিসেম্বর ২৮ ও ২৯ এ বম্বের গোকুল দাস তেজপাল সংস্কৃত কলেজে বসেছিল কলিকাতার বিশিষ্ট আইন জীবি উমেশ চনদ্র ব্যানার্জী এতে সভা পতিত্ব করেছিলেন। এই অধিবেশনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ৭২ জন প্রতি নিধি যোগ দিয়ে ছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রাথমিক লক্ষ ঃ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ইংরেজ সরকারের কাছে ভারতীয়দের পক্ষ থেকে লোকেদের অভাব, অসুবিধা, অভিযোগ আগত করে সেগুলোর সমাধানের উদ্যাম করবে বলে প্রাথমিক লক্ষ ধার্য্য করা হল। আন্দোলন ও বিদ্রোহ কংগ্রেসের মৌলিক অভিপ্রায় ছিল না।

সরকারের বিরোধ না করে সম্পুর্ণ সহযোগে যুক্তি যুক্ত দাবি হাসিল করা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ছিল।

কংগ্রেসের কার্য্য ঃ

জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবর্গ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেক বছর কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত করলেন।। সেই অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি সরকারের নিকটে উপস্থাপিত করলেন। সরকারকে দেশের সমস্য গুলো জানানোর সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডের ভারতের সপক্ষে জনমত সংগ্রহ করার প্রয়াস করলেন। এছাড়া উদারচেতা ইংরেজ নেতৃবর্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ভারতের ন্যায্য দাবী সম্পর্কে হৃদয়ঙ্গম করালেন।

নরমপন্থী ঃ

প্রাথমিক ভাবে ১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ এর মধ্যে সংগ্রেসের দাবী অতি সাধারন ও সুলভ ছিল। সরকারের কাছে অনুনয় অনুরোধ করে নেতৃবর্গ দাবি হাসিল করছিলেন। তাই এতাদেশ ব্যক্তিদের নরমপন্থী আখ্যা দেওয়া হল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে, ও মহাদেব গোবিন্দ রানাডে প্রভৃতি নরম পন্থীদের নেতৃত্বে

নিয়েছিলেন। নেতৃত্ব নেওয়া ব্যাক্তিগন নিম্নলিখিত দাবী গুলো সরকারের নিকট উপস্থাপন করলেন।

১) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভায় ভারতীয়দের তরফ থেকে প্রতিনিধিত্ব করার ব্যবস্থা।

২) ভারতীয় প্রশাসনিক পরীক্ষ ইংল্যান্ডে হওয়ার পরিবর্ত্তে ভারতেও আয়োজন করার ব্যবস্থা।

৩) ভারতীয় প্রশাসনিক পরীক্ষার জন্য ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের বয়স সীমা বাড়ানো।

৪) সামরিক খাতে খর্চা কম করে, শিক্ষা কৃষি ও শিল্পের বিকাশে অধিক ধ্যান দেওয়া।

৫) অস্ত্রশস্ত্র আইনে সংস্কার করা।

জাতীয় কংগ্রেসের বিকাশঃ

সময়ানুক্রমে শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেক লোক কংগ্রেসে যোগ ছিল। বুদ্দিজীবিদের মধ্যে উকিল, ডাক্তার, লেখক ও সাংবাদিক রা এতে সামিল হলেন। এমন কি সরকারী কর্মচারীরা ও প্রমুখ ভূমিকায় অবর্তীন হলেন। তাঁরা কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাননি প্রাথমিক স্তরে জাতীয় কংগ্রেসের নরম পন্থীদের ধারনা ছিল যে ভারতের বিকাশ ইংরেজদের দ্বারাই সম্ভব।

চরমপন্থীঃ

১৯০৬ তে স্বাধীনতা সংগ্রামের পরবর্ত্তী পর্যায়ে জাতীয় কংগ্রেসের আর একটি সংগ্রামী গোষ্ঠীর আবির্ভাব হল। তারা নরম পন্থীদের অনূরোধ, প্রার্থনা, অনুনয় প্রভৃতি পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করলেন। তাদের যুক্তি হল স্বাধীনতা ভারতীয়দের ন্যায্য দাবি। একে যে কোনো ভাবে হাসিল করা দরকার। এটা কাউকে হাত পেতে চাইতে হবে না। এদের চরমপন্থী বলা হল। এই চরমপন্থার উদীয়মান ব্যক্তিত্ব হলেন, মহারাষ্ট্রের লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায়, পশ্চিম বঙ্গের বিপিন চন্দ্রপাল, ও অরবিন্দ ঘোষ। তাঁরা লোকেদের মধ্যে দেশাত্মবোধ ভাব সঞ্চার করেছিলেন। লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিন চন্দ্রপাল ''লাল-বাল-পাল'' নামে খ্যাত হলেন।

লালা লাজপত রায় বাল গঙ্গাধর তিলক বিপিন চন্দ্র পাল

বঙ্কিম চন্দ্র চ্যাটার্জী 'বন্দে মাতর্‌ম' কবিতা লিখে ভারতীয়দের দেশ প্রান মনোভাবে উদবুদ্ধ করে ছিলেন। বাল গঙ্গাধর তিলক বলে ছিলেন '' স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার''

তোমার জন্য কাজঃ

নরম পন্থীরা দাবি হাসিল করার জন্য যে সব পন্থা অবলম্বন করতেন বলে তুমি ভাবছ তা লেখ।

জাতীয় কংগ্রেসের প্রারম্ভ কালীন অন্যান্য অধিবেশনঃ

জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন কলিকাতা মহানগরীতে ১৮৮৬ র ডিসেম্বর ২৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

এতে ৪৩৬ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। এই সভায় দাদা ভাই নাউরোজী সভাপতিত্ব করেছিলেন।

১৮৮৭র ডিসেম্বর জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভায় ৬০৭ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। বদরুদ্দিনত্যাবজী এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন।

কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন ১৮৮৮ সালে ডিসেম্বরে এলাহাবাদে বসেছিল। জর্জ ইয়ুল সভাপতি ভাবে এই অধিবেশন পরিচালতি করেছিলেন। এতে ১৪২৮ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন।

১৮৮৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ১৮৮৯ জন প্রতিনিধি নিয়ে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশন বম্বেতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল

এতে উইলিয়াম ভারতের কর্ণ সভাপতিত্ব করেছিলেন।

কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন কলিকাতায় ১৮৯০ সালে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতে ফিরোজশাহ মেহতা সভাপতিত্ব করে ছিলেন।

৮১২ জন প্রতিনিধি নিয়ে ১৮৯১ সালে কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন নাগপুরে আনন্দ চারলুর সভাপতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশন বিভিন্ন স্থানে হয়েছিল।

বঙ্গ বিভাজন ঃ

লর্ড নাথানিয়েল কার্জন ১৮৯৯ সালে ভারতের বড়লাট হয়ে এলেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী ছিলেন। একে সম্পূর্ণ ভাবে শেষ করে দেওয়া তার ইচ্ছা ছিল। বঙ্গ বিহার ওরিশা কে নিয়ে এক বিরাট প্রদেশ ছিল বাংলা। এত বড় প্রদেশের প্রশাসনিক অসুবিধের কথা ভেবে সে বিভাজনের কথা চিন্তা করল। বঙ্গের পূর্ব ভাগ আসামের সঙ্গ মিশিয়ে দেওয়া হল। ঢাকায় ইহার রাজধানী করা হল। বঙ্গের পশ্চিম ভাগ বিহার ও ওড়িশা কে নিয়ে পশ্চিম বঙ্গ গঠিত হল। কলিকাতা এর রাজধানী হল। এর ফলে বাংলা ভাষায় লোক দুভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। সাধারন জনতা উভক্ষিপ্ত হল।জাতীয় কংগ্রেস একে বিরোধ করল। বিরোধিতা কে ভ্রুক্ষেপ না করে ইংরেজ সরকার ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভাজন ঘোষনা করল। বঙ্গ প্রদেশে মাথা চাড়া দিতে থাকা তীব্র জাতীয়তাবাদ প্রতিহত করা ও সাম্প্রদায়িক তিক্ততা ভারতীয়দের মধ্যে সৃষ্টি করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

স্বদেশী আন্দোলন ঃ

লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাজন ঘোষনা করল। লোকেরা একে মানল না বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠল সারা দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হল। উদার পন্থী তথা নরম পন্থীরা প্রকাশ্যে আন্দোলনের জন্য মত দিল। চরম পন্থীরা ন্যায়োচিত অধিকার সাব্যস্ত করতে বলপূর্বক দাবি করল। এর ফলে ১৯০৫ সালে 'স্বদেশী আন্দোলন' আরম্ভ হল।

পূর্বে আমেরিকা, আয়াল্যান্ড ও চীন দেশের লোকেরা এই নীতি অবলম্বন করেছিল। ভারতীয় শিল্পের বিকাশের জন্য এই ''স্বদেশী আন্দোলন'' ছিল এক মহত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পদক্ষেপ।

আন্দোলনের লক্ষ ঃ

১) বিদেশী তথা বিলিতী দ্রব্য বর্জন করা।

২) দেশীয় অর্থাৎ ভারতীয় উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহার করা এবং ভালোবাসা।

৩) স্বদেশ প্রিতী ভাব উদ্রেক ও সঞ্চার করা।

আন্দোলনের প্রগতি ঃ

স্বদেশী আন্দোলনে ভারতীয়রা স্বরাজ মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত হল। তাদের মধ্যে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রেরনা জাগ্রত হল। চারিদিকে সভাসমিতি শোভা যাত্রার আয়োজন হল। ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ উঠল। বিলিতি কাপড়ে আগুন লাগানো হল। আন্দোলন সূদুর প্রসারী হল। ১৯০৫ এর ৭ই আগষ্ট কলিকাতার টাউন হলে এক সভা বসল। তাতে বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জাতীয় নীতি গ্রহন করা হল। বহু ছাত্র উৎসাহিত হয়ে এই আন্দোলনে যোগদিল। তারা অনেকেই বিদেশী নুন্য চিনি কিনে নষ্ট করে দিল।

আন্দোলনের ফলাফল ঃ

এই আন্দোলনের ফলাফল স্বারূপ ইংরেজ সরকার ও ভারতীয়দের সন্তুষ্ট করার জন্য কিছু রাজনৈতিক চিন্তা করল। স্বাদেশী আন্দোলন ভারতীয়দের মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা আত্মবিশ্বাস ও আত্ম সহায়তাভাব সৃষ্টি ও বিকশিত করতে পেরেছিল।

তোমার জন্য কাজঃ

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে আমাদের দেশে প্রস্তুত দ্রব্যগুলির তালিকা প্রস্তুত কর।

আমরা কি শিখলাম ?

ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিকাশের কারন সম্বন্ধীয়।

ব্রিটিশদের ত্রুটিপূর্ণ শাসন পদ্ধতি।

জাতীয় কংগ্রেসের গঠন, কার্য্য ও লক্ষ।

স্বদেশী আন্দোলন ও তার প্রভাব।

প্রশ্নাবলী

১। নিম্নলিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ৭৫টি শব্দে দাও।

ক) ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশে জন্য সামাজিক, সংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য ভাব কি ভাবে দায়ী ছিল ?

খ) ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ইংরাজী ভাষা ও ইংরেজ শাসন কি ভাবে সহায়ক হল ?

গ) ইংরেজ দের দমন মূলক শাসন পদ্ধতির বিবরনী প্রদান কর।

ঘ) ভারতে জাতীয় কংগ্রেসের কিভাবে আর্বিভাব ও বিকাশ হল ?

ঙ) জাতীয় কংগেসের নরম পন্থীরা কি কি দাবি উপস্থাপন করেছিল ?

চ) বঙ্গ প্রদেশ কিভাবে বিভাজিত হল ?

ছ) স্বদেশী আন্দোলন কি ? এর লক্ষ ও অগ্রগতির সম্বন্ধে একটি বিবরনী প্রদান কর।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর সংক্ষেপে লেখ ।

ক) লাল-বাল-পাল বললে কি বোঝ ?

খ) কোন বিদেশী লেখকের দ্বারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছিল ?

গ) জাতীয় কংগ্রেসের কে প্রথম সভাপতি ছিলেন ?

ঘ) জাতীয়কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন কবে ও কোথায় বসেছিল ?

ঙ) বড়লাট কোন পরিচ্ছদ দ্বারা শাসন পরিচালনা করতেন ?

৩। বন্ধনীর ভেতর থেকে ঠিক উত্তর বেছে শূন্যস্থান পূরন কর।

ক) ভারতে একটি জাতীয় সংগঠনের আবশ্যকতা আছে বলে অ্যালান অক্টভিয়ান হিউক ..... কে অবগত করেছিলেন।

(ডাফরিন, অ্যানি বেসান্ত, ক্যানিং, উইলিয়াম বেন্টিংক)

খ) নিম্নোক্তদের মধ্যে ..... ডাল হাউসীর সময় আরম্ভ হয়েছিল।

(সিপাহি বিদ্রোহ, জাতীয় কংগ্রেস, রেলচলাচল, ইংরাজী শিক্ষা)

গ) লর্ড কার্জন .....সালে ভারতে বড়লাট হয়ে এসেছিলেন।

(১৯০৫, ১৯১৪, ১৮৮৫, ১৮৯৯)

ঘ) গোপাল হরি দেশমুখ ..... ওপরে গুরুত্ব দিতেন।
(জাতীয় কংগ্রেস, স্বদেশী দ্রব্যেচর আবশ্যকতা, দেশাত্মবোধ, স্বাধীনতা আন্দোলন)

৪। রেখাঙ্কিত অংশ পরিবর্তন না করে ভ্রম সংশোধন কর।

ক) ক্যানিংয়ের সময় **ভারতে ইংরাজী ভাষা ও শিক্ষার প্রচলন হল।**

খ) **ইংরেজ শাসন কালে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা** ভারতে হচ্ছিল ।

গ) **ভারতের জাতীয় কংগ্রেস** ১৮৫৭ তে **প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।**

ঘ) **স্বদেশী আন্দোলন** ১৯৪২ **সালে আরম্ভ হয়েছিল।**

৫। 'ক'স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের সম্পর্ক স্থাপিত কর।

'ক' স্তম্ভ	**'খ' স্তম্ভ**
স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার	রেল চলাচল
লর্ড ডেলাহাউসী	১৯০৫
জাতীয় কংগ্রেসের ২য় অধিবেশন	:১৮৮৬
লর্ড কার্জন শাসন	১৮৯৯
	বাল গঙ্গাধর তিলক

MRTWBJ

ষষ্ঠ অধ্যায়

আমেরিকা ও ইউরোপে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও বিপ্লব

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামঃ

কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করার পরে ইউরোপীয়রা সেই নতুন ভূখন্ডে বসতি স্থাপন করার চেষ্টা করল। ১৬২০ সালে ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম জেমস্ প্রোটেষ্টান্ট মত বাদীদের উপেক্ষা করতেন। এর প্রতিবাদে একদল প্রোটেষ্টান্ট মে ফ্লাওয়ার নামক এক জাহাজে করে এসে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট স্থানে অবতরন করে বসতি স্থাপন করন। তাদের 'পিলগ্রিম ফাদার' বলা হয়।

তোমার জন্য কাজঃ

কলাম্বসের আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পেছনে থাকা কারন জানতে চেষ্টা কর।

আমেরিকার উর্ব্বর মৃত্তিকা প্রচুর খনিজ পদার্থ ও শুষ্ক জল বায়ু তাদের প্রলোভিত করল। সেখানে উৎকৃষ্ট তামাক পাতা, তুলো ও পাট চাষ করে তারা নিজেদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করেছিল পরে বহু সংখ্যক ইংরেজ আমেরিকায় গিয়ে তুলো, চিনি, আখ, পশম, পাট ও তামাক ইত্যাদি লাভজনক ব্যবসা করতে লাগল। কালক্রমে ইংরেজরা আমেরিকায় স্থায়ী বসতি স্থাপন করল। ইংরেজরা উত্তর আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলেতেরোটা বসতি স্থাপন করে উপনিবেশ গড়ে তুলল। এই উপনিবেশে ইউরোপের অন্য দেশের অধিবাসীরা থাকলেও ইংরেজদের সংখ্যা সর্বাধিক ছিল। তারা উপনিবেশ গুলোর ওপরে কতৃত্ব বিস্তার করেছিল। ইংল্যান্ড সরকারের অনুমতি নিয়ে ইংরেজরা সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল। ইংল্যান্ড কে মাতৃদেশ ও উপনিবেশ গুলো কে তার কন্যারূপে তারা গ্রহন করত। উপনিবেশ গুলি ইংল্যান্ড পার্লামেন্টের আইন অনুসারে পরিচালিত হত। ইংল্যান্ড এই উপনিবেশ গুলির সার্বভৌম শাসক ছিল। ইংল্যান্ড ও আমেরিকার মধ্যে অ্যাটলান্টিক মহাসাগর থাকায় উভয় দেশের মধ্যে গমনাগমন ও যোগাযোগ কষ্টকর হত। তাই ইংরেজ সরকার উপনিবেশ গুলির সমস্যা বুঝতে অসমর্থ হচ্ছিল। কিন্তু নিজের আর্থিক স্বার্থের জন্য উপনিবেশ বিনিয়োগ করত। কিন্তু তারা উপনিবেশের স্বার্থের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিত না।

এর ফলে উপনিবেশ বাসীদের মনে বিদ্রোহের সুত্রপাত হল। তবুও তারা ইংল্যান্ডের প্রভুত্ত মেনে নিয়েছিল।

নিম্নোক্ত কয়েকটি কারনের জন্য আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল।

উপনিবেশে ত্রুটি পূর্ণ শাসন পদ্ধতিঃ

আমেরিকার উপনিবেশ গুলিতে ইংরেজদের প্রবর্ত্তিত শাসন পদ্ধতিতে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল। প্রত্যেক উপনিবেশে একজন করে শাসন কর্ত্তা বা গর্ভনর ছিল। এবং এটা এক প্রতি নিধিমূলক শাষক সংস্থা দ্বারা শাষিত হত। গর্ভনর ইংল্যান্ড রাজ্যর প্রতি নিধি ভাবে অবস্থাপিত হত। তার বেতন উপনিবেশের রাজকোষ থেকে দেওয়া হত। এটা উপনিবেশের প্রতিনিধি সভা মঞ্জুর করত। প্রতিনিধি সভার সভ্যরা উপনিবেশের অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচিত হত। এই প্রতিনিধি সভা কর আদায়, আইন প্রনয়ন এবং বহুদায়িত্ব সম্পাদন করতে থাকলেও এর কোনো স্বাধীনতা ছিল না। স্বাধীন ভাবে কোনো আইন প্রনয়ন করে প্রয়োগ করার ক্ষমতা ছিল না। গভর্নর ইংল্যান্ডের স্বার্থ প্রতি নজর রেখে উপনিবেশ গুলি কে উপেক্ষা করত। যার ফলে প্রতিনিধি সভা ও গভর্নরের মধ্যে মত পার্থক্য হয়ে বিবাদ আরম্ভ হল।

সুরতাং উপনিবেশের অধিবাসীর ইংল্যান্ডের বিরোধে সংগ্রামে নেমে পড়ল।

একচেটিয়া বানিজ্য নীতিঃ

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বারা উপনিবেশ গুলির জন্য প্রচলিত বানিজ্যনীতি স্বাধীনতা সংগ্রামের মুখ্য কারন হয়েছিল।

উক্ত নীতিতে ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে ইংল্যান্ডে যে সব পদার্থ উৎপাদন হত না সে সব আমেরিকার থেকে নেওয়া হবে কিন্তু ইংল্যান্ডের জাহাজ ছাড়া অন্যদেশের জাহাজে মাল পত্র আনা নেওয়া করা যাবে না। উপনিবেশ কারীরা তামাক, তুলো, চিনি, প্রভৃতি দ্রব্য ইংল্যান্ড ছাড়া অন্য দেশে রপ্তানী করতে পারবেনা এবং ইংল্যান্ডের লৌহ ও কার্পাস শিল্প ব্যাতীত অন্য দেশের শিল্প কে উপনিবেশে স্থাপন করতে পারবেনা।

উপনিবেশের আর্থিক উন্নতি না করে নিজের লাভ বাড়ানোর জন্য আইন সব প্রনয়ন করা হল। যার ফলে উপনিবেশের অর্থনীতি দুর্ব্বল হয়ে পড়ল।

স্ট্যাম্প আইন প্রনয়নঃ

আমেরিকা উপনিবেশে গুলো ফ্রান্সের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্য ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সাত বছর ধরে যুদ্ধ হয়ে ছিল। এই যুদ্ধে খরচ হওয়া অর্থের কিছু পরিমান পুনঃ প্রাপ্তির জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৭৬৫ সালে স্ট্যাম্প আইন প্রনয়ন করা হল। এই আইন অনুযায়ী উপনিবেশের অধিবাসীদের জমি কেনাবেচার ওপর নির্দ্ধারিত মূল্যের স্ট্যাম্প লাগনো বাধ্য তা মূলক করা হলো। স্ট্যাম্পের অর্থ ইংরেজ সরকার পাবে। কিন্তু উপনিবেশের অধিবাসীরা এই আইনের বিরোধ করল, যুক্তি দেখাল যে আইন প্রনয়ন পালামেন্টে হওয়ার সময় উপনিবেশের কোনো সভা সেখানে ছিল না। প্রতিনিধিত্ব বিনা কর ধার্য্য অন্যায়, এর বিরোধে আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল।

কর ধার্য্য ঃ ইংলন্ডের মন্ত্রী মহলে স্ট্যাম্প আইনের বদলে বিভিন্ন দ্র ব্যের ওপরে কর ধার্য্য করা নিষ্পত্তি নেওয়া হল। এতে, কাঁচ, কাগজ রং বা চা প্রভৃতি আবশ্যক পদার্থে আমদানী কর বসল। ওই জন্যে উপনিবেশে আবার অসন্তোষ দেখা দিল। ফলে ইংরেজ সরকার অন্য সব জিনিসের ওপর কর তুলে ছিলেন।

কিন্তু চায়ের ওপর থেকে কর তুলল না। একে বিরোধ করে উপনিবেশের অধিবাসীরা চা বর্জন করলেন।

বোষ্টন চা সংঘর্ষঃ

চায়ের ওপর থেকে কর প্রত্যাহার না করায় ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলন্ড থেকে আসা একটি চা বোঝাই জাহাজ ম্যাসাচুসেট বোষ্টন বন্দরে পৌছনের পরে আন্দোলন কারীরা লোহিত ভারতীয়ের ছদ্ম বেশে জাহাজে প্রবেশ করে শয়ে শয়ে চায়ের পেটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করল। এই ঘটনাকে আমেরেকীয়রা 'বোষ্টন চা সংঘর্ষ' নামে বর্ননা করেছেন।

বোষ্টন টি পার্টি

উক্ত ঘটনার প্রতিকার স্বরূপ ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড নর্থ আইন প্রনয়ন করে বোষ্টন বন্দর বন্ধ করে দিলেন। এবং সভা সমিতির ওপর নিষেধাক্ষা জারি করেছিলেন।

বিদ্রোহ আরম্ভঃ

১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাসচুসেটসের অধিনায়কত্বে১৩ টি উপনিবেশ থেকে জর্জিয়া ছাড়া অন্য উপনিবেশের প্রতিনিধি গন ফিলাডেলফিয়া নামক স্থানে সম্মিলিত হলেন। উক্ত সম্মিলনীতে টমাস জেফারসন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, ও জর্জ ওয়াসিংটন মুখ্য ভুমিকায় ছিলেন। সেখানে তারা উপনিবেশীয় অধিকার নামে একটি দলিল প্রস্তুত করলেন। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৪ ঠা জুলাই ফিলাডেলফিয়াতে অন্য এক সম্লিনীতে তেরোটি উপনিবেশের প্রতিনিধি গন সম্মিলিত ভাবে তাদের উপনিবেশ গুলি 'মুক্ত ও স্বাধীন' বলে ঘোষনা করলেন। এই ঘটনাটি স্বাধীতার ঘোষনা নামে বিখ্যাত। এটাই

যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকাকে জন্ম দিল। তারা টমাস জেফারসনের দ্বারা প্রনীত 'স্বাধীনতার ঘোষনা পত্র' তে সাক্ষর করলেন। এই ঘোষনা পত্রের মূলমন্ত্র ছিল ''সমস্ত লোকের স্বাধীন ভাবে সুখি জীবন যাপন করা তাদের জন্ম গত অধিকার। এই অধিকার থেকে মানুষকে কোনো কারনেই বঞ্চিত করা যেতে পারবেনা শাসিত দের সম্পত্তি থেকেই শাসক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়। একছত্র বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রত্যেকের অধিকার বলে এই ঘোষনা পত্রে উল্লেখ ছিল। সেখানে ইংল্যান্ডের বিরোধে যুদ্ধ ঘোষনা করা হল।

জর্জ ওয়াসিংটন

তখন ইংল্যান্ডের রাজাছিলেন তৃতীয় জর্জ। তাঁর আদেশে ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী আমেরিকায় পাঠানো হল। এর নেতৃত্ব নিয়ে ছিলেন লর্ড কনওয়ালিস ও জনবারগোয়েন।

উপনিবেশ বাসীদের সেনাপতি ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের সেনাধ্যক্ষ জন বারগোয়েন আমেরিকা বাসীদের কাছে পরাজিত হলেন। অবশেষে ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সেনাধক্ষ লর্ড কর্নওয়ালিস ভার্জিনিয়ার ইয়র্ক টাউনে পরাজিত হয়ে আমেরিকীয়দের কাছে আত্মসর্ম্পন করেছিলেন।

তুমি জান কি?

১৭৭৬ জুলাই ৪ তারিখে আমেরিকার উপনিবেশ কারীর স্বাধীনতা ঘোষনা করে থাকার জন্য প্রতিবন্ধ এই দিনটি আমেরিকার অধিবাসীরা নিজের দেশের স্বাধীনতা দিবস রূপে পালন করেন। টমাস জেফার সনের 'স্বাধীনতা ঘোষনা পত্র' আধুনিক গনতন্ত্রের বিকাশে এক মাইল খুটি রূপে পরিগনিত।

১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে একটি শান্তি চুক্তি সাক্ষরিত হল। ইংল্যান্ড ১৩টি আমেরিকীয় উপনিবেশকে স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফলঃ

স্বাধীনতা লাভের পরে তেরোটি উপনিবেশের প্রতিনিধি -গন ফিলাডেলফিয়ার এক সম্মিলনী তে মিলিত হয়ে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা রাষ্ট্র গঠন করলেন। এটাই আধুনিক পৃথিবীর সর্বপ্রথম সাধারন তন্ত্র রাষ্ট্র ভাবে পরিচিত হল। এর লিখিত সংবিধান প্রস্তুত করা হল। এটা গণতন্ত্র শাসনের রূপরেখা ছিল। জর্জ ওয়াশিংটন যুক্ত রাষ্ট্র আমেরিকার প্রথম রাষ্ট্রপতি ভাবে নির্বাচিত হলেন। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীনতা ও ন্যায় পাওয়ার অধিকারকে সংবিধানে স্বীকৃতি দেওয়া হল। এই স্বাধীনতা সংগ্রাম উপনিবেশবাদের বিলোপে সহায় হয়েছিল এবং অন্য দেশ কেও স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করেছিল। এটা ফরাসী সামন্তগোষ্ঠী ও স্বেচ্ছাচারী শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার প্রেরনা যুগিয়েছিল।

তোমার জন্য কাজঃ

ইংল্যান্ডের শক্তিসালী সেনাবাহিনী কেন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে পরাজিত হয়েছিল, অনুশীলন কর।

ফরাসী রাষ্ট্রে বিপ্লব (১৭৮৯)

১৭৮৯ সালে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল । যা সারা বিশ্ববাসীকে সচকিত করেছিল ফরাসীরা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ পদক্ষেপ নিয়ে ফ্রান্সের ইতিহাস বদলে দিয়েছিল। দীর্ঘদিনের অসন্তোষের পরি সমাপ্তি ঘটল। এটা মুখ্যত ঃ নিম্নলিখিত কারনগুলির জন্যে ঘটে ছিল।

স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র শাসনঃ

সপ্তদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদশক পর্যন্ত ফ্রান্সে বোবোঁ বংশীয় শাসকরা রাজত্ব করত। তারা খুব স্বেচ্ছাচারী ছিল। ১৬৪৩ থেকে ১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বোবো বংশের চতুর্দশ লুই রাজা ছিলেন। তিনি বলতেন ''আমিই হচ্ছি রাষ্ট্র'' । দেশে আইন বলে কিছু ছিলনা। তিনি যা বলতেন সেটাই আইন। তিনি বিলাস পূর্ণ জীবন যাপন করতেন। তারপরে পরে পঞ্চদশ লুইও ভোগবিলসে জীবনকাটাতে লাগলেন। দেশের শাসনের প্রতি নজর

দিলেন না। ব্যায় বহুল যুদ্ধ করে ফ্রান্সের আর্থিক দুরবস্তার জন্য দায়ী ছিলেন। তার পরে ষোড়শ লুই জেদী ও রাজ্য শাসনে উদাসীন ছিলেন। রাজা ও তাঁর রানী মেরী এঁতোয়নেত ভোগ বিলাসে ডুবে থাকতেন।

রাজপ্রাসাদের কর্ম চারীরা রাজস্ব আদায়ের ন ভাগ খর্চা করত। প্রজাদের জন্য কোনো উন্নতি মূলক কার্য করা হতো না।

তুমি জান কি?

ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই স্বেচ্ছাচারী শাসকের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন। "আমার বানী হচেছ শাসনের নিয়মাবলী আমি ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তাই আমিই প্রভু আর প্রজা হচ্ছে সেবক।"

ষোড়শ লুই

সামাজিক বিভাজনঃ

ফ্রান্সের সামাজিক শ্রেনীর জন্ম, পদপদবী ও ধনসম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছিল। সমাজ দুই শ্রেনীতে বিভক্ত ছিল। একটা হচ্ছে সুযোগ সুবিধা ভোগী উচ্চ শ্রেনী ও অন্যটি হচ্ছে অবহেলিত, শোষিত নির্যাতিত নিম্নশ্রেনী। ধর্মযাজক ও সম্ভ্রান্ত বংশীয় লোকেরা সুবিধা ভোগী ছিল। এদের সংখ্যা জন সংখ্যার শতকড়া ৫ ভাগ ছিল। এরা ভূসম্পত্তির মালিক ছিল। যোগ্যতা না থাকলেও তারা উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত হত। ধর্ম যাজকরা সাধারণ লোকের কাছ থেকে ধর্ম কর আদায় করে নিজের ভোগ বিলাসে খর্চা করত। সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত শ্রেনীতে কৃষক, কারিগর । সাধারন নাগরিক ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল ভাগচাষী ও দিন মজুর। তারা সামন্তদের জমিতে বিনা অথবা খুব সামান্য পয়সায় খাটতো।

সাধারন কৃষকরা উৎপাদিত শষ্য ৪ ভাগের তিন ভাগ কর হিসেবে দিত। জঙ্গল থেকে জালানি কাঠ সংগ্রহ করা বা অনাবাদি জমিতে পশু চারন করার অধিকার তাদের ছিলনা।

সমাজে উকিল, ডাক্তার, লেখক, শিক্ষক সাধারণ ব্যবসায়ী ও ছোট শিল্প পতিরাও সুবিধা বঞ্চিত শ্রেনীর অন্তভুক্ত ছিল। সব ধরনের যোগ্যতা থাকলেও তারা সরকারী চাকরী থেকে বঞ্চিত হতেন। ব্যবসা করা ও শিল্প করার জন্যে অনুমতি পাওয়া যেতনা। এই জন্য তারা সংগ্রাম করতে আগুয়ান হল।

অর্থনৈতিক বৈষম্যঃ

শাসকদের বিলাস বহুল জীবন যাপন তার সঙ্গে ইংল্যান্ডের সাথে সপ্তবর্ষ ব্যাপি যুদ্ধে ফ্রান্সের রাজকোষ শূণ্য হয়ে পড়িছিল। বোবোঁ শাসকরা অন্যদেশ থেকে ঋন সংগ্রহ করেছিলেন। এই অর্থকে পূরণ করার জন্য কৃষকদের কাছ থেকে কর আদায় করা হচ্ছিল। লবন কর, পথ কর ও জল কর দিতে বাধ্য করা হচ্ছিল। ফলে কৃষক, কারিগর ও অন্যান্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় লোকেদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হল এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তুমি জান কি ?

আমেরিকা উপনিবেশ গুলো ফ্রান্সের কবল থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ইংল্যান্ডের ও ফ্রান্সের মধ্যে ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ পর্য্যন্ত দীর্ঘ সাত বছর ধরে যুদ্ধ হয়েছিল। একে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধ বলা হয়।

দার্শনিকদের ভূমিকাঃ

সেই সময় প্রসিদ্ধ দার্শনিক ভলটোয়ার, মন্টেস্কু ও রুষো প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার ত্রুটির বিরুদ্ধে লোকেদের মনে বিদ্রোহ ভাব জন্মলেন। মন্টেস্কু ফ্রান্সের স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র শাসন ও সামাজিক বৈষম্য কে সমালেচনা করে "স্পিরিট অফ্ ছিল" বা আইনের তাৎপর্য্য নামক পুস্তক লিখেছিলেন। ভলতেয়ার, ফ্রান্সের ধর্মযাজক দের দ্বারা গীর্জায় হওয়া দুনীতি ও অনৈতিক কার্য্যের প্রতি লোকেদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছিলেন। তিনি বহু প্রচার পত্রের মাধ্যমে সরকার ও সুবিধা ভোগী

ভলটেয়ার

শ্রেনীর লোকেদের সমালোচনা করেছিলেন। রুষো ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে সোসিয়াল কন্ট্রাক্ট নামক পুস্তকের মাধ্যমে বিপ্লবের ইন্ধন যুগিয়ে ছিলেন। তিনি বলতেন মানুষ মুক্ত হয়ে জন্মেছে। কিন্তু সর্ব ক্ষেত্রে সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে আছে, ভাতৃত্ব ও সার্বভৌমত্বর ওপরে গুরুত্বরোপ করে বিপ্লবের আগুনে ইন্ধন যোগাতেন।

মন্টেস্কু

এই দার্শনিক গন ছাড়াও ফ্রান্সের প্রভাবশালী চিন্তা নায়কগন তাদের লেখার মাধ্যমে বিদ্রোহ ভাব সৃষ্টি করেছিলেন।

রুষো

বিপ্লবের ঘটনাবলীঃ

ফ্রান্সের সামাজিক, আর্থিক পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে চলে যাওয়ায় ষোড়শ লুই ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসের পাঁচ তারিখে ফ্রান্সের প্রতিনিধি সভার একটি বৈঠকের আহ্বান করলেন। সামন্ত, পুরোহিত ও সাধারন লোককে একত্র না বসিয়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রকোষ্টে বসার জন্য সাধারন লোক অপমানিত হয়ে নিকটবর্ত্তী টেনিস মাঠে মিলিত হয়ে ফ্রান্স দেশের জন্য সংবিধান প্রচলিত না হওয়া পর্য্যন্ত তারা একত্রিত থাকবে বলে শপথ নিলেন। একে ''টেনিস মাঠের শপথ'' বলে। বিপ্লবের জন্য আহ্বান দিয়ে অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল দুর্গর ওপরে নজর দিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই জুলাই বিপ্লবীরা বাস্তিল দুর্গ আক্রমন করে কারাগার ভেঙে দিল এবং বন্দীদের মুক্ত করে দিল। বাস্তিল দুর্গের গভর্নর ও দুর্গরক্ষীদের হত্যা করল। বাস্তিলের পতনের পরে ষোড়শ লুই নামেই শুধু শাসক হয়ে রইলেন।

বিদ্রোহীরা প্রতিনিধি সভার স্থানে জাতীয় সভা নামে একটি পরিষদ গঠন করল। এই সভাকে আবার জাতীয় সংবিধান সভার নামে নামিত করে দেশের সংবিধান প্রনয়ন করা হল। নতুন সংবিধানে সবাইকে সমান অধিকার এবং স্বাধীনতা দেওয়া হল। যোগ্যতা অনুসারে সরকারী পদ পাবার ব্যবস্থা করা হল। সর্বশ্রেনীর লোকের ওপর কর

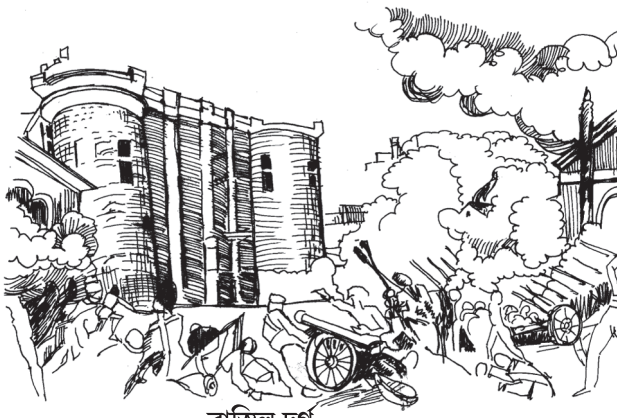
বাস্তিল দূর্গ

ভার সমান হল। বিনা বিচারে নাগরিককে বন্দী করার অধিকার বেআইন বলে ঘোষনা করা হল।

এই ঘটনার পরে ফ্রান্সে বহু সামন্ত ও ধর্ম যাজক রা দেশছেড়ে অন্য দেশে পালিয়ে গেলেন এবং সেই দেশের সরকারকে ফরাসী বিপ্লবের বিরোধে উস্কানি দিতে লাগলেন। ইংল্যান্ড, অষ্ট্রিয়াও প্রুশিয়া প্রভৃতি দেশ বোবোঁ শাষকদের সমর্থন জানালেন। অন্যদিকে ফরাসীরা বিপ্লব বিরোধীদের হত্যা করল এবং বিরোধী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করল। নেপোলিয়ান বোনাপাট নামে একজন সেনাপতি ফরাসী সেনাবাহিনীর নেতৃত্ত নিয়ে বিভিন্ন রনক্ষেত্রে শত্রুদের পরাস্ত করলেন। ১৭৯২ সেপ্টেম্বর ২০ তারিখে শত্রু সৈন্যরা পরাজিত হওয়ার পরে বিপ্লবীরা উক্ত দিনে এক জাতীয় কনভেনশন আহ্বান করল। এই কনভেনশন দিন থেকে রাজতন্ত্র লোপ হয়ে ফ্রান্স একটি সাধারনতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিনত হল বলে ঘোষনা করা হোলো। পূরাতন সংবিধানের বদলে সাধারনতন্ত্র ভিত্তিক নতুন সংবিধান প্রনয়ন করা হল। ফ্রান্সের রাজা রানী বিপ্লবীদের ভয়ে ছদ্মবেশে গভীর রাত্রে পালিয়ে যাওয়ার সময়ে বিপ্লবীদের হাতে ধরা পড়ে গেল। বিপ্লবীরা ১৭৯৩ সালে 'গিলোটিন' নামক যন্ত্রে রাজা ষোড়শ লুই ও রানী মেরীর মুন্ড ছেদ করেছিল।

ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবঃ

ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছিল। এটা রাজতন্ত্র শাসন ধ্বংস করে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠা

করেছিল। সমান্তবাদ লোপ করতে সহায়ক হয়েছিল। গীর্জাদের অধীনে থাকা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে মধ্যবিত্ত ও কৃষকদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছিল। ধর্মগত স্বাধীনতা প্রদান করা হয়ে ছিল। আধুনিক যুগে গণআন্দোলন পরম্পরা সৃষ্টি হল। এটা স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের বিরোধে বিপ্লব করতে প্রেরনা দিয়েছিল।

গিলোটিন্ যন্ত্র

জার্মানী একত্রীকরন

সপ্তদশ শতাবাদীর শেষ ভাগে জার্মানীতে খ্রীষ্ট ধর্ম বিভেদ নিয়ে গৃহযুদ্দ আরম্ভ হয়েছিল। ফলে জামার্নী রাষ্ট্র কয়েক গুলো ছোট চোট রাজ্যে পরিনত হয়ে ছিল নেপোলিয়ান এই রাজ্যগুলি অধিকার করে 'রাইন রাজ্য গোষ্ঠী' গঠন কর। এই রাইন রাজ্য গোষ্ঠী ভবিষ্যত জার্মানীর একত্রীকরনের সহায় হল। নেপোলিয়ানের পতন হবার পরে অষ্ট্রিয়ার ভিয়েনা জার্মানীদের জাতীয়তাবাদ কে বিলোপ করে জার্মানীকে পূর্বের জার্মান রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রুসিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা আরম্ভ হল।প্রুশিয়ার লোকেরা জাতিতে জার্মান ও সব ভাষী ছিল। অস্ট্রিয়া তে বিভিন্ন ভাষা ভাষীর লোক বাস করলেও এ শক্তিশালী সাম্রাজ্য হওয়ার জার্মানীর ওপর কতৃত্ব জারি করত।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রুসিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তিনি একজন সাহসী ও বাস্তব বাদী শাসক ছিলেন। কাকে কোন পদে রেখে কাজ হাসিল করা যাবে তা স্থির করতে তিনি সিদ্ধ হস্ত ছিলেন। তিনি প্রুসিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য সামরিক নীতি পরিবর্ত্তন করে কয়েকটি সংস্কার আনতে চাইছিলেন। তাঁর এই নীতিকে প্রুসিয়ার প্রতিনিধি সভা বা ডাত্রট বিরোধ করাতে সাংবিধানিক সঙ্কট দেখা দিল। এই রকম সংকট জনক মুহুর্তে রাজা প্রথম উইলিয়ামে একজল চতুর বিচক্ষন কূটনৈতিক অটোভান বিসমার্ক নামক ব্যক্তিকে তাঁর প্রধান মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা লেন। বিসমার্ক বুঝেছিলেন যে প্রুসিয়ার নেতৃত্ব জার্মান রাষ্ট্র গঠন করার উদ্যাম অস্ট্রিয় বিরোধ করবে। সেই ভাবে ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও জার্মানী একত্রীকরন প্রতিরোধ করবে। অতএব যুদ্ধ বিনা জার্মানী একত্রীকরন সম্ভব নয়। এই পরিস্থিতিতে বিসমার্ক উইলিয়ামের সামরিক সংস্কার প্রস্তাব কে দৃঢ় সমর্থন করেছিলেন। তার মতে সমস্যার সমাধান খালি ভাষন কিম্বা প্রস্তাবের মাধ্যমে সম্ভব নয়।

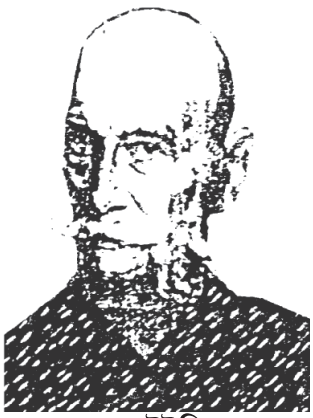
প্রথম উইলিয়ম

সেই জন্য প্রুসিযা তে একটি শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর দরকার হল। প্রুসিয়াতে সামরিক তালিম সহ সামরিক সেবায় অন্যূন তিন বছর কার্য্য করা, বাধ্যতা মূলক হল।

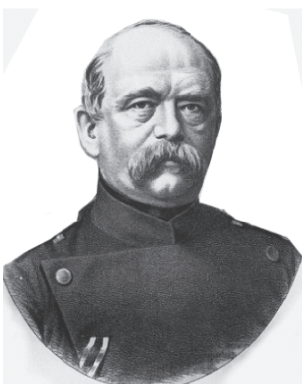
অটোভান্ বিস্মার্ক

বিসমার্ক সামরিক তালি সহ একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করলেন। ডেনমার্কের শাসনাধীনে থাকা স্লেজউইক ও হোলস্টেন নামক দুটি অঞ্চল পাওয়ার জন্য বিসমার্ক অস্ট্রিয়ার সাহায্য চাইলেন। অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার মিলিত সেনাবাহিনী ১৮৬৪ সালে ডেমমার্ক আক্রমন করল। ডেনমার্ক পরাস্ত হওয়ায় স্লেজ উইগ প্রুসিয়ার অধিকারে রইল।প্রুসিয়ার সঙ্গে একটি

তোমার জন্য কাজ

আমাদের দেশে সামরিক বাহিনীতে প্রবেশ করার জন্য কি প্রকার যোগ্যতা আবশ্যক তা জেনে নাও।

অঞ্চন মিশে যাওয়ার পরে প্রুসিয়ার অধীনে জার্মানী একত্রীকরনের আশা সঞ্চার হল।

এর পরে বিসমার্ক অষ্ট্রিয়া আক্রমন করার জন্যে ইউরোপের রাষ্ট্রদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করলেন। অধিকাংশ ইউরোপীয় রাষ্ট্র প্রুসিয়াকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিল। বিসমার্কের চেষ্টায় রাশিয়া ও ফ্রান্স যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষ থাকার জন্যে রাজি হয়ে গেল। ১৮৬৬ সালে জুন মাসে প্রুসিয়া অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করল। প্রুসিয়ার সৈন্যবাহিনী অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা পৌঁছে গেল অষ্ট্রিয়ার পরে বিসমার্ক ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করার লক্ষ রেখে ছিল। জার্মান অঞ্চল আলসেস ও লোরেন ফ্রান্সের অধীনে ছিল। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের আক্রমন করার পর থেকে ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে গেছিল প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে জুন মত প্রকাশ পেয়েছিল। ১৮৭০ সালের ১৫ই জুলাই ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ান প্রুসিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করলেন। ফ্রান্স আক্রমন করার আগেই প্রুসিয়া নিজের সুসংগঠিত বিশাল সেনাবাহিনীর দ্বারা ফ্রান্স আক্রমন করল। ১৮৭০ সালের ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার সেনাবাহিনী সেতান নামক স্থানে পরস্পর সম্মুখীন হল। একে সেদান যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্স পরাস্ত হল। প্রুসিয়ার সৈন্য বাহিনী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস অবরোধ করল। ফ্রান্স ও প্রুসিয়ার মধ্যে সন্ধি সাক্ষরিত হল। এব শর্ত অনুযায়ী অ্যালসেসে ও লোরেন অঞ্চল প্রুসিয়াকে হস্তান্তর করা হল। এই ভাবে প্রুসিয়াকে নেতৃত্ব দিয়ে বিসমার্ক জার্মান রাজগুলোকে একত্র করতে সক্ষম হলেন। জার্মানী একত্রীকরনের পরে বিসমার্ক জার্মান সাম্রাজ্যের চ্যানসেলার হলেন, বার্লিন এর রাজধানী হল।

তোমার জন্য কাজ

ইউরোপের মানচিত্র দেখে জার্মানীর লাগেয়া অন্য দেশ গুলির নামের তালিকা কর।

ইটালী একত্রীকরন

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিন ভাগে অবস্থিত ইটালী একটি উপদ্বীপ। এর উত্তরে আল্পস পর্ব্বত মালা আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইটালী তার রাজনৈতিক একতা হারিয়ে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেছিল। এই রাজ্য গুলি সর্বদা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকত। অষ্ট্রিয়া ও স্পেন তাদের ওপরে প্রধান্য বিস্তার করে রেখেছিল। একদা নেপোলিয়ান বোনার্পাট সমগ্র ইটালী কে অধিকার করে অস্ট্রিয়া ও স্পেনের প্রাধান্য থেকে মুক্ত করে ছিল। তিনি ইটালীকে ফ্রান্সের অধীনে করে দৃঢ় শাসন করার সাথে সাথে ইটালীর জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। নেপেলিয়ান বোনাপাটের পতন অন্তে ভিয়েনা কংগ্রেস দ্বারা ইটালী পুনঃ বিভাজিত হয়ে গেল। অস্ট্রিয়ার অধীনে উত্তর ইটালীর লোম্পাডি ও ভেনেসিয়া এবং কেন্দ্রীয় ইটালীর টাক্সানি পার্মা ও মনা রাজ্য রইল। দক্ষিণ ইটালীর মধ্য ভাগে থাকা রোম ও তার নিকটবতর্ত্তী অঞ্চল পোপের শাসনাধীন ছিল কেবল পিডমন্ট সার্ডিনিয়া ইটালীর রাজ বংশের শাসনাধীন ছিল।

এই রাজ বংশের রাজা প্রথম ভিক্টার ইমানুয়েল ইটালীর শাসক ছিলেন।

ইটালীর একত্রীকরনে পোপের অনিচ্ছার সঙ্গে অস্ট্রিয়াও ইটালীর জনগনের মধ্যে একতা ও জাতীয়তাবাদ সৃষ্টির প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করেছিল। এই সময়ে কয়েকজন উদার বাদী লেখক নিজের লেখার মাধ্যমে ইটালীয়দের মনে মুক্তি ও একতা ভাব সৃষ্টি করে ছিলেন। ইটালীতে একতা ও

জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করার জন্য ''কার্বোনারী '' নামে একটি বিপ্লবী সংগঠন সৃষ্টি হয়েছিল এই সংগঠন ইটালীর একত্রীকরনের জন্য বিদ্রোহ করেছিল। ইটালীয়দের মনে দেশেপ্রেম ভাব জাগ্রত করেছিল কিন্তু অস্ট্রিয়া এই বিদ্রোহ কে দমন করেদিল। ১৮৩০ সালে পার্মা ও মডেনা প্রভৃতি কেন্দ্রীয় ইটালী বাজ্যগুলোয় বিদ্রোহ আরম্ভ হল। অস্ট্রিয়া পুর্নবার দৃঢ় হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করল।

অস্ট্রিয়ার প্রভুত্ব লোপ করে ও ইটালী ভাষা ভাষী রাজ্যদের একত্র করে একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্টা করতে ইটালীয় জাতীয়তাবাদী দেশ প্রেমীদের নেতৃত্বে উদ্যাম শুরু হল। ইটালীর একত্রীকরন স্বপ্নকে সাকার করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনজন দেশপ্রেমী যথা মাজ্জিনী, কাভুর ও গ্যারিবালডি।

যোসেফ মাজ্জিনী ইটালীর জেনোয়ায় ১৮০৫ সালে জন্ম গ্রহন করেছিলেন। প্রথমে তিনি কার্বেনারী সংগঠনে যোগ দিয়ে ছিলেন। কিন্তু এদের হিংসাত্মক কার্য্যকলাপ দেখে অসন্তষ্ট হয়ে তিনি এক নতুন সংগঠনর প্রতিষ্ঠা করলেন। ১৮৩১ সালে তিনি তরুন ইটালী নামে এক সংগঠন গড়ে তার মাধ্যমে যুবক ইটালীয় দের মনে মুক্তি একতা ভাব সৃষ্টি করতে নির্দ্দেশ দিতেন। এই তরুন ইটালী দলের পতাকায় লেখা থাকত একতা ও মুক্তি। এই যুবকদের দ্বারা গনবিপ্লবের মাধ্যমে একতা প্রতিষ্ঠা করা তাঁর লক্ষ ছিল।

বানেক মাজ্জিনী

মাজ্জিনীর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা রোমে পোপের শাসন হাটিয়ে সেখানে সাধারন তন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাঁর তরুন ইটালী সংগঠন সিসিতে বিদ্রোহ করেছিল কিন্তু সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল। মাজ্জিনীর এই জাতীয়তাবাদী কার্য্যকলাপের জন্য তাকে ইটালী থেকে নির্বাসিত করা হয়েছিল। ইটালী একত্রীকরনে তিনি বিশেষ সফলতা না পেলেও লোকের মনে ঐক্য ভাব সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন।

জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইউরোপে গন বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। এর প্রভাব ইটালীর ওপরেও পড়ে ছিল। ইটালীর অনেক রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। সার্ডিনিয়ার রাজা চালর্স অ্যালবার্ট অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে বার বার যুদ্ধ করে পরাস্ত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন। তার পুত্র দ্বিতীয় ভিক্টার ইমানুয়েল সার্ডিনিয়ার রাজা হলেন। বিচক্ষন রাজনীতিতে কাউন্ট কাভুরকে তিনি তাঁর প্রধান মন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করে ছিলেন। প্রধান মন্ত্রী কাউন্ট কাভুর একজন মহান দেশভক্ত উদার পন্থী নেতা তথা দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। কোনো শক্তি শালী বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া ইটালীর একত্রীকরন সম্ভব নয় বলে তিনি বুঝেছিলেন।

পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে এটা সম্ভব হবে বলে তিনি বিস্বাস রেখেছিলেন। ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ১৮৫৮ সালে ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষনা করল। একে ক্রিমিয়া যুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে পিডমন্ট সাডিনিয়া যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড বিজয়ী হল। ক্রিমিয়া যুদ্ধের পর একটি শান্তি চুক্তি প্যারিসে সাক্ষরিত হয়েছিল।

ব্রাউন কাভুর

এই চুক্তিতে কাভুর যোগ দিয়ে সমগ্র ইউরোপকে ইটালীর একত্রীকরন সম্বন্ধে অবগত করালেন। অস্ট্রিয়ার বিরোধে নিজের মতামত উপস্থাপন করে তিনি ইউরোপীয়

রাষ্ট্রদের সমর্থন পেয়েছিলেন ক্রিমিয়া যুদ্ধে সার্ডিনিয়া ফ্রান্সকে সাহায্য করায় ইটালী একত্রীকরনের দিকে সার্ডিনিয়া কে সাহায্য করতে ফ্রান্স এগিয়ে এসেছিল। ১৮৫৯ সালে অস্ট্রিয়া আবার পিডমন্ট সার্ডিনিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করল। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের সহায়তায় পিডমন্ট সার্ডিনিয়া অস্ট্রিয়ার সেনাবাহিনীকে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত করল। লোম্বার্ডি, পার্মা, মডেনা, টুসকানী ও কেন্দ্রীয় ইটালীর রাজ্যগুলি সার্ডিনিয়া একটার পর একটা অধিকার করে নিজ রাজ্যের সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন।

দক্ষিণ ইটালীর নেপলস ও সিসিলিতে ইটালী একত্রীকরন ও মুক্তির জন্য জনজাগরন ও বিদ্রোহ দেখা দিল। মহান সংগ্রামী গ্যারিবলেডি এর নেতৃত্ব নিয়েছিলেন। মাজিনীর শিষ্য গ্যারিবালডি 'লাল কুর্ত্তা বাহিনী' নামে মুক্তি বাহিনী গঠন করে সিসিলি আক্রমন করলেন। এক সহস্র লাল কুর্ত্তা বাহিনীর দ্বারা গ্যারিবালডি সিসিলি অধিকার করলেন। তার পরে নেপলসে পৌছাঁলেন। তাঁর আক্রমনে নেপলসের রাজা রাজ্য ছেড়ে পলায়ন করল। অনায়াসে সমগ্র নেপলস অধিকার করতে গ্যারিবালডি সক্ষম হয়েছিল। সিসিলিও নেপলস্ অধিকার করার পরে গ্যারিবালডি রোম আক্রমন করার যোজনা কালীন ভিক্টর ইমানুয়েলের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল।

গারি বলিডি

গ্যারিবলডির অভূতপূর্ব ত্যাগ ও দেশভক্তির পরিচয় দিয়ে সিসিলি ও নেপলসের শাসনভার ভিক্টর ইমানুয়েল কে অর্পন করেছিলেন। তিনি উচ্চপদ ও পুরস্কার কে প্রত্যাখ্যান করে নিজের গ্রামে ফিরে গেলেন। তাই ইটালীর ইতিহাসে তিনি ত্যাগীপুত্র নামে খ্যাত হয়ে আছেন।

তুমি জান কি?

গ্যারিবলডি দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলকে সাক্ষাৎ করে বলেছিলেন আমি ইচটালীর যোগ্যতম রাজাকে অভিবাদন জানাচ্ছি এরপরে গ্যারিবলডি সিলি ও পেলসের শাসন ভার অর্পন করে কেবল একটি শয্য বীজের দালি নিয়ে নিজের কৃষি ক্ষেত্র কাপরেরী দ্বীপে ফিরে গেছিলেন।

১৮৬৬ সালে অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া যুদ্ধে ভিক্টর ইমানুয়েল প্রুসিয়াকে সমর্থন করেছিলেন। এই যুদ্ধ সেডওবা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। তাতে অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়েছিল এবং একটি চুক্তি সাক্ষর করেছিল। এই চুক্তি অনুযায়ী অষ্ট্রিয়া ইতালীকে ভেনিসিয়া প্রদান করেছিল।১৮৭০ সালে আবার অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়ার মধ্যে যুদ্ধ লাগল। এই যুদ্ধে ইমানুয়েল নিরপেক্ষ থাকার প্রতিশ্রুতি প্রুসিয়াকে দিয়েছিল। যুদ্ধে ফ্রান্স পরাস্ত হল। রোমে থাকা ফরাসী সৈন্যদের অপসারিত করতে ফ্রান্সকে বাধ্য করা হল। এই সুযোগে ভিক্টর ইমানুয়েল রোম অধিকার করে নিলেন। রোম ইটালীর রাজধানী হলো। এই ভাবে ইটালীর একত্রীকরন হওয়ার উদ্যাম সফল হল।

তোমার জন্য কাজ

ইউরোপের মানচিত্র দেখে ইটালীর চার দিকে কি রয়েছে তা লেখ।

আমরা কি শিখলাম ?

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার প্রভাব ।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব ও তার ফলাফল।

ইটালী এবং জার্মানীর একত্রীকরন।

রুষো ভলতেয়ার, মন্টেস্কু প্রভৃতি দার্শনিকদের আদর্শ চিন্তাধারা।

প্রশ্নাবলী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ৭৫ টি শব্দে লেখ।

ক) আমেরিকার উপনিবেশ গুলির শাসন প্রনালী কি প্রকার ছিল ?

খ) ষ্ট্যাম্প আইন বললে কি বোঝ ? এই আইনকে উপনিবেশবাসীরা বিরোধ করলে এর বিকল্প ব্যবস্থা কি হয়েছিল।

গ) ফ্রান্সের সামাজির বিভাজনের ওপর ধারনা দাও।

ঘ) ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লব কি ভাবে সমগ্র পৃথিবীকে প্রভাবিত করেছিল ?

ঙ) জার্মানীর একত্রীকারনের জন্য বিসমার্কের ভূমিকা কি ছিল ?

চ) ইটালীর একত্রী কারনের জন্য কাউন্ট কাভুরের উদ্যাম বর্ণনা কর।

ছ) গ্যারিবলট্রিকে ইটালীর ত্যাগীপুত্র কেন বলা হয় ?

জ) মাজ্জিনী কে ? তিনি ইটালীর একত্রীকরনের জন্য কিভাবে উদ্যাম করেছিলেন ?

২। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্র প্রায় ২০ টি শব্দের মধ্যে লেখ।

ক) কিসের জন্য ইংল্যান্ডের পিল গ্রীম ফাদাররা আমেরিকার প্রতি প্রলোভিত হলেন ?

খ) কি উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট স্ট্যাম্প আইন প্রনয়ন করেছিল ?

গ) ফরাসী সমাজে কাদের সুবিধা বঞ্চিত শ্রেনী বলা হত ? তারা কোন কোন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতেন ?

ঘ) ''স্পিরিট অফ দি লজ'' পুস্তক কে লিখেছিলেন। ? এই পুস্তকে কি বিষয়ের উল্লেখ আছে।

ঙ) ফ্রান্সের বিপ্লবীরা কবে বাস্তিল দুর্গ আক্রমন করেছিল ?

চ) প্রুসিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম এর কোন পদক্ষেপকে প্রতিনিধি সভা বিরোধ করেছিল ? একে ভিত্তি করে কি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল ?

ছ) বিসর্মাক কি ভাবে স্লেজউইগ ও হোল স্টেন অধিকার করেছিল।

জ) চালর্স অ্যালর্বাট কোন রাজ্যের শাসক ছিলেন। কোন ঘটনায় তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেছিলেন।

'লাল কুর্ত্তা বাহিনী' কে গঠন করেছিলেন ? এই বাহিনী কোন অঞ্চল অধিকার করেছিলেন।

৩। বন্ধনীর ভেতর থেকে সঠিক উত্তর বেছে শূন্যস্থান পূরণ কর।

ক) খ্রীষ্টাব্দ ১৬২০ তে ইংল্যান্ডের রাজা ..... ছিলেন।

(প্রথম এলিজাবেথ, প্রথম জেমস, ভিক্টোরিয়া, উইলিয়াম)

খ) আমেরিকার উপনিবেশ গুলোয় ইংরেজরা .....দ্রব্যের ওপর আমদানী কর বসিয়েছিল।

(তুলো, তামাক, চা, রং)

গ) 'আমি হচ্ছি রাষ্ট্র' । এটি .....র উক্তি ছিল।

(ত্রয়োদশ লুই, চতুর্দশ লুই, পঞ্চদশ লুই, ষোড়শ লুই)

ঘ) 'সোসিয়াল কন্ট্রাক্ট ..... লিখেছিলেন।

(মন্টেস্ক্যু, ভলতেয়ার, নেপোলিয়ান ;, রুষো)

ঙ) প্রথম উইলিয়াম .....রাজা ছিলেন।

(অষ্ট্রিয়া, প্রুসিয়া, মর্জেনা, হোলস্টেন)

চ) ওয়াটারলু যুদ্ধে ..... পরাস্ত হয়েছিলেন।

(নেপোলিয়ান, লর্ড কর্নওয়ালিস, দ্বিতীয় জেমস, ষোড়শ লুই)

ছ) ক্রিমিয়া যুদ্ধ .....সালে হয়েছিল।

(১৮৫১, ১৮৫৪, ১৮৫৯, ১৮২৩)

জ) 'তরুন ইটালী' সংগঠন .....গঠন করেছিলেন।

(মার্জ্জিনী, কাভুর, গ্যারিবলডি, ইমানুয়েল)

৪। রেখাঙ্কিত শব্দগুলি পরিবর্ত্তন না করে ভ্রুম সংশোধন কর।

ক) **স্ট্যাম্প আইন** আমেরিকার পার্লামেন্টে প্রনয়ন করা হয়েছিল।

খ) ১৮৬৫ সালে **সাডোওবাযুদ্ধ প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে হয়েছিল।**

গ) কার্বেনারী নামক সংগঠন **ইটালীর বিচ্ছিনতা এনেছিল।**

ঘ) **দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের প্রধান মন্ত্রী** মজ্জিনী ছিলেন।

ঙ) **১৮৬১ সালে প্রুসিয়ার রাজা রুপে** বিসমার্ক অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

৫। ‘ক’ স্তম্ভের শব্দের শঙ্গে ‘খ’ স্তম্ভের সম্পৃক্ত শব্দের মিলন কর।

‘ক’ স্তম্ভ	‘খ’ স্তম্ভ
তামাক পাতা	দলিল বেচাকেনা
স্ট্যাম্প আইন	স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও সামাজিক বৈষম্য বিরোধ
উচ্চশ্রেনীর লোক	ফ্রান্সের পরাজয়
স্পিরিট অফ দি লজ	আমেরিকার উর্ব্বর মৃত্তিকা
সেভান যুদ্ধ	ধর্মযাজক ও সম্ভ্রান্ত

রাজনীতি বিজ্ঞান

N
আমাদের ভারত
রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল
আফগানিস্থান
শ্রীনগর
জম্মু কাশ্মীর
জম্মু
হিমাচল প্রদেশ
পাকিস্থান
চীন
(তিব্বত)
সিমলা
চন্ডীগড়
দেরাদুন
পাঞ্জাব
উত্তরাখন্ড
হরিয়ানা
দিল্লী
সিকিম
অরুনাচন প্রদেশ
নেপাল
ইটানগর
জয়পুর
উত্তর প্রদেশ
গ্যাংটক
ভুটান
নাগাল্যান্ড
দিসপুর
আসাম
কোহিমা
রাজস্থান
লক্ষ্মৌ
সিলং
মেঘালয়
বিহার
ইম্ফল
পাটনা
বাংলাদেশ
মনিপুর
আগরতলা
আইজল
গান্ধীনগর
ঝাড়খন্ড
ভোপাল
পশ্চিম বঙ্গ
ত্রিপুরা
মিজোরাম
রাচী
গুজরাট
মধ্য প্রদেশ
কোলকাতা
ছত্রিসগড়
মিয়াংমার
দাদন দিউ
রাইপুর
ওড়িশা
দাদর ও নগর হাবেলি
সিলভাসা
ভুবনেশ্বর
মুম্বই
মহারাষ্ট্র
তেলেঙ্গানা
বঙ্গোপসাগর
আরব সাগর
হায়দ্রাবাদ
গানম (পুদুচেরী)
পানাজী গোয়া
কর্ণাটক
আন্ধ্রাপ্রদেশ
সংকেত
আন্তর্জাতিক সীমারেখা
রাজ্য সীমারেখা
রাজধানী (দেশের)
রাজ্য রাজধানী
ব্যাঙ্গালুরু
মাহে (পুদুচেরী)
পুদুচেরী
পোর্ট ব্লেয়ার
লাক্ষাদীপ
কাভাত্তী
কেরল
কড়াইকাল (পুদুচেরী)
আন্দামান ও নিকোবর
থরুঅনন্তপুরম
ভারত
শ্রীলঙ্কা
মহাসাগর

সপ্তম অধ্যায়

কেন্দ্র সরকার
কেন্দ্র কার্য্য পালিকা

MS3SD7

ভারত একটি সংঘীযরাষ্ট্র, কিন্তু সংবিধানে Union State হয়েছে। এখানে দ্বৈত্য শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। ভারতে ২৯টি রাজ্য ৭টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রয়েছে। এতে উভয় কেন্দ্র ও রাজ্য স্তরে একটা করে সরকার আছে। প্রত্যেক সরকারের তিনটি করে অঙ্গ রয়েছে। যথা ঃ কার্য্য পালিকা, ব্যবস্থাপিকা এবং ন্যায় পালিকা। কেন্দ্র স্তরের কার্য্য পালিকা ভারতের রাষ্ট্র পতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, এবং মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্র পতি হচ্ছেন কেন্দ্র স্তরীয় কার্য্য পালিকার নাম মাত্র মুখ্য। তিনি হচ্ছেন সমগ্র দেশের ঐক্যের প্রতীক।

তোমার জন্য কাজঃ

কলাম্বসের আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের পেছনে থাকা করেন জানতে চেষ্টা কর।

রাষ্ট্রপতিঃ

রাষ্ট্রপতি পরোক্ষভাবে নির্বাচিত দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক রাষ্ট্রমুখ্য ও সম্মানস্পদ প্রথম নাগরিক। তিনি দিল্লী স্থিত রাষ্ট্রপতি ভবনে অবস্থান করেন।

রাষ্ট্রপতি ভবন

তুমি জানো কি?

ভারতীয় সংঘীয় ব্যবস্থায় তেলেঙ্গানা হচ্ছে ২৯ তম রাজ্য।

ভারত একটি রাজ্যদের সমষ্ঠি রুপে বর্ণিত সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্র সরকারের সমস্ত কার্য্য পালিকা ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত। কিন্তু রাষ্ট্রপতি স্ব-ইচ্ছায় কোনো ক্ষমতা ব্যবহার করেন না।

প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীমন্ডলের পরামর্শ অনুসারে তিনি সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করে থাকনে। রাষ্ট্র পতি হচ্ছেন নামে মাত্র কার্য্য পালিকা ও প্রধান মন্ত্রী এবং মন্ত্রীমন্ডল বা মন্ত্রী পরিষদ হচ্ছে ''বাস্তব কার্য্য পালিকা''।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ঃ

ভারতের রাষ্ট্রপতি জনগনের দ্বারা পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সংসদের উভয় সদন এবং দিল্লী ও পন্ডিচেরী সমেত সমস্ত রাজ্য বিধান সভায় নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত নির্বাচন মন্ডলী রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচিত করেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয় লাভ করতে হলে প্রার্থীকে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভোট (কোটা) বা নির্বাচনে প্রাপ্ত হওয়া সমস্ত সিদ্ধমতের অন্যুন ৫০ শতাংশ থেকে একটি অধিক সমর্থন পাওয়া আবশ্যক।

প্রতি পাঁচ পছরে একবার বা প্রয়োজনে পাঁচ বছর সময় পূর্ণ হওয়ার পূর্বে ও নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য যোগ্যতাঃ

১। তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হবেন।

২। তাঁর অন্যুন ৩৫ বছর বয়স হয়ে থাকবে।

৩। তিনি লোকসভার সভ্য ভাবে নির্বাচিত হওয়ার জন্য যোগ্য হয়ে থাকবেন।

৪। একজন ব্যাক্তি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। যদি তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনস্ত কোনো সংস্থায় বা অনুষ্ঠানে লাভ জনক পদে অধিষ্ঠিত থাকেন।

রাষ্ট্রপতির কার্য্য কাল ঃ

রাষ্ট্রপতির কার্য্যকাল হচ্ছে পাঁচ বছর। একজন রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে সেই পদের জন্য পূনঃ প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারে। রাজেন্দ্র প্রসাদ ব্যাতীত বর্ত্তমান পর্য্যন্ত কোনো রাষ্ট্রপতি পুনঃ নির্বাচিত হননি।

রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে পাঁচ বছর কার্য্যকাল পূর্ন হবার আগে তিনি উপরাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে নিজের দ্বারা লিখিত ইস্তফা পত্রের মাধ্যমে নিজের পদ থেকে অব্যাহতি নিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির নির্দ্ধারিত কার্য্যকাল সম্পূর্ণ হবার আগে তিনি যদি ইস্তফা প্রদান করে পদ ত্যাগ করেন বা যদি তাঁর মৃত্যু হয়, বা তিনি যদি মহা অভিযোগ দ্বারা পদচ্যুত হন, তা হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য থাকে এবং উপরাষ্ট্রপতি ৬ মাস অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি রূপে কার্য্য নির্বাহ করতে থাকেন। এই ৬ মাসে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। সেই সময়ে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিপদের বেতন, ভাতা, সমস্ত সুযোগ সুবিধা উপভোগ করেন।

রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি বা মহাভিযোগ ব্যবস্থা ঃ

রাষ্ট্রপতি কেবল সংবিধান ভঙ্গ অভিযোগ অভিযুক্ত হয়ে মহাভিযোগ প্রস্তাব দ্বারা পদচ্যুত হন। এর ব্যাতীত অন্য কোনো কারনে বা অন্য কোনো উপায়ে তাঁকে পদচ্যুত করা যেতে পারা যাবে না। 'মহাভিযোগ' একটি অর্দ্ধ ন্যায়িক জটিল প্রক্রিয়া। প্রথমে সংসদের যে কোনো গৃহের সর্বমোট সভ্য সংখ্যার একচতুর্থাংশ সভ্য ১৪ দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ দিয়ে সেই সদনে মহাভিযোগ প্রস্তাব এনে থাকেন। এরপরে প্রস্তা বটি সেই সদনের সর্বমোট সভ্য সংখ্যার অন্যুন দুই তৃতীয়াংশ সভ্যদের দ্বারা অনুমোদিত হওয়ার পরে সেটা অন্য গৃহে অভিযোগ অনুসন্ধান (Investigation) করার জন্য পাঠানো হয়। উক্ত সদন মহাভিযোগ অনুসন্ধান কালে রাষ্ট্রপতি চাইনে নিজে বা তব প্রতিনিধি সেথায় উপস্থিত থেকে নিজের পক্ষ রাখতে পারবেন। অনুসন্ধানের পরে এই সদন যদি সর্বমোট সভ্য সংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থনে প্রেরিত মহাভিযোগ প্রস্তাব কে অনুমোদন করেন, তাহলে সেদিন থেকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হন। আজ পর্য্যন্ত ভারতে কোনো রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে মহাভিযোগ প্রস্তাব আগত করা হয়নি।

রাষ্ট্রপতির শপথ পাঠ ঃ

নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে সংবিধান মেনে চলতে ও সংবিধানের সুরক্ষার জন্য ঈশ্বরের নামে বা দৃঢ় সংকল্প করে ভারতের প্রধান বিচার পতির উপস্থিতিতে শপথ পাঠ করে নিজের দায়িত্ব গ্রহন করে থাকেন।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ঃ

আমাদের সংবিধান কেন্দ্র সরকারের সমস্ত কার্য্য পালিকা ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত করেছে। রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন কেন্দ্রের মূখ্য কার্য্য পালিকা। কিন্তু তিনি বাস্তবে শাসন মুখ্য নন; তিনি কেবল সাংবিধানিক মুখ্য।

রাষ্ট্রপতি তাঁর সমস্ত ক্ষমতা কেবল প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীমন্ডলের পরামর্শ ক্রমে জাহির করে থাকেন। রাষ্ট্রপতির রাজ্য পালের মত সেচ্ছাধীন ক্ষমতা নেই।

রাষ্ট্রপতির কার্য্য পালিকা ক্ষমতা কেবল নীতি নির্দ্ধারন ও ব্যবস্থাপিকা দ্বারা আইনের সফল রূপায়নে সীমিত নয়। এটি অতি ব্যাপক। বাবস্থাপিকা ও ন্যায় পালিকার কাছে ন্যস্ত ক্ষমতা ব্যাতীত অন্য সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কার্য্য পালিকা ক্ষমতার অন্তর্ভূক্ত।

রাষ্ট্রপতির সংবিধান স্বীকৃত বিভিন্ন ক্ষমতা গুলি নিম্নোক্ত প্রকারে শ্রেনীভুক্ত করা হয়েছে।

১। প্রশানিক ক্ষমতা ঃ

ভারতের রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র পালিকার বাস্তব মুখ্য না হওযার জন্য তিনি নিজে প্রত্যক্ষ ভাবে কোনো প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। মন্ত্রীগন বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের মুখ্য ভাবে দায়িত্ব বহন করেন ও প্রশাসনিক কার্য্য তদারক করেন। কিন্তু কেন্দ্র সরকারের সমস্ত প্রশাসনিক কার্য্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হয়। কেন্দ্র সরকারের সমস্ত

প্রসাসনিক অধিকারী বস্তুতঃ রাষ্ট্রপতির অধস্তন পদাধিকারী ভাবে কার্য্য করে থাকেন।

রাষ্ট্রের বহু পদস্ত অধিকারী এবং সাম্বিধানিক পদাধিকারী দের নিয়োগ এবং বহিষ্কার রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত সাংবিধানিক পদাধিকারীদের নিযুক্তি দিয়ে থাকেন। তারা হলেন ঃ ১) প্রধান মন্ত্রী ২) মন্ত্রী মন্ডলের অন্য সদস্যবৃন্দ ৩) মহাধিবক্তা ৪) মুখ্য আয় ব্যায় হিসাব রক্ষক ও মহা সমীক্ষক ৫) সব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়ধীশ ও অন্যান্য ন্যায়াধীশ বৃন্দ ৬) রাজ্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য ন্যায়ধীশ বৃন্দ ৭) রাজ্যপাল ৮) কেন্দ্র লোকসেবা (জনসেবা) আযোগের অধ্যক্ষ ্য সদস্য বৃন্দ ৯) অর্থ আয়োগর অধ্যক্ষ ও সদস্য বৃন্দ ১০) নির্বাচন আয়োগের মুখ্য আযুক্ত ও আয়ুক্তদ্বয়। ১১) সরকারী ভাষা আয়োগের অধ্যক্ষ ও সদস্য বৃন্দ ১২) অনুসূচীত জাতি। জনজাতি, পিছিয়ে পড়া বর্গ ও সংখ্যা লঘু আয়োগের অধ্যক্ষ ও সদস্যবৃন্দ। এই নিযুক্তিদের মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র মন্ত্রীমন্ডল ব্যাতীত অন্যদের পরামর্শ গ্রহন করে থাকেন। যথা ঃ সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ন্যায়াধীশ গনের নিয়োগের ক্ষেত্রে উক্ত ন্যায়ালয়ের মুখ্য বিচার পতি ও অন্য বিচার পতি দের পরামর্শ গ্রহন করে থাকেন।

প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রপরিষদের অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্তি ঃ

প্রধান মন্ত্রীর নিয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি আবশ্যক স্থলে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নির্বাহ করে থাকেন। নির্বাচনের পরে লোক সভায় যে কোনো রাজনৈতিক দল বা কয়েকটি দল মিলিত ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করলে রাষ্ট্রপতি সেই দল বা সেই জোট বাধাঁ দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রী ভাবে নিয়োগকরে থাকেন। কিন্তু যখন ঝোলা সংসদ হয়, অথ্যাৎ কোনো একটি রাজনৈতিক দল আবশ্যকীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা হাসিল করতে পারে না তখন কয়েকটি দল মিশে সরকার গঠন করতে প্রয়াস করে ও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্তি নিজের সপক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা দাবী করে রাষ্ট্রপতির কাছে প্রধান মন্ত্রী রুপে নিজের দাবী উপস্থাপন করে। এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী চয়নে নির্ণায়ক ভূমিকা গ্রহন করে থাকেন। এই রকম ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি তার বুদ্ধি। বিবেক, নিরপেক্ষ বিচার শক্তি এবং রাজনৈতিক নৈপুন্য, অভিজ্ঞতা ও দূরদৃষ্টি প্রয়োগ করে যে ব্যক্তি একটি সুদৃঢ় এবং স্থায়ী সরকার গঠন করতে পারবে বলে তাঁর বিশ্বাস হয়, তাকে প্রধান মন্ত্রী ভাবে নিযুক্তি দিয়ে নির্দ্ধারিত সময় সীমার মধ্যে লোক সভায় নিজের সরকারের সপক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমান করতে নির্দেশ দিয়ে থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে লোক সভার মর্জি অনুসারে মন্ত্রী পরিষদ শাসনের দায়িত্বে থাকেন। প্রধান মন্ত্রীর নিযুক্তির পরে তাঁর পরামর্শে রাষ্ট্র পতি মন্ত্রীপরিষদের অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্তি প্রদান করেন ও সবাইকে পদ ও গোপনীয়তার শপথ পাঠ করান। সংসদে প্রধান মন্ত্রী সংখ্যা গরিষ্ঠ তা হারালে তিনি ইস্তফা প্রদান করতে বাধ্য। যদি প্রধান মন্ত্রী নিজে থেকে ইস্তফা না দেয় তাহলে রাষ্ট্রপতি তাকে বরখাস্ত করতে পারবেন।

সাংবিধানিক পদ্ধতি অব লম্বন পূর্বক রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত পদাধিকারী দের বহিষ্কার করে থাকেন যথা ঃ মহাধিবক্তা খ)রাজ্যপাল গ) কেন্দ্র লোকসেবা আয়োগের অধ্যক্ষ ও অন্য সদস্য ঘ) সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় ও রাজ্য উচ্চ ন্যয়ালয়ের মুখ্য বিচার পতি ও অন্য বিচার পতি বৃন্দ ঙ) প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে কেন্দ্র মন্ত্রী মন্ডলের যে কোনো মন্ত্রী।

২। সামরিক ক্ষমতা ঃ

আমাদের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্ব্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষ। তিনি জল স্থল এবং আকাশ বাহিনীর মুখ্য সেনা ধ্যক্ষ দের নিযুক্তি দিয়েথাকেন।

তাঁর নামে যুদ্ধ ঘোষনা ও শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। মাত্র রাষ্ট্রপতির এই সম্পর্কিত সমস্ত ক্ষমতা সংসদের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

৩। কূট নৈতিক ক্ষমতা ঃ

রাষ্ট্রপতির কূটনৈতিক ক্ষমতা রাষ্ট্রের বৈদেশিক ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিদেশে আমাদের দেশ এবং আমাদের দেশের নাগরিকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকার জন্যে বিভিন্ন কূটনৈতিক প্রতি নিধি যথা ঃ রাষ্ট্র দূত এবং উচ্চ আয়ুক্ত বা হাই কমিশনার দের তিনি বিভিন্ন দেশে নিযুক্তি দিয়ে থাকেন। অন্যদেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা প্রথমে রাষ্ট্রপতিকে সাক্ষাৎ করে তাদের পরিচয় পত্র প্রদান করে থাকেন। রাষ্ট্রপতি অনেক সময় বিদেশী রাষ্ট্র গমন করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে উত্তম কূটনৈতিক সম্পর্ক করে থাকনে ও বৈদেশিক সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের অভিমুখ্য কি তার সূচনা দেন।

৪। ব্যাবস্থাপিকা ক্ষমতা ঃ

রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন কেন্দ্র সংসদের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভা এবং লোকসভাকে নিযে কেন্দ্র সংসদ গঠিত। রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় গৃহের অধিবেশন ডেকে থাকেন এবং উভয় গৃহের অধিবেশন কে আগামী অধিবেশন আহ্বান করা পর্য্যন্ত 'প্রোরোগ' রাখতে পারেন। তিনি লোক সভাকে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে ভঙ্গ ও করতে পারেন। কোনো সাধারণ বিলের ওপর উভয় গৃহের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে, রাষ্ট্রপতি সংসদের মিলিত অধিবেশন ডেকে বা আহ্বান করে সমাধান করে থাকেন। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পরে এবং প্রত্যেকবছরের প্রারম্ভে অনুষ্ঠিত প্রথম অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় গৃহকে অভিভাষন প্রদান করে থাকেন ও সংসদের অধিবেশন আহ্বান হওয়ার কারন জানান। রাষ্ট্রপতি তাঁর এই অভিভাষনে সরকারের বিভিন্ন নীতি এবং আগামী দিনে সরকারের বিশেষ কার্য্য ক্রমের বিষয়ে উল্লেখ করে থাকনে। এতদব্যাতীত রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় গৃহকে জাতীয় সাংবিধানিক বা সর্ব সাধারনের স্বার্থ সম্বলিত গুরুত্ব পূর্ণ বিষয়ে ''বার্ত্তা'' দিয়ে থাকনে।

রাষ্ট্রপতির সম্মতি বিনা কোনো চিঠা আইন বা বিল এক

তোমার জন্য কাজঃ

রাষ্ট্রপতির অভিভাষন দূর দর্শনে দেখে বা খবরের কাগজে পড়ে তার সারাংশ লিখে রাখ।

পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিনত হতে পারে না। সংসদের উভয় গৃহে যথারীতি গৃহীত হওয়ার পরে একটি চিঠা আইন (বিল) রাষ্ট্রপতির সম্মত্তির জন্য তাঁরর কাছে প্রেরিত হয়। তখন রাষ্ট্রপতি নিম্নোক্ত বিকল্পের মধ্যে যে কোনো একটি বিকল্প অবলম্বন করে থাকেন।

১) তিনি চিঠা আইন (বিল) টি কে সম্মতি প্রদান করতে পারেন। তাঁর সম্মত্তি পাবার পরে চিঠা আইনটি পূর্ণাঙ্গ আইনের মান্যতা পায়।

২) অর্থ সম্বন্ধীয় চিঠা আইন বা অর্থ বিল ব্যাতীত অন্য সাধারন বিল এর ক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিলটি কে (নিজের বার্তা সহ) সংসদের উভয় গৃহে পূর্ণবিচারের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে থাকেন।

৩) এই পরিস্থিতিতে যদি চিঠা আইনটি সংসদের উভয় গৃহে কোনো সংশোধন হয়ে বা বিনা সংশোধনে পূণর্বার গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য তাঁর নিকটে পাঠানো হয়, । তবে তিনি একে সম্মত্তি দিতে বাধ্য হয়ে থাকেন।

কোনো অর্থ বিল রাষ্ট্রপতি পূণর্বিচার নিমন্তে প্রেরন করেন না, কারন অর্থ বিল লোক সভায় আগত হওয়ার পূর্বেই রাষ্ট্রপতির প্রাক অনুমতি নেওয়া হয়ে থাকে। অতএব রাষ্ট্রপতি অর্থবিলকে সম্মতি দিতে বাধ্য।

সেই ভাবে কতকগুলি বিল যথা কোনো নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠা বা রাজ্যের পরিসীমা পরিবর্তন, কোনো রাজ্যের নাম পরিবর্ত্তন বা মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত বিল সংসদে আগত হবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির অনুমতি আবশ্যক হয়ে থাকে। সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত বিলকে রাষ্ট্রপতি সম্মতি দিতে বাধ্য।

সংসদের অধিবেশন না চলাকালীন যদি কোনো জরুরী

পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে হঠাৎ আইন প্রনয়ন করতে হয়, তাহলে মন্ত্রীমন্ডলের পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করে থাকেন। এটি একটি অস্থায়ী আইন। একে জরুরী কালীন আইন বা কার্য্য পালিকা আইন বলেও বলা হয়। কিন্তু সংসদ পরবর্ত্তী অধিবেশনে মিলিত হবার ৬ সপ্তাহের মধ্যে অধ্যাদেশ টি সংসদে গৃহীত না হলে অকৃতকার্য্য হয়ে যায়। ৩ সপ্তাহ সময় শেষ হওয়ার পূর্বে রাষ্ট্রপতি চাইলে অধ্যদেশকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন বা পুনরায় জারী করতে পারেন। ৬ সপ্তাহের মধ্যে অধ্যাদেশটি সংসদের অনুমোদন পেলে এটা একটি পূর্ণাঙ্গ বা স্থায়ী আইনের মান্যতা পায়। না হলে এটি অকামী হয়ে যায়।

কেন্দ্র সংসদ গঠনে রাষ্ট্রপতি সক্রিয় অংশ গ্রহন করে থাকেন। তাঁর যদি হৃদয়ঙ্গম হয় যে লোক সভায় অ্যাংলো ভারতীয় (Anglo-Indian) সম্প্রদায়ের উচিত প্রতিনিধিত্ব হয়নি তবে তিনি সেই সম্প্রদায়ের দুজন ব্যাক্তিকে লোক সভার সংসদ ভাবে মনোনীত করতে পারেন। সেই রকম কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজ সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করা ১২ জন ব্যাক্তিকে রাষ্ট্রপতি রাজ্য সভায় মনোনীত করে থাকেন।

রাষ্ট্রপতির ব্যবস্থা পিকা ক্ষমতা রাজ্য বিধান মন্ডলের দ্বারা গৃহীত চিঠা আইনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। রাজ্য পাল রাজ্য বিধান মন্ডল দ্বারা গৃহীত কিছু চিঠা আইন রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য সংরক্ষিত রেখে থাকেন।

৫। অর্থ সম্পর্কিত ক্ষমতা ঃ

সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে প্রত্যেক আর্থিক বর্ষের প্রারম্ভে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্র অর্থ মন্ত্রীর দ্বারা বার্ষিক দেশের আয় ব্যায় বা বাজেটকে সংসদে আগত করিয়ে থাকেন। কোনো অর্থবিল বা অর্থ চিঠা আইন রাষ্ট্রপতির প্রাক্ অনুমতি বিনা লোক সভায় আগত হতে পারবেন না। রাষ্ট্রপতি ভারতের মুখ্য হিসাব রক্ষক ও মহাসমীক্ষকের রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত করিয়ে থাকেন। এতদ ব্যাতীত দেশের আর্থিক দুর্দিনে রাষ্ট্রপতি আর্থিক জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করে থাকেন।

৬। ন্যায়িকা ক্ষমতা ঃ রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন ন্যায় এবং দয়ার আধার। মৃত্যু দন্ডাদেশ পাওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তিনি ক্ষমা করতে পারেন। এতদব্যাতীত অন্য অপরাধীদের দন্ডাদেশ পরিমান কম করতে পারেন, স্থগিত রাখতে পারেন। আবশ্যক স্থলে জন স্বার্থ সম্বলিত গুরুত্বপূর্ণ আইন গত প্রশ্ন ও সাংবিধানিক তর্জমার বিষয়ে রাষ্ট্র পতি সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের পরামর্শ নিতে পারেন। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের পরামর্শ নিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য নন।

রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ও উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচারপতি সমেত অন্য বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তিনি উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতিদের বদলির আদেশ দিয়ে থাকেন। সংসদনের অনুমোদনের পরে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় ও রাজ্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিরা রাষ্ট্রপতির আদেশ ক্রমে পদচ্যুত হয়ে যান।

৭. বিবিধ ক্ষমতা ঃ কেন্দ্র কার্য্য পালিকার মুখ্য ভাবে রাষ্টপতি কে বিবিধ প্রকারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। একে এক প্রকার অবশিষ্ট ক্ষমতা বললে অত্যুক্তি হবে না।

ক) কেন্দ্র লোকসেবা আয়োগের সভা সংখ্যা নির্দ্ধারণ, রাজ্যপালের কার্যবলী, সর্বোচ্চ ন্যায়লয়ের আদেশ কার্য্যকরী করার পদ্ধতি অনুসূচিত জাতি ও জন জাতির বিষয়ে রাষ্ট্রপতি আবশ্যকীয় নীতি নির্দ্ধারণ করে থাকেন।

খ) রাষ্ট্রপতি অর্থ আয়োগ, সরকারী ভাষা আয়োগ, অনুসূচীত অঞ্চলের বিকাশের অনুধ্যানে নিযুক্ত আয়োগ, আন্তঃ রাজ্য পরিষদ ইত্যাদি গঠন করে থাকেন।

গ। কেন্দ্রশাষিত অঞ্চলের জন্য রাষ্ট্রপতির কয়েকটি স্বতন্ত্র ক্ষমতা ও দায়িত্ব রয়েছে।

ঘ) অনুসূচীত জাতি ও জনজাতি এবং অনুসুচীত অঞ্চলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির সাধনে রাষ্ট্রপতি বিভিন্ন দায়িত্ব নির্বাহ করে থাকেন।

ঙ) দেশের অলংকারিক মুখ্য হিসেবে রাষ্ট্রপতি প্রতিবছর জানুয়ারী মাসের ২৬ তারিখে সাধারণ তন্ত্র দিবস উপলক্ষে দিল্লীতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে সামরিক ও বেসামরিক বাহিনীর প্যারেডে অভিবাদন গ্রহন করে থাকেন।

৮। জরুরী কালীন ক্ষমতা বা আপৎকালীন ক্ষমতা ঃ উপরোক্ত ক্ষমতা ব্যাতীত আপৎকালীন বা জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে রাষ্ট্রপতি কে স্বতন্ত্র ভাবে তিনটি ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা প্রদান করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে যে তিন প্রকার জরুরী কালীন পরিস্থিতির উল্লেখ রয়েছে। সেগুলি হল ঃ

ক) জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি ঃ যখন রাষ্ট্রপতির হৃদয়ঙ্গম হয় যে সমগ্র ভারত বা এর কোনো অঞ্চলের নিরাপত্তা যুদ্ধ, বাহ্য শত্রু আক্রমন, বা দেশের মধ্যে সংগঠিত সমস্ত বিদ্রোহের দ্বারা বিপন্ন হচ্ছে বা হবার আশঙ্কা আছে, তখন তিনি সমগ্রদেশে বা দেশের কিছু অঞ্চলে জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করতে পারবেন। কেন্দ্র মন্ত্রী মন্ডলের লিখিত সুপারিশ ক্রমেই কেবল রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করতে পারবেন। এই ঘোষনা নামাটি ঘোষনা হবার ১ মাসের মধ্যে সংসদে অমুমোদিত হওয়া আবশ্যক। সংসদের উভয় গৃহদ্বারা অন্যুন ২/৩ অংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট সমর্থনে একবার অনুমোদিত হলে জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা নামা ৬ মাস পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকে । এইভাবে যদি একেকবার করে প্রতি ৬ মাসে অনুমোদিত হয় তবে জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি অনির্দ্দিষ্ট কাল পর্য়ন্ত কার্য্য কারী থাকতে পারবে। জরুরী পরিস্থিতির প্রভাব সাধারনতঃ দুটি ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে অনুভুত হয়ে থাকে।

১) জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা হলে ভারতে প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থা ক্ষুন্য হয়ে থাকে। কেন্দ্র সরকারের ক্ষমতা সর্বব্যাপী হয়ে যায় যথা ঃ

ক) রাজ্য তালিকা ভুক্ত বিষয়ে রাজ্যদের জন্য সংসদ আইন প্রনয়ন করতে পারবেন।

খ) রাষ্ট্রপতি রাজ্য সরকারেদের তাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা ব্যবহারের সর্ম্পকে আবশ্যকীয় নির্দ্দেশ দেন। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রও

গ) রাজ্যের মধ্যে আর্থিক সর্ম্পকতে পরিবর্তন আনতে পারবেন ।

২। জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা হবার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের সংবিধানের ১৯ ধারায় প্রদত্ত ‘স্বাধীনতা অধিকার’ আপনা আপনি নিলম্বিত’ হয়ে যায়। এছাড়া রাষ্ট্রপতি একটি স্বতন্ত্র ঘোষনা নামা দ্বারা সংবিধানের ৩২ ধারায় প্রদত্ত ‘‘সংবিধানিক প্রতিকার অধিকার’’ বা ‘‘মৌলিক অধিকারের সুরক্ষা অধিকার’’ বাতিল করে দিতে পারেন, ফলে নাগরিকরা তাদের মৌলিক অধিকার গুলির সুরক্ষার জন্য ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হতে পারে না।

খ) কোনো রাজ্যে সংবিধানিক শাসন ব্যবস্থার বিফলতা বা অচলাবস্থা সম্পর্কিত জরুরী পরিস্থিতি (রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা) ঃ আমাদের সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। যদি কোনো সময়ে রাজ্যের রাজ্যপালের রিপোর্ট বা অন্য কোনো সুত্রে জানার পরে রাষ্ট্রপতির মনে হয় যে রাজ্যের শাসন ব্যাবস্থা সংবিধান স্বীকৃত পন্থায় পরিচালিত হতে পারছেনা ও সেখানে সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়েছে তা হলে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৩৬৫ ধারা অনুযায়ী উক্ত রাজ্য জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করতে পারবেনা , এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতিকে বা রাষ্ট্রপতি শাসন বলা হয়। যে রাজ্যে এই ধরনের জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করা হয়,

সেই রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা কেন্দ্র সরকার দ্বারা পরিচালিত হয়। এর ফলেঃ

১) সেই রাজ্যের বিধান সভা ভঙ্গ করে দেওয়া হয় বা নিলম্বিত করা হয়। উক্ত রাজ্যের জন্য সংসদ আইন প্রনয়ন করে। এমন কি উক্ত রাজ্যের বাজেট পর্য্যন্ত সংসদ দ্বারা গৃহীত হয়।

২) রাজ্যের মন্ত্রী মন্ডল কে বরখাস্ত করে দেওয়া হয়। রাজ্যের কার্য্য পালিকা ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি নিজের হাতে নিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধি ভাবে রাজ্যের রাজ্য পাল কার্য্য পালিকার বাস্তব মুখ্য ভাবে কার্য্য করেন। আবশ্যক স্থলে কেন্দ্র সরকার রাজ্য পালকে প্রশাসনিক সহায়তার জন্য পরামর্শ দাতা নিয়োগ করেন। এই প্রকার জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা নামা সংসদের উভয় গৃহে ২ মাসের মধ্যে অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। একবার অনুমোদিত হলে, এটা ৬ মাস পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকে এবং এই ভাবে সংসদে পুনঃ অমুমোদিত হয়ে সর্বাধিক ৩ বছর পর্য্যন্ত কার্য্যকারী থাকতে পারবে। এখানে সূচিত করা যেতে পারে যে রাষ্ট্রপতি এই ক্ষমতা সাবধানতার সহিত অত্যান্ত আবশ্যক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন ন্যায়ালয় যদি এই ঘোষনা নামা কে অসিদ্ধ ঘোষনা করে তবে পূর্বাবস্থা প্রশাসনিক স্থিতবস্থা বজায় থাকে।

গ) আর্থিক জরুরী পরিস্থিতি ঃ যখন রাষ্ট্রপতি হৃদয়ঙ্গম করেন যে ভারতের আর্থিক স্থিরতা বিপন্ন এবং আর্থিক পরিস্থিতি বিপর্য্যস্ত হয়েছে, তখন তিনি সংবিধানের ৩৬০ ধারার বলে আর্থিক জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করে থাকেন। এই সময়ে-

১। কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা পালন করতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন।

২। রাজ্য সরকারের অধিনে কার্য্যরত কর্মচারী দের বেতন হ্রাস করার নির্দ্দেশ রাষ্ট্রপতি দিয়ে থাকেন।

৩। রাজ্য সরকারের সমস্ত অর্থ বিধেয়ক রাষ্ট্রপতির অমুমোদনের জন্য সংরক্ষিত করা হয়ে থাকে।

৪। সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং উচ্চল্যায়ালয়ের বিচার পতিদের সমেত কেন্দ্র সরকারের সমস্ত কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করার নির্দ্দেশ রাষ্ট্রপতি দিয়ে থাকেন।

আর্থিক জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা নামা ২ মাসের মধ্যে সংসদে অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এখনও পর্য্যন্ত আমাদের দেশে এ ধরনের আর্থিক জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করা হয়নি।

রাষ্ট্রপতির ভূমিকা ও পদমর্য্যাদা ঃ

আমাদের দেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত। আমাদের প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীমন্ডলে হচ্ছেন বাস্তব কার্য্য পালিকা এবং রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন কেবল নামমাত্র কার্য্যপালিকা ও শাসন মুখ্য। সংবিধান তাঁর ওপরে কেন্দ্র সরকারের সমস্ত কার্য্য পালিকার ক্ষমতা ন্যাস্ত করেছে সত্যি মাত্র প্রধান মন্ত্রী ও

তোমার জন্য কাজঃ

সংবিধান কার্য্যকারী হওয়ার দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহন করে থাকা ব্যাক্তিদের নাম লেখ।

মন্ত্রীমন্ডলের পরামর্শ বিনা রাষ্ট্রপতি কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন না। তিনি জনগনের দ্বারা পরোক্ষ নির্বাচিত হন এবং তাঁর কার্য্য কালও নির্দিষ্ট, তিনি কেবল মহাভিযোগেই পদচ্যুত হতে পারবেন। কিন্তু আমাদের সংবিধান মাধ্যমে লোকেদের নিকটে প্রত্যেক ক্ষেত্রে উত্তরদায়ী থাকা প্রধান মন্ত্রী সমেত মন্ত্রী মন্ডল রাষ্ট্রপতি অপেক্ষা অধিক প্রভাব শালী ও ক্ষমতা শালী। অপরপক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংল্যান্ডের রানীর মত কেবল আলংকারিক রাষ্ট্র মুখ্য নন। আমাদের দেশে বহুদলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত থাকায় সম্প্রতি অধিকাংশ সময়ে ঝোলা সংসদ ও মিলিত মন্ত্রী মন্ডল ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতিকে অতি গুরুত্ব পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে হয়। স্বাভাবিক পরিস্থিতি তে রাষ্ট্রপতি ''প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীমন্ডলের বন্ধু, প্রোৎসাহক ও মার্গ দর্শক ভাবে কাজ করেন। তিনি দেশের ঐক্য ও

সংহতির প্রতীক। তিনি ভারতের নীতি ও আদর্শের বার্ত্তা বাহক। দেশের নিরাপত্তা প্রশাসনিক স্থিরতা, ও স্বচ্ছতা এবং সংবিধানের সুরক্ষা ইত্যাদির গুরু দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির ওপরে ন্যাস্ত। তিনি পরোক্ষ দেশবাসীর নিকটে উত্তরদায়ী, এতে কোনো দ্বিমত নেই।

উপরাষ্ট্রপতিঃ

আমাদের সংবিধান দ্বারা উপরাষ্ট্রপতি পদটি স্বীকৃত।

যোগ্যতাঃ

উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রার্থীর নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

১) তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকবেন।

২) তার অতিকম ৩৫ বছর বয়স হওয়া দরকার ।

৩) রাজ্য সভার সদস্য হওয়ার জন্য তাঁর সমস্ত যোগ্যতা থাকা দরকার।

৪) তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক পদে থাকবেন না।

৫) তিনি সংসদ বা রাজ্য বিধান মন্ডলের সদস্য হবেন না। যদি বা হন তাহলে উপরাষ্ট্রপতি ভাবে শপথ গ্রহন করার পূর্বে সেই পদ থেকে ইস্তফা প্রদান করবেন।

নির্বাচনঃ

উপরাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় গৃহের সমস্ত সভ্যকে নিয়ে গঠিত নির্বাচন মন্ডলীর দ্বারা আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব ও একক হস্তান্তরীয় গোপনীয় ভোট দান প্রনালীতে নির্বাচিত হন।

কার্য্যকালঃ

উপরাষ্ট্রপতির ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কার্য্যকাল সমাপ্ত হবার পূর্বেই তিনি ইস্তফা প্রদান করতে পারেন বা তাকে পদচ্যুত করা যেতে পারে। যখন রাজ্যে সভার সংখ্যা গরিষ্ঠ সভা উপরাষ্ট্রপতিকে বহিষ্কারের প্রস্তাব গ্রহন করবে এবং উক্ত প্রস্তাব লোক সভার সম্মতি লাভ করবে, তখন উপরাষ্ট্রপতি পদচ্যুত হবেন।

কার্য্যবলীঃ

উপরাষ্ট্রপতি হচ্ছেন একজন সাংবিধানিক পদাধিকারী। মাত্র সংবিধান তাঁর হাতে কোনো গুরুত্ব পূর্ণ ক্ষণতা বা দায়িত্ব ন্যাস্ত করেনি। তিনি মাত্র ২ টি সংবিধানিক কর্ত্তব্য সম্বোধন করেন।

১) যখন মৃত্যু, পদত্যাগ, পদচ্যুতি বা অন্য কোনো যথা নির্বাচন আসিত্তর কারনে রাষ্ট্রপতিরে পদ শুন্য থাকে, তখন উপরাষ্ট্রপতি সর্বাধিক ৬ মাস পর্য্যন্ত বা সেই সময়ের মধ্যে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়া পর্য্যন্ত অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ভাবে কার্য্য করেন। এই সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ সম্পৃক্ত সমস্ত সুবিধা সুযোগ উপভোগ করেন।

পুনশ্চ রাষ্ট্র পতি যদি অসুস্থতা বশতঃ বা অনুপস্থিত থাকা, হেতু বা অন্য কোনো কারনে তাঁর কার্য্য সম্পাদন করতে অসমর্থ হন, তা হলে উপরাষ্ট্রপতি, রাষ্ট্রপতির কার্য্য সেই সময়ে সম্পাদন করে থাকেন।

২) উপরাষ্ট্রপতি সাধারনত ঃ নিজের পদাধিকার ক্ষমতায় রাজ্যসভার অধ্যক্ষ ভাবে কার্য্য করেন। লোক সভার বাচস্পতি যে ভাবে কার্য্য করেন। তিনিও রাজ্য সভার অধিবেশন কার্য্য পরিচালনা করেন।

রাষ্ট্রপতির মত উপরাষ্ট্রপতিরও কয়েকটি আলঙ্কারিক কার্য্য সম্পাদন করে থাকেন। তিনি বিদেশ গমন করে সরকারের নীতি ও আদর্শকে উপস্থাপিত করে থাকেন। অনেক সময় বিভিন্ন সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক উৎসবে তিনি মূখ্য অতিথি ভাবে যোগদান করেন।

কেন্দ্র মন্ত্রী পরিষদঃ (Unior Council of Minister)

আমাদের দেশে সংসদীয় সরকার বা 'মন্ত্রীমন্ডলীর সরকার' প্রচলিত। কেন্দ্র সরকারের সমস্ত কার্যপালিকা ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা রাষ্ট্রপতির ওপর ন্যাস্ত হলেও বাস্তবে মন্ত্রীমন্ডল বা মন্ত্রী পরিষদ।

এই সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। সংবিধান এস ৭৪(১) ধারাতে উল্লেখ রয়েছে যে রাষ্ট্রপতির কার্য্য সম্পাদনে সহায়তায় করার জন্যে এবং তাঁকে পরিমর্শ

তোমার জন্য কাজঃ

অদ্যবধি উপরাষ্ট্রপতি ভাবে দায়িত্ব পালন করে থাকা ব্যাক্তিদের নামের তালিকা প্রস্তুত কর।

প্রদান করার জন্যে প্রধান মন্ত্রীর অধ্যক্ষতায় একটি মন্ত্রী পরিষদ থাকবে।

মন্ত্রী পরিষদ গঠনঃ

প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন কেন্দ্র মন্ত্রী পরিষদের মুখ্য। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পরে লোক সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন লাভ করা, একটি রাজনৈতিক দল বা একাধিক দলের মিলিত নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রী ভাবে নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্তি প্রদান করেন । মন্ত্রী পরিষদের সদস্য গন যে কোনো গৃহের সদস্য হয়ে থাকতে পারেন। যদি কোনো ব্যাক্তি সংসদের সভা না হয়ে মন্ত্রী ভাবে নিযুক্ত হন, তা হলে তাকে ৬ মাসের মধ্যে সংসদের যে কোনো গৃহের সভ্যভাবে নির্বাচিত হতে হবে। নচেৎ তিনি মন্ত্রীপদ হারাবেন। প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রীদের মধ্যে বিভাগ বন্টন, এবং আবশ্যক সময়ে বিভাগ অদল বদলও করে থাকেন, মন্ত্রীদের সংখ্যা ও মন্ত্রীপরিষদের আকার, ও স্বরূপ প্রধান মন্ত্রী স্থির করেন। তবে সাম্প্রতিক ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্র মন্ত্রী পরিষদের সভা সংখ্যা লোক সভার সভ্য সংখ্যার ১৫ শতাংশের অধিক হবে না। মন্ত্রী পরিষদের গঠনের সময় প্রধান মন্ত্রী দেশের বিভিন্ন রাজ্য অনুসূচিত জাতি ও জনজাতি তথা মহিলাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দিয়ে থাকেন সেই রকম মিলিত মন্ত্রীমন্ডল গঠনে জোট দলের সভ্য সংখ্যা তথা মন্ত্রীপদের গুরুত্ব ও পূর্ব অভিজ্ঞতাকে বিচারে নেওয়া হয়ে থাকে।

মন্ত্রী পরিষদের শ্রেনীবিভাগঃ

মন্ত্রী পরিষদে সাধারণতঃ চার প্রকারের মন্ত্রী থাকেন, যথা ঃ ক) ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রী খ) রাষ্ট্র মন্ত্রী (স্বাধীনদায়িত্ব) গ) রাষ্ট্রমন্ত্রী ঘ)উপমন্ত্রী।

ক্যাবিনেট মন্ত্রী স্তরে সাধারণত ঃ বয়স্ক, বরিষ্ট, অভিজ্ঞ

তোমার জন্য কাজঃ

কেন্দ্র মন্ত্রীপরিষদের মন্ত্রীদের নামের তালিকা প্রস্তুত কর এবং মন্ত্রীদের বিভাগ লেখ।

তথা প্রশাসনিক রাজনৈতিক অনুভুতি সম্পন্ন ব্যাক্তিদের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ গুলির দায়িত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। তাঁদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়ে থাকে। বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ সরকারী কার্য্য পরিচালনার জন্যে অধিকাংশ সময়ে এই ক্যাবিনেট বৈঠকে সমস্ত নীতি নির্দ্ধারণ করা হয়। ক্যাবিনেট বৈঠকে কেবল ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রীরা যোগ দেন এবং স্বাধীন ভাবে কার্য্য করতে থাকা রাষ্ট্রমন্ত্রীরা স্বতন্ত্র ভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেন।

রাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন দুশ্রেনীর। কয়েকজন রাষ্ট্রমন্ত্রী স্বাধীন ভাবে এক বা একাধিক বিভাগের দায়িত্বে থাকেন অন্য কিছু রাষ্ট্রমন্ত্রী গুরুত্ব পূর্ণ বিভাগে ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রীদের সাহায্য ও সহায়তা প্রদান করেন। উপমন্ত্রী গন ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রী এবং রাষ্ট্রমন্ত্রীদের সহায়তা করার জন্য নিযুক্তি পেযে থাকেন।

ওই তিন শ্রেনীর মন্ত্রীগণ ব্যাতীত 'সংসদীয় সচিব' গণ ও আবশ্যক স্থলে নিযুক্ত হন। এই সংসদীয় সচিব গন প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা নিযুক্ত হয়ে থাকে।

মন্ত্রী পরিষদের কার্য্যকাল ও উত্তরদায়িত্বঃ

আমাদের সংবিধান অনুসারে কেন্দ্র মন্তী পরিষদ সংসদের নিম্ন সদন বা লোকসভার নিকটে ব্যাক্তি গত ও সামুহিক ভাবে উত্তর দায়ী।

'সামুহিক উত্তরদায়িত্ব' কথার অর্থ যে, কোনো মন্ত্রীর দোষ ত্রুটির জন্য সমগ্র মন্ত্রীর পরিষদ জবাব দিতে বাধ্য এবং দায়ী। তাই মন্ত্রী পরিষদের স্থিতি ও বিলয় সদা সর্বদা সামগ্রিক বা সামুহিক ভাবে হয়েথাকে। মন্ত্রীপরিষদের সমস্ত মন্ত্রী সহমত হয়ে কাজ করবে। যদি কোনো মন্ত্রী মন্ত্রীপরিষদের নিষ্পত্তির সঙ্গে একমত না হতে পারেন,

তাহলে তিনি ইস্তফা দিয়ে থাকেন।

মন্ত্রী পরিষদ যে পর্য্যন্ত লোকসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ সভ্যদের আস্থাভাজন হয়ে থাকবে, সে পর্য্যন্ত ক্ষমতায় থাকবে।

লোকসভা 'অনাস্থাপ্রস্তাব অনুমোদন করে কিম্বা অর্থ বিধেয়ককে অনুমোদন না দিয়ে মন্ত্রী পরিষদের বিরুদ্ধে নিজের অনাস্থা ভাব প্রকট করে থাকে।

সংসদের নিকটে সামগ্রিক ভাবে উত্তর দায়ী হওয়ার সঙ্গে মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরা ব্যাক্তিগত ভাবেও উত্তর দায়ী। সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে রাষ্ট্রপতির মর্জির ওপরে মন্ত্রীরা নিজের পদে থাকেন সত্যি কিন্তু যে কোনো সময়ে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি যে কোনো মন্ত্রীকে তার পদ থেকে বরখাস্ত করে থাকেন।

মন্ত্রী পরিষদের কার্য্যবলী ঃ

মন্ত্রী পরিষদের মুখ্য কার্য্যগুলি নিম্নপ্রকার ঃ

১। নীতি নির্দ্ধারণ ঃ মন্ত্রী মন্ডল দেশের শাসন তথা বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কে বিভিন্ন নীতি নির্দ্ধারণ করেন।

২। নির্দ্ধারিত নীতির প্রয়োগ ঃ

মন্ত্রী মন্ডল কেবল নীতি নির্দ্ধারন করেন না। বিভিন্ন নীতি কি করে ঠিক ভাবে এবং উপযুক্ত সময়ে কার্য্য কারী হতে পারবে, সে সম্পর্কেও নিস্পত্তি গ্রহন করে থাকেন।

৩। আইন প্রনয়ন ঃ আইন প্রনয়ন সংসদের কাজ হলেও, বিভিন্ন আইনের রূপরেখা, ও বিষয় বস্তুর নির্দ্ধারন প্রকৃত পক্ষে মন্ত্রী মন্ডল স্থির করে।

৪। অর্থ সম্বন্ধীয় ঃ দেশের আয় ব্যায়ের বিভিন্ন সুত্র নির্দ্ধারন ও বাজেট প্রস্তুতি ইত্যাদি কার্য্য মন্ত্রী মন্ডলের দ্বারা অমুমোদিত হয়।

৫। রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান ঃ দেশে শাসন এবং রাষ্টপতির কার্য্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তাঁকে সঠিক পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে মন্ত্রী পরিষদের প্রধান কাজ।

৬। আন্তবিভাগীয় সমন্বয় ঃ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা এবং সামগ্রিক ভাবে সরকারের বিভিন্ন যোজনা ও কার্য্য ক্রম গুলোর সফল রূপায়ন করা মন্ত্রী পরিষদের মুখ্য কর্ত্তব্য।

ভূমিকা ঃ সংসদীয় সরকারে মন্ত্রীপরিষদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। কিন্তু পরিবর্ত্তিত পরিস্থিতিতে কাল ক্রমে সংসদ এবং মন্ত্রীপরিষদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা সংকুচিত হচ্ছে।।

অপর পক্ষে মিলিত সরকার রাজনৈতিক দলগুলোর পরস্পর বিরোধী কার্য্য কলাপের জন্য মন্ত্রী পরিষদ এক সুদৃঢ় তথা সমন্বিত দল ভাবে কাজ করতে পারছেনা। ফলে জোট বন্ধন সরকারের স্থিরতা থাকতে পারছেনা।

প্রধান মন্ত্রী ঃ

সংসদীয় সরকারে প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্র মন্ত্রী পরিষদের অধ্যক্ষ রূপে প্রধান মন্ত্রী বাস্তবে কেন্দ্রের কার্য্যপালিকার মুখ্য সংবিধান অনুযায়ী কেন্দ্রের সমস্ত কার্য্য পালিকার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির কাছে ন্যাস্ত থাকলেও বাস্তবে প্রধান মন্ত্রীর বিনা পরামর্শ কোনো ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ব্যবহার করেন না। তাই আমাদের দেশের রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রী সব থেকে বেশী ক্ষমতাশালী।

কার্য্যবলী ঃ ভারতীয় সাংবিধানিক প্রশাসনিক তথা রাজনৈতেক ব্যাবস্থায় প্রধান মন্ত্রী বহুবিধ ভূমি কায় কার্য্য সম্পাদন করেন।

১) প্রধান মন্ত্রী হচ্ছে কেন্দ্র মন্ত্রী মন্ডলের মুখ্য ঃ প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পরে লোকসভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন পেয়ে থাকা দলের বা সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন পেয়ে থাকা জোটঁ দলের নির্বাচিত নেতাকে রাষ্টপতি প্রধান মন্ত্রী ভাবে সরকার গঠন করতে আমন্ত্রন করেন।

এর পরে প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শে অন্য মন্ত্রীগন রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হন। প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রীদের পদ নির্দ্ধারণ করেন এবং সেই মন্ত্রীদের বিভাগের দায়িত্বদেন। তিনি মন্ত্রীমন্ডলের বৈঠক আহ্বান করেন। এর কার্য্য সুচী স্থির করেন এবং বৈঠকে অধ্যক্ষতা করেন। তিনি মন্ত্রীদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করেন ও তাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্ব বোধ

বজায় রাখেন। প্রত্যেক মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্ব মানতে বাধ্য। নচেৎ মন্ত্রী পরিষদ থেকে বহিষ্কার হয়ে যাওয়া ব্যাতীত অন্য কোনো পন্থা নেই। তিনি মন্ত্রী পরিষদের সৃষ্টি স্থিতি ও বিলয়ের কেন্দ্র বিন্দু। তিনি চাইলে যে কোনো মন্ত্রীর বিভাগ পরিবর্ত্তন করতে পারেন বা মন্ত্রীকে বহিষ্কার করতে পারেন। তাঁর মৃত্যু বা পদত্যাগের ফলে কেন্দ্র মন্ত্রী মন্ডলের পতন ঘটে। অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় গৃহীত হলে প্রধান মন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রী পরিষদ পদচ্যুত হন।

২) রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রী মন্ডলের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন যোগসূত্র রক্ষা্ কারী ঃ প্রধান মন্ত্রী হচ্ছে রাষ্ট্রপতির প্রধান পরামর্শ দাতা। তিনি রাষ্ট্রপতিকে মন্ত্রী মন্ডলের সমস্ত নিষ্পত্তি জানিয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতির দ্বারা প্রেরিত বার্ত্তাকে তিনি মন্ত্রীমন্ডলের বৈঠকে আলোচনার জন্য উপস্থঅপন করেন। প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সংসদ, দেশশাসন ও বৈদেশিক ব্যাপার সম্পর্কে বিশেষ ভাবে অবগত করান। বিদেশ ভ্রমন করে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরে প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে সৌজন্য মূলক সাক্ষাৎ করে সবিশেষ আলোচনা করেন।

৩) মন্ত্রীমন্ডল ও সংসদের মধ্যে প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন যোগসুত্র রক্ষাকারী ঃ প্রধান মন্ত্রী সংসদ ও মন্ত্রী মন্ডলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করে থাকেন। সংসদে আগত হবার জন্য থাকা বিভিন্ন বিল এর বিষয়ে তিনি মন্ত্রী মন্ডলের বৈঠকে আলোচনা করেন এবং সংসদে সভ্যদের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। মন্ত্রী মন্ডলের দ্বারা গৃহীত সরকারের নীতি গুলো সংসদে প্রধান মন্ত্রীর দ্বারা উপস্থাপিত হয়। মন্ত্রী মন্ডলের বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী অধ্যক্ষতা করেন।

৪) প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন রাষ্ট্রের নেতা ঃ

প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন সংসদের নেতা এবং সমগ্র দেশের নেতা। তিনি ভারতের আভ্যন্তরীন শাসন তথা আন্তর্জাতীয় সম্পর্কের বিষয়ে বিভিন্ন নীতি নির্দ্ধারন করেনও নীতিগুলি সংসদে গৃহীত করিয়ে থাকেন। প্রধান মন্ত্রী বিদেশ গমন করে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বৈদিশিক নীতি ও অভিমুখ্যকে বিভিন্ন দেশে উপস্থঅপন করেন।

৫) প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন দলের নেতা ঃ

প্রধান মন্ত্রী শাসক দলের সর্ব্বোচ্চ নেতা তাই তিনি শাসক দলের নীতি কার্য্য ক্রম নির্দ্ধারনে গুরুত্বে পূর্ণ ভূমিকা গ্রহন করে থাকেন। জোট সরকারে ও প্রধান মন্ত্রী জোট দলের নেতৃত্ব দেন।

৬) প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন দেশের লোকেদের নেতা ঃ

প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন নিজদেশের ''জন নায়ক''। ভারতের প্রত্যেক নাগরিক প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকে বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, প্রসাসনিক দক্ষতা কর্ত্তব্য নিষ্ঠা তথা দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য দৃঢ় সংকল্প আশা করে থাকেন।

৭) প্রধান মন্ত্রীর বহুবিধ ভূমিকা ঃ প্রধান মন্ত্রী তাঁর পদমর্য্যাদার বলে নীতি আয়োগের অধ্যাক্ষ ভাবে কার্য্য করেন। এছাড়া তিনি অনেক সংস্থা কমিটি, আয়োগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত। স্বাধীনতা দিবসে প্রধান মন্ত্রী লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে অভিভাষন প্রদান করেন।

প্রধান মন্ত্রীর ভূমিকা ঃ

সংবিধানের ৭৪ ধারাতে প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য কার্য্যাবলী সূচীতে হয়েছে। প্রধান মন্ত্রী হচ্ছেন সরকারের প্রশাসনিক মুখ্য। তাঁর ক্ষমতা সূদুর প্রসারী। তিনি মন্ত্রীমন্ডলের প্রান কেন্দ্র ওদেশ শাসনের দিগদর্শক। তিনি আরও রাষ্ট্রের নীতি নির্দ্ধারক। আর্ন্তজাতিক ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রী দেশের মার্গদর্শক।

প্রধান মন্ত্রীর ব্যাক্তিত্ব, বুদ্ধিমত্তা, কুটনৈতিক বিচক্ষণতা, রাজনৈতিক পরিপক্কতা ও সর্বোপরি দলীয় সমর্থন তাঁর সফল নেতৃত্বকে অনন্য করে থাকে।

দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ, সংবিধানিক পদ মর্য্যাদা, রাজনৈতিক সমীকরন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর সু-সম্পর্ক ও ভাবের আদান প্রদান প্রধান মন্ত্রী পদকে অধিক

পরিপুষ্ট করে থাকো। মিলিত সরকার বা জোট সরকারের সফলতার ক্ষেত্রে প্রধান মন্ত্রীর বলিষ্ট নেতৃত্ব ও প্রশংসানীয়।

আর্ন্তজাতিক স্তরে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ভারতের নেতৃত্ব দিয়ে থাকেন।

কেন্দ্র ব্যাবস্থাপিকা ঃ

কেন্দ্র ব্যবস্থাপিকা সভাকে সংসদ বা পার্লামেন্টে বলা হয়। রাষ্ট্রপতি, লোকসভা এবং রাজ্য সভা নিয়ে সংসদ গঠিত হয়। এই দ্বিসদনীয় সংসদের নিম্ন সদনকে লোকসভা ও উচ্চ সদনকে রাজ্যসভা বলা হয়। লোকসভা হচ্ছে লোকেদের সভা। এটা জনসাধারন দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি দেরে নিয়ে গঠিত। রাজ্য সভা সংঘীয় নীতির ওপরে অধারিত। রাজ্য সভা রাজ্যদের প্রতি নিধিত্ব করেন। এটি রাজ্যের বিধান মন্ডলের নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। লোকসভা ও রাজ্য সভার গঠন ও কার্য্যবলী নিম্নে আলোচিত হয়েছে।

লোক সভা গঠন ঃ

লোকসভা দেশের সার্বজনীন সাবালক নাগরিক দের দ্বারা ভোট প্রধান মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। মন্ত্রীমন্ডল নিজের সমস্ত কার্য্যের জন্য লোকসভার নিকটে উত্তরদায়ী। এটা ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জন সাধারনের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতীক।

সাংবিধানিক ব্যবাস্থা অনুযায়ী লোক সভার সর্ব মোট সভ্য সংখ্যা ৫৫২ জন হতে পারবে। এর মধ্যে ৫৩০ জন বিভিন্ন রাজ্য থেকে এবং সর্বাধিক ২০ জন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হবেন এবং ২ জন অ্যাংলো ভারতীয় কে রাষ্ট্রপতি মনোনিত করতে পারবেন। বর্তমানে লোক সভার সভ্য সংখ্যা ৫৪৫ জন। তার থেকে ৫৩০ জন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল থেকে সাবালক ভোটদানের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছেন।

(ভারতের পার্লামেন্ট ভবন বা সংসদ)

এবং ২ জন অ্যাংলো ভারতীয়কে রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেছেন। লোক সভা জনসাধারনকে প্রতিনিধিত্ব করতে থাকায় প্রত্যেক রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের লোকসংখ্যার অনুপাত অনুসারে সভ্য সংখ্যা নির্দ্ধারিত করা হয়েছে। ওড়িশা থেকে লোকসভায় ২১ জন সভ্য আছেন। অনুসূচিত জাতি ও জনজাতি র জন্য লোক সভায় স্থান সংরক্ষিত রয়েছে।

যোগ্যতা ঃ লোক সভার সভ্য পদের জন্য একজন প্রার্থীর নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাক আবশ্যক।

১) তিনি অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকবেন।

২) তাঁর বয়স অন্যুন ২৫ বছর হয়ে থাকবে।

> ভারতের প্রত্যেক ১৮ বছরের অধিক বয়স্ক নাগরিক নির্বাচনে ভোটদান অধিকার সাব্যস্ত করে লোকসভাকে প্রার্থী নির্বাচিত করেন।

৩) তিনি একজন দেউলিয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যাক্তি হবেন না।

৪) তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক পদাসীন হবেন না।

৫) সংসদ দ্বারা প্রনীত আইন নির্দ্দেশিত অন্যান্য যোগ্যতা তার থাকবে।

কার্য্যকাল ঃ

লোক সভার কার্য্যকাল ৫ বছর। ৫ বছরের কার্য্যকাল শেষ হলে লোকসভা অনুষ্ঠানিক ভাবে ভঙ্গ করে দেওয়া হয়। কিন্ত প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্রপতি লোক সভাকে ৫ বছরের সময় সীমা শেষ হবার আগেই ভেঙে দিতে

পারেন।

জাতীয় জরুরী পরিস্থিইত তে আইন প্রনয়ন করে লোকসভা নিজের কার্য্য কাল একবারে সর্বাধিক ১ বছর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করে থাকে। কিন্তু জরুরী কালীন পরিস্থিতি প্রত্যাহার হয়েে গেলে, প্রত্যাহিত দিন থেকে গৃহের বর্দ্ধিত সময় সীমা ৬ মাসের বেশী হবে না।

লোকসভার প্রথম অধিবেশন বসার দিন থেকে এই ৫ বছরের সময় সীমা গণনা করা হয়।

লোকসভার অধিবেশনঃ

রাষ্ট্রপতি লোক সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। একে অনির্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত 'প্রোরোগ' রাখতে পারেন এবং এক্যে ভঙ্গ করতে পারেন। রাষ্ট্র পতির সাংবিধানিক কর্ত্তব্য হচ্ছে যে তিনি এমন ভাবে লোক সভার আহ্বান করবেন যার ফলে একটি অধিবেশনের শেষ দিন এবং পরবর্ত্তী অধিবেশনের প্রথম দিনের মধ্যে ৬ মাসের বেশী ব্যবধান থাকবেনা। লোক সভার অধিবেশন অন্যুন্য বছরে দুবার বসে।

সাধারণত ঃ প্রতিবছর লোকসভা (তিন) ৩টে অধিবেশনে মিলিত হয় যথাঃ বাজেট অধিবেশন, বর্ষা কালীন অধিবেশন এবং শীত কালীন অধিবেশন।

কোরাম ঃ যে ন্যুনতম সংখ্যক সভ্যের উপস্থিতি সভাকার্য্য আরম্ভ করার জন্য নেহাত জরুরী তাকে কোরাম বলা হয়। লোক সভার কোরাম সংখ্যা হচ্ছে গৃহের মোট সভ্যসংখ্যার এক দশমাংশ অর্থাৎ ৫৫ জন। কোরামের অভাবে সভা কার্য্য বন্ধ থাকে। কোনো সভ্য গৃহের বিনা অনুমতিতে গৃহের অধিবেশন থেকে ৬০ দিন পর্য্যন্ত লাগাতার অনুপস্থিত থাকলে তিনি তাঁর সভ্য পদ হারাবেন।

বেতন ও ভাতা ঃ লোক সভার সভ্যরা নির্দ্ধারিত মাসিক বেতন সমেত অন্যান্য ভাতা পেয়ে থাকেন।

বাচস্পতি ঃ বাচস্পতি হচ্ছেন লোকসভার অধ্যক্ষ। লোকসভার প্রথম বৈঠকে লোকসভার সভ্য গন নিজের মধ্যে থেকে একজনকে বাচস্পতি ভাবে নির্বাচিত করে থাকেন। সাধারণতঃ বাচস্পতি শাসক দলের একজন সভ্য হয়ে থাকেন।

কিন্তুর বাচস্পতি ভাবে নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি দলীয় অনুগত্য থেকে আলাদা থেকে নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে থাকেন।

বাচস্পতি গৃহের অধ্যক্ষ ভাবে লোকসভার অধিবেশন কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি গৃহে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন। তিনি গৃহের নীতি নিয়মের ব্যাখ্যা করেন। সভ্যদের অধিকার ও সুযোগ সুবিধা কে তিনি সুরক্ষা প্রদান করেন। বিশৃঙ্খলিত আচরনের জন্য তিনি সভ্যদের গৃহ থেকে বহিষ্কার বা নিলম্বিত করতে পারেন। একটি বিল অর্থ সম্বন্ধীয় বিল কি নয় তা বাচস্পতি নির্দ্ধারিত করে থাকেন। বাচস্পতি সাধারণতঃ কোনো বিলের সপক্ষে বা বিপক্ষে মত দান করেন না। কিন্ত যখন কোনো বিলের সপক্ষে ও বিপক্ষে সমান সংখ্যাক ভোট পড়ে তখন বাচস্পতি তাঁরা 'নির্ণায়ক ভোট' প্রদান করে বিল টির ভাগ্য নির্দ্ধারন করে থাকেন। গৃহ কার্য্য সমাপনে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে তিনি সভা কার্য্য মুলতুবি রাখেন।

লোক সভার সভ্যদের দ্বারা একজন উপ বাচস্পতি ও নির্বাচিত হয়ে থাকেন। বাচস্পতির অমুপস্থিতিতে তিনি গৃহ কার্য্য পরিচালনা করেন। পরম্পরা অনুসারে একজন বিরোধী দলের সভ্য উপবাচস্পতি ভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

রাজ্যসভা ও এর গঠনঃ

রাজ্য সভা হচ্ছে সংসদের উচ্চ সদন বা দ্বিতীয় সদন। এই সদন রাজ্যদের প্রতিনিধিত্ব করে। কিন্তু এই গৃহে সমস্ত রাজ্যের সমান সংখ্যাক প্রতিনিধি নেই। লোকসভার মত রাজ্য সভাতেও বিভিন্ন রাজ্যের জন সংখ্যার অমুপাতে প্রতিনিধিত্বর ব্যবস্থা রয়েছে। ওড়িশার ১০ জন সদস্য রাজ্য সভায় আছেন। রাজ্য সভার সর্বাধিক সভ্যসংখ্যা ২৫০ জন। এর থেকে সর্বাধিক ২৩৮ জন বিভিন্ন রাজ্য ও

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল থেকে পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত হন এবং ১২ জন রাষ্ট্রপতির দ্বারা মনোনিত হয়ে থাকেন। যাঁরা কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সমাজ সেবায় পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছেন। (বর্ত্তমান রাজ্য সভার সর্ব মোট সভ্য সংখ্যা ২৪৫ জন)। রাজ্য সভার সভ্যগন প্রত্যেক রাজ্যের বিধান সভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বার সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব এবং একক হস্তান্তরীয় ভোট প্রথা দ্বারা নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

যোগ্যতা ঃ

রাজ্য সভার সভাপদের জন্য একজন ব্যাক্তির নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

১) তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকবেন।

২) তাঁর বয়স অতিকম ৩০ বছর হয়ে থাকবে।

৩) তিনি কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের অধীনে কোনো লাভজনক পদে থাকবেন না।

৪) তিনি দেউলিয়া বা বিকৃত মস্তিষ্কের হবেন না।

৫) সংসদ দ্বারা আইনের মাধ্যমে নিদ্ধারিত অন্যান্য যোগ্যতা তার থাকবে।

কার্য্যকাল ঃ

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সভা। এর বিলয় হয় না। কিন্ত রাজ্য সভার সভ্যগন ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত বা মনোনীত হন। রাজ্য সবার এক তৃতীয়ংশ সভ্য প্রতি ২ বছরে অবসর গ্রহন করে থাকেন। তাই প্রতি ২ বছরে একবার রাজ্য সভার নির্বাচন করে এক তৃতীয়াংশে সভ্যপদ পূরণ করা হয়।

রাজ্য সভা ও লোকসভার অধিবেশন রাষ্ট্রপতি আহ্বান করেন। উভয় গৃহের অধিবেশন একই সময়ে বা ভিন্ন সময়ে আহূত হয়ে থাকে। আবশ্যক হলে উভয় গৃহের মিলিত অধিবেশন আহ্বান করা হয়।

অধ্যক্ষ ঃ

ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নিজের পদাধিকার বলে রাজ্য সভার অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করে থাকেন। তিনি লোকসভার বাচস্পতির মত রাজ্য সভায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার সাথে গৃহের সভাকার্য্যের সম্পাদন করে থাকেন। তিনি গৃহের নীতি নিয়মের ব্যাখ্যা করেন। সভাদের অধিকার ও সুবিধা সুযোগের সুরক্ষা করেন। লোক সভার বাচস্পতির মত তিনি বিভিন্ন কার্য্য ও সম্পাদন করেন।

লোক সভার বাচস্পতির মত রাজ্যসভাতে ও একজন নির্বাচিত উপাধক্ষ আছেন। তিনি রাজ্য সভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন। অধ্যক্ষর অনুপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ গৃহ কার্য্য পরিচালনা করেন।

সংসদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ আইন প্রনয়ন ক্ষমতা ঃ

১) সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী কেন্দ্র তালিকা এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত সমস্ত বিষয়ে সংসদ আইন প্রনয়ন করে। এতদব্যাতিত কোনো রাজ্য রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে। সেই রাজ্যের জন্য সংসদও আবশ্যকীয় আইন প্রনয়ন করে থাকে। সাধারণ বিল ও অর্থ সম্বন্ধীয় বিল সংসদের উভয় গৃহে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গৃহীত হয়ে রাষ্ট্রপতির সম্মতি প্রাপ্ত হওয়ার পরে আইনে পরিনত হয়ে থাকে। সাধারন বিলের ক্ষেত্রে সংসদের উভয় গৃহের ক্ষমতা সমান। কেবল অর্থ বিলের ক্ষেত্রে লোকসভার ক্ষমতা রাজ্য সভার থেকে বেশী। কোনো সাধারন বিলের ক্ষেত্রে সংসদের উভয় গৃহের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি উভয় সদনের মিলিত অধিবেশনের আহ্বান করে উক্ত সমস্যার সমাধানকরে থাকেন। মিলিত অধিবেশনের বাচস্পতি অধ্যক্ষতা করে থাকেন। রাষ্ট্রপতির দ্বারা জারি হওয়া অধ্যাদেশ এবং জরুরী কালীন ঘোষনা নামাও সংসদে অনুমোদিত হয়ে থাকে।

২) কার্য্য পালিকা নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা ঃ

আমাদের সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় কেন্দ্র মন্ত্রী পরিষদ লোকসভার নিকটে সর্বদা সামগ্রিক ভাবে উত্তরদায়ী।

সরকারের বিভিন্ন ক্যার্য্য কলাপ ও নীতি গুলোর সম্পর্কে সংসদে আলোচনা করা হয় এবং সাংসদরা 'প্রশ্নোত্তর' কার্য্য ক্রমে মন্ত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে

তুমি জান কি ?
রাজ্য সভায় অনাস্থা প্রস্তাব আগত হয় না।

উত্তর পেয়ে থাকেন।

মন্ত্রীগন সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। এটা ছাড়া মূলতূবী প্রস্তাব, ধ্যান আকর্ষণকারী প্রস্তাব এবং বাজেট আলোচনার মাধ্যমে সাংসদগন মন্ত্রীপরিষদের ওপর নিয়ন্ত্রন জাহির করে থাকেন। লোক সভায় বিরোধী দল মন্ত্রীমন্ডলের বিরুদ্ধে 'অনাস্থা প্রস্তাব' আগত করতে পারেন। এই অনাস্থা প্রস্তাব সংখ্যাধিক সভ্যের সমর্থনের গৃহীত হলে মন্ত্রী পরিষদ ইস্তাফা দিতে বাধ্য হয়ে থাকেন।

৩) অর্থসম্বন্ধীয় নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা ঃ

সংসদের বিনা অনুমতিতে (অনুমোদন) সরকার এক পয়সাও খর্চা করতে পারবেনা, বা ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন না। তাই মন্ত্রীমন্ডল বার্ষিক বাজেট এবং অতিরিক্ত বাজেটের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্য্যক্রম যোজনায় অর্থ ব্যায়ের জন্য সংসদের অনুমতি প্রার্থনা করে থাকেন। এই সময়ে বিরোধী দলের সাংসদগন তিন প্রকার কাট প্রস্তাব আগত করে মন্ত্রীমন্ডলের ওপর নিয়ন্ত্রন সাব্যস্ত করেন। সংসদে বাজেট গৃহীত হতে না পারলে। মন্ত্রীমন্ডল ভেঙে যায়। সেই ভাবে কাট প্রস্তাব সংসদে গৃহীত হয়ে গেলে মন্ত্রী মন্ডল ইস্তফা দিয়েছেন।

৪) নির্বাচন সম্বন্ধীয় ক্ষমতা ঃ

রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচনে সংসদের উভয় গৃহের নির্বাচিত সভ্য গন ভাগ নিয়েথাকেন। লোকসভার সভ্যরা বাচস্পতি ও উপবাচস্পতি কে নির্বাচিত করেন। সেই রকম রাজ্য সভার সভ্যরা রাজ্য সভার উপাধ্যক্ষ কে নির্বাচিত করে থাকেন।

৫) ন্যায়িক ক্ষমতা ঃ সংসদের উভয় গৃহের সভ্যগন সম্বিধান ভঙ্গ করার জন্যে বা সম্বিধানের বিরোধাচরন করার জন্যে রাষ্ট্রপতিকে মহাভিযোগ প্রস্তাবের মাধ্যমে পদ চ্যুত করে থাকেন। উপরাষ্ট্রপতির পদচ্যুতির জন্যে রাজ্য সভায় প্রস্তাব আগত হয় ও গৃহীত হয়ে লোকসভা দ্বারা অনুমোদিত হয়ে থাকে। এছাড়া সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতিদের বিরুদ্ধে সংসদে বহিষ্কার প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তাদের পদচ্যুত করে থাকেন।

৬) সংবিধান সংশোধন ক্ষমতা ঃ

আমাদের সংবিধানের ৩৬৮ ধারা অনুযায়ী সংবিধানের সংশোধনের ব্যবস্থা সংসদের দ্বারা হতে পারবে। এ সংক্রান্তীয় চিঠা আইন (বিল) সংসদের যে কোনো গৃহে আগত হতে পারবে। সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত চিঠা আইন গুলো আব্যশ্যক সংখ্যক সভ্যের সমর্থনে সংসদের উভয় গৃহে আলাদা আলাদা গৃহীত হবার পরে রাষ্ট্রপতির স্বীকৃতি লাভ করে কার্য্যকারী হয়ে থাকে।

৭) বিবিধ ক্ষমতা ঃ

সংসদে দেশের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সমস্যার ওপরে সারগর্ভ আলোচনা হয়। এই আলোচনা মন্ত্রীমন্ডলকে সচেতন করানোর সঙ্গে সঙ্গে জনমতকে সজাগ ও সক্রিয় করে থাকে। সাধারন আয় ব্যায় কমিটি ব্যয় নিরুপন কমিটি এবং মহাহিসাব নিরীক্ষক এর রির্পোটের ওপর বিস্তৃত আলোচনা করে সাংসদ গন সরকারের বিভিন্ন বিভাগের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে দিয়ে থাকেন এবং এর নিরাকরনের পন্থা সরকার নির্ণয় করেন।

সংসদে আইন প্রনয়ন পদ্ধতি ঃ

সংসদে আগত প্রস্তাবিত আইনকে চিঠা আইন বা বিল বলা হয়। বিলগুলি সাধারণত দুভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা

ক) সাধারন বিল (Non money bill)

খ) অর্থ সম্বন্ধিত বিল (Money bill)

সাধারণ চিঠা আইন বা বিল ঃ

সাধারণ বিল যে কোনো গৃহে আগত করা হয়ে থাকে। প্রত্যেক বিল গৃহে উপস্থাপিত হবার পরে তিনটি পাঠের (Three Readings) মাধ্যমে গৃহীত হয়ে থাকে। প্রথম পাটের সময় কেবল বিলের উদ্দেশ্য ও শিরোনাম (Title)

পাঠ করা হয়। দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলের ওপর গৃহে পুংখানুপুঙ্খ আলোচনা করা হয়। আবশ্যক পড়লে বিলটি কে যাচ কমিটিতে (Select Committee) প্রেরিত হয় বা জনমত সংগ্রহের জন্য জন সাধারনের নিকটে পাঠানো হয়। তৃতীয় পাঠের সময় বিলের ওপর মতদান বা ভোট গ্রহন করা হবার পরে অন্যগৃহে পাঠানো হয়। সেই গৃহেও বিলটি তিনটি পাঠের মধ্যে গতি করে। উভয় গৃহে বিলটি গৃহীত হবার পর রাষ্ট্রপতির নিকটে তাঁর সম্মতির জন্য পাঠানো হয়।

রাষ্ট্রপতির 'সম্মতি' পাবার পরে চিঠা আইন বা বিলটি পুর্ণাঙ্গ আইনে (Act) পরিনত হয়। সাধারন বিল অনুমোদনের ক্ষেত্রে যদি সংসদের উভয় গৃহের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা দেয়, তা হলে রাষ্ট্রপতি সমাধানের জন্য সংসদের মিলিত অধিবেশনের আহ্বান করেন। রাষ্ট্রপতির নিকটে সম্মতির জন্য প্রেরিত হওয়া সাধারন বিল কে তিনি সংসদের পূণঃ বিচারের জন্য পাঠাতে পারেন। বিলটি সংসদের পূর্ণর্বার গৃহীত হলে রাষ্ট্র পতি সম্মতি প্রদান করতে বাধ্য হন। সাধারন বিলের অনুমোদন ক্ষেত্রে সংসদের উভয় গৃহের ক্ষমতা সমান।

অর্থ সম্বন্ধিত বিল (Money Bill)ঃ

প্রত্যেক অর্থ সম্বন্ধিত বিল বা অর্থ বিল আগত হবার পূর্বে রাষ্ট্রপতির প্রাক অনুমতি পাওয়া একান্ত আবশ্যক। একটি বিল অর্থ বিল কি নয়, তা লোক সভার বাচস্পতি নিষ্পত্তি করে থাকেন। অর্থ বিলটি লোক সভায় গৃহীত হওয়ার পরে বাচস্পতির সার্টিফিকেট সহ রাজ্য সভায় গৃহীত হওয়ার জন্য সেই গৃহে পাঠানো হয়। রাজ্য সভা যদি ১৪ দিনের মধ্যে বিলটি অনুমোদন করে লোকসভায় না পাঠায় তা হলে অর্থ বিল রাজ্য সভা দ্বারা গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থ বিল উভয় গৃহে গৃহীত হবার পরে রাষ্ট্রপতির সম্মত্তির জন্য পাঠানো হয়। অর্থ বিল রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদন সহ গৃহে আগত হয়ে থাকায় রাষ্ট্রপতি অর্থ বিলকে সম্মত্তি দিয়ে থাকেন। রাজ্য সভা অর্থ বিল কে নামঞ্জুর বা সংশোধন করতে পারবে না।

ভারতের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় (Supreme Court of India)ঃ

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় সংঘীয় রাষ্ট্রের এক অত্যাবশ্যক অঙ্গ। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বিবাদ হলে তার সমাধান করা এবং

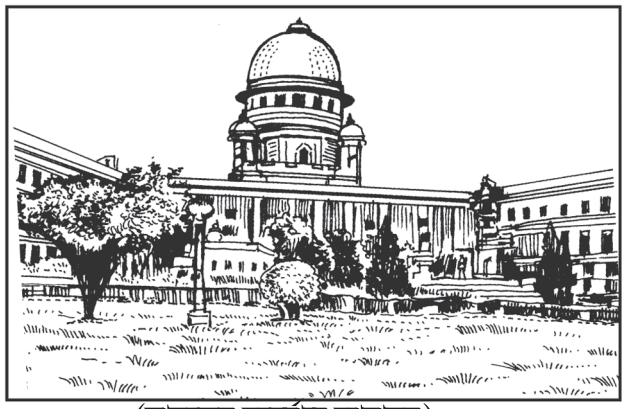

(ভারতের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়)

সংবিধানের ব্যাখ্যা করা এই সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান কার্য্য আমাদের দেশের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়াল্যয় () রাজধানী দিল্লীতে অবস্থিত। ভারতের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তথা ত্রিস্তরীয় ন্যায় পালিকার গঠন দেখতে পিরামিডের মত। শীর্ষে রয়েছে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়। প্রত্যেক রাজ্যে রয়েছে একটি করে উচ্চ ন্যায়অলয় (হাইকোর্ট) এবং সর্ব নিম্নে রয়েছে জেলা স্তরীয় ও উপখন্ড স্তরীয় অধস্তন ন্যায়ালয় বা নিম্ন আদালত।

গঠনঃ

আমাদের দেশের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় জন্ম নিল ১৯৫০ সালের ২৬ শে জানুয়ারী এর পূর্বে এর নাম ছিল সংঘীয় ন্যায়ালয় (federal Court) বর্তমানে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে প্রধান বিচার পতির সমেত ৩২ জন বিচার পতি আছেন।

ভারতরে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় ()ঃ

এই বিচার পতিদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন। আজকাল জ্যেষ্টত্যর ভিত্তিতে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের জ্যেষ্টতম বিচারপতি প্রধান বিচার পতি রূপে নিযুক্ত হচ্ছেন।

যোগ্যতাঃ

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতির পদে নিযুক্তি পাবার জন্যে একজন ব্যাক্তির নিম্নলিখিত যোগ্যাতা থাকা আবশ্যক।

১) তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকবেন এবং

২) এক বা একাধিক উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্যুন ৫ বছরের জন্য বিচার পতি ভাবে কার্য্য করে থাকবেন। কিংবা এক বা

একাধিক উচ্চ ন্যায়ালয়ে একাধি ক্রমে ১০ বছর ধরে আইনজীবি (Advocate) ভাবে কার্য্য করে থাকবেন। কিম্বা রাষ্ট্রপতির মতে তিনি একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ (Jurist) হয়ে থাকবেন।

কার্য্যকাল ও পদচ্যুতিঃ

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতি গন ৬৫ বছর বয়সে অবসর গ্রহন করেন। একজন বিচারপতি প্রমানিত অসদাচরন কিম্বা শারীরিক অসামর্থ হেতু সংসদের অনুমোদন ক্রমে রাষ্ট্রপতির দ্বারা পদচ্যুত হতে পারবেন। কিন্তু বিচার পতিদের পদচ্যুতি পদ্ধতি অতি জটিল। যখন বিচার পতির পদচ্যুতি প্রস্তাব সংসদের উভয় গৃহে প্রত্যেক গৃহের সর্ব মোট সদস্যের অর্ধাদিক সংখ্যা গরিষ্ঠ সমর্থন তথা উপস্থিত সভ্যদের দুই তৃতীয়ংশ সংখ্যার সমর্থন দ্বারা গৃহীত হবে, তখন রাষ্ট্রপতি বিচার পতিকে পদচ্যুত করতে পারবেন। বিচার পতি স্বহস্তে রাষ্ট্রপতিকে ইস্তফা পত্র লিখে নিজের পদ থেকে অব্যাহতি নিতে পারবেন।

অবসরের পরে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতি দেশের কোনো ন্যায়ালয়ে উকিলতি করতে পারবেন না বিচার পতির বেতন ও ভাতা আইনের দ্বারা স্থির করা হয়ে থাকে।

ক্ষেত্রধিকার ও কায্যাবলীঃ

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকারকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

১) মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার

২) আবেদন মূলক ক্ষেত্রাধিকার এবং

৩) উপদেশ মূলক ক্ষেত্রাধিকার

১) মৌলিক ক্ষেত্রাধিকারঃ সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় এক সংঘীয় ন্যায়ালয় হওয়ার কেন্দ্র ও রাজ্যদের মধ্যে বা রাজ্য ও রাজ্যদের মধ্যে বিবাদ দেখা দিলে তার ন্যায়িক সমাধান এই সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় করতে পারবে। এই ক্ষমতা মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার অন্তর্ভূক্ত। কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে হওয়া বিবাদ গুলি নিম্ন প্রকারের হয়ে থাকে যথাঃ

ক) কেন্দ্র সরকার বনাম এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিবাদ, কিম্বা

খ) কেন্দ্র সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য সরকার বনাম এক বা একাধিক রাজ্য সরকারের মধ্যে বিবাদ কিম্বা

গ) রাজ্য বনাম রাজ্য বিবাদ।

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার কে সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। সংবিধানের ৩২ ধারার বলে নাগরিকরা তাদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্য হলে সর্ব্বোচ্চ নায়ালয়ের দ্বারস্থ হয়ে থাকেন। এবং সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় পাঁচটি ন্যায়িক আদেশ বা **পরমা দেশের** (রিট) মাধ্যমে নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদান করে থাকেন সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের এই বিট প্রদান ক্ষমতা মৌলিক ক্ষেত্রধিকারের অন্তভূক্ত সেই পরমাদেশ গুলি হলঃ

ক) হেবিয়াস কর্পাস

খ) ম্যান্ডামস্

গ) প্রোহিবিসন

ঘ) সরসিওরারী ও

ঙ) কোয়ারান্টো

২) আবেদন মূলক ক্ষেত্রাধিকারঃ

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়, সামরিক ন্যায়ালয়, তথা কেন্ত্রীয় প্রশাসনিক ন্যায়ালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করা হয়ে থাকে। এই আবেদন ক্ষেত্রাধিকার তিনপ্রকারের যথা ঃ ক) সাংবিধানিক খ) দেওয়ানী গ) ফৌজদারী

ক) সাংবিধানিক আবেদনঃ

যখন কোনো মকদ্দমার বিচারে সাংবিধানিক ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট বলে উচ্চ ন্যায়ালয় প্রমান পত্র প্রদান করে, তখন উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন করা যেতে পারবে। কারন সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় হচ্ছে সংবিধানের সর্বশেষে ব্যাখ্যা কারী।

খ) দেওয়ানী আবেদন।ঃ

কোনো দেওয়ানী মকদ্দমায় যদি উচ্চ ন্যায়ালয় প্রমান পত্র প্রদান করেন যে উক্ত মকদ্দমার বিচারে জড়িত থাকা গুরুত্ব পূর্ণ আইনগত প্রশ্নের ব্যাখার জন্য সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারা সংবিধানিক তর্জমা আবশ্যক, তা হলে সেই মকদ্দমা উচ্চন্যায়ালয়ের রায়ের বিরুদ্দে সর্ব্বোচ্চ

ন্যায়ালয়ে আবেদন করা যেতে পারবে।

গ) ফৌজদারী আবেদন ঃ

ফৌজদারী মকদ্দমাতে ও উচ্চ ন্যায়ালয়ের রায়ের বিরুদ্ধে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন করা যেতে পারবে যদি ঃ

১) নিম্ন আদালেতের একজন দোষযুক্ত ব্যাক্তি উচ্চ ন্যায়ালয়ে দোষী সাব্যস্ত হয়ে মৃত্যু দন্ড প্রাপ্ত হয়ে থাকে কিংবা ঃ

২) উচ্চ ন্যায়ালয় নিম্ন আদালত থেকে মকদ্দমাটি নিজের কাছে স্থানান্তরিত করে বিচারের পরে দোষীকে মৃত্যু দন্ডে দন্ডিত করে থাকে। কিম্বা

৩) উচ্চ ন্যায়ালয়ে মকদ্দমাটি সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন যোগ্য বলে প্রমান পত্র দেয়।

ঘ) স্বতন্ত্র আবেদন ক্ষমতা ঃ

এতদব্যাতীত সর্ব্বোচ্চ নায়ালয় ও নিজের তরফ থেকে সামরিক আদালত ব্যতীত অন্য যে কোনো আদালতের রাযের বিরুদ্ধে আবেদন করার জন্য স্বতন্ত্র অনুমতি প্রদান করে থাকেন। যে ক্ষেত্রে উপযুক্ত ন্যায় প্রাপ্ত হয়নি বলে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় বিচার করে ঃ

৩) উপদেশ মূলক ক্ষেত্রাধিকার ঃ

রাষ্ট্রপতি কোনো আইনগত প্রশ্ন বা জনস্বার্থ জড়িত সমস্যার ওপরে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের মতামত জানতে চান। বিভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় রাষ্ট্রপতিকে নিজের মতামত প্রদান করে থাকে। মাত্র রাষ্ট্রপতি এই মতামত সম্বলিত উপদেশ গ্রহন করতে বাধ্য নন।

রায় পূণর্বিচারের ক্ষমতা ঃ

আবশ্যক স্থলে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় নিজের দ্বারা পূর্ব প্রদত্ত রায়ের পূর্ণবিচার করে থাকেন। যদি কোনো সময়ে প্রদত্ত রায়ে ত্রুটি থাকার কথা পরবর্ত্তী সময়ে জানতে পারা যায়, তখন সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় নিজের প্রদত্ত রায়ের পূর্ণবিচার করে থাকেন।

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের স্বাধীনতা ঃ

সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের স্বাধীনতা নিরূপিত করা হয়েছে যথা

ক) বিচার পতিরা রাষ্ট্রপতির দ্বারা স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে নিযুক্ত হন।

খ) তাঁদের পদচ্যুতির ব্যবস্থা ও স্বতন্ত্র।

গ) বিচার পতিদের বেতন ও ভাতা আইন দ্বারা স্থিরকৃত।

ঘ) বিচার পতিদের অবসরের বয়স সীমা সংবিধানের দ্বারা স্থির করা হয়েছে।

অভিলেখ আদালত ঃ

প্রথমত সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় একটি অভিলেখ আদালত (court of Records)। এই ন্যায়ালয়ের রায় এবং আদেশনামা দেশের অন্য সমস্ত আদালত মানতে বাধ্য। সর্বোচ্চ আদালতের রায় নিম্ন আদালতে প্রমান স্বরূপ দেখানো হয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত ঃ সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় ''আদালত অবমাননার অপরাধে অভিযুক্তকে দন্ড বিধান করে থাকে।

নায়িক পূনরাবলোকন ঃ (Judicial Review)

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় হচ্ছে সংবিধানের রক্ষা্ কর্ত্তা। সুতরাং সংসদ বা রাজ্য বিধান মন্ডল দ্বারা প্রনীত আইন বা কার্য্য পালিকার আদেশ নামা যদি সংবিধানের কোনো ব্যবস্থা কে উলংঘন করে, তা হলে সর্বোচচ ন্যায়ালয় উক্ত আইন ও কার্য পালিকার আদেশ নামাটি অসংবিধানিক ঘোষনা করে অসিদ্ধ করে দিয়ে থাকেন। একে ন্যায়িক পুনবারলোকন বলা হয়।

জনস্বার্থ মকদ্দমা ()

পূর্বে যে ব্যক্তির অধিকার ক্ষুন্য হতো কেবল তিনিই ন্যায়ালয়ে মকদ্দমা দায়ের করতে পারতেন। মাত্র বর্ত্তমানে সাধারন স্বার্থ ব্যাহত হলে যে কোনো সচেতন ব্যাক্তি তথা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আদালতের আশ্রয় নিতে পারবেন। এমন কি সংবাদ পত্র বা গন মাধ্যমে প্রকাশিত ও প্রচারিত সংবাদ কেও বিচারের জন্য গ্রহন করে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় সরকারকে সমুচিত নির্দ্দেশ দিয়ে থাকেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা বহুক্ষেত্রে পতিত, দলিত, নিষ্কেষিত তথা, অত্যাচারিতের সমস্যা এবং সর্বসাধারন সমস্যা গুলির ন্যায়িক সমাধান হতে পারছে। সেক্ষেত্রে য়খন সংসদ ও কার্য্য পালিকা নিজেদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সূচারুরূপে

সম্পাদন করতে পারছে না, সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সে ক্ষেত্রে তাদের আবশ্যকীয় ন্যায়িক নির্দ্দেশনামা দিচ্ছেন। একে ন্যায়িকা তৎপরতা (Judicial Activism) বলা হয়। এর দ্বারা সংসদ ও কার্য্য পালিকা নিজেদের দায়িত্ব ঠিক ভাবে পালন করে থাকেন।

আমাদের দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সংঘীয় ন্যায়ালয় ভাবে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে দেখা দেওয়া বিবাদের সমাধান করেন। এটিও হচ্ছে সংবিধানের রক্ষাকর্ত্তা ও সর্ব শেষ ব্যাখ্যা কর্ত্তা এবং নাগরিকদের সামাজিক তথা অর্থনৈতিক ন্যায় প্রদানের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

লোকতন্ত্রের সহায়ক ভাবে ন্যায় পালিকা স্বীকৃতি লাভ করেছে। ভারতের মত সংঘীয় রাষ্ট্রে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের ভূমিকা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ।

◆ ◆ ◆

আমরা কি শিখলাম ?

- মোগল সংসদীয় গনতন্ত্র ব্যাবস্থা প্রচলিত।
- রাষ্ট্রপতি দেশের সর্বোচ্চ সংবিধানিক শাসন মুখ্য।
- প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ ক্রমে রাষ্ট্র সমস্ত সংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেন।
- প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ দেশের বাস্তব কার্যপালিকা।
- রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন ও তাঁর পরামর্শ ক্রমে অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন ও তাদের বিভাগ বণ্ঠন করেন।
- মন্ত্রীপরিষদ সংসদের নিকটে সামগ্রিক ভাবে উত্তর দায়ী।
- সংসদ, লোকসভা, রাজ্য সভা ও রাষ্ট্রপতি কে নিয়ে গঠিত।
- লোকসভার সর্বমোট সভ্যসংখ্যা সর্বাধিক ৫৫২ হতে পারবে।
- এর মধ্যে ৫০০ জন বিভিন্ন রাজ্যের, সর্বাধিক ২৯ জন কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের সাবানক ভোট প্রথায় নির্বাচিত হয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপতি ২ জন অ্যাংলো ভারতীয়কে মনোনীত করতে পারবেন। সম্প্রতি লোকসভার সভ্য সংখ্যা ৫৪৫ জন।
- রাজ্য সভার সর্বাধিক সভ্য সংখ্যা ২৫০ জন। এতে সর্বাধিক ২৩৮ জন বিভিন্ন রাজ্যও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে পরোক্ষ নির্বাচিত হন এবং ১২ জন সভ্য রাষ্ট্রপতির দ্বার মনোনীত হন। বর্ত্তমানে র‍্যাজ সভায় ২৪৫ জন সদস্য আছেন।
- সংসদ কেন্দ্র তালিকা , যুগ্ম তালিকা ও কিছু ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের ওপরে আইন প্রনয়ন করে থাকে।
- ভারতের সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় বা সুপ্রিম কোর্ট নিরপেক্ষ ন্যায় পালিকা। এটা সংঘীয় সর্বোচ্চ আদালত। মুখ্য বিচারপতি সমেনত ৩২ জন বিচার পতি নিয়ে এটা গঠিত।
- এর তিন প্রকার ক্ষেত্র ধিকার আছে (ক) মৌলিক ক্ষেত্র ধিকার (খ) আবেদন মূলক ক্ষেত্র ধিকার (গ) উপদেশ মূলক ক্ষেত্রধিকার।
- সংবিধানের রক্ষাকর্ত্তা ভাবে ইহা ন্যায়িক পুনরাবলোকন (Judicial Review) ক্ষমতা উপভোগ করে।

- লাভজনক পদবী ঃ একজন ব্যাক্তি যদি রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্য পাল কিংবা কেন্দ্র বা রাজ্যে মন্ত্রীপদে থাকেন তবে তিনি লাভজনক পদে আছেন বলে ধরা যাবে না।

- মহাভিযোগ ঃ রাষ্ট্রপতিকে যে (অভিযোগ) পদ্ধতিতে বহিস্কৃত করা হয় তাকে মহাভিযোগ বলা হয়।

- সংবিধান ঃ সংবিধান হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আইন সংহিতা। এতে দেশ ও সরকার গঠন, বিভিন্ন অনুষ্টান ও কর্মকর্ত্তাদের স্থিতি, ক্ষমতা প্রকৃতি ও কার্য্যবলী বর্ণিত হয়ে থাকে।

- প্রোরোগ ঃ সংসদের অধিবেশনকে রাষ্ট্র পতি আগামী অধিবেশন পর্যন্ত মুলতবী বা স্থগিত রাখা কে প্রোরোগ বলা হয়।

- মিলিত অধিবেশন ঃ রাজ্য সভার ও লোকসভা মিলিত বৈঠককে সংসদের মিলিত অধিবেশনে বলা হয়। এতে লোক সভার বাচস্পতি সভাপতিত্ব করেন।

- জরুরী পরিস্থিতি ঃ

  ভারতে সংঘীয় শাসন ব্যবস্থা রয়েছে। জরুরী পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে প্রচলিত সাংবিধানিক শাসন ব্যবস্থা বাতিল করে নাগরিক দের মৌলিক অধিকার তথা রাজ্যদের স্বাতন্ত্র্যকে সংকুচিত করার সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র সরকারের ক্ষমতার পরিসর বৃদ্ধি করা হয়ে থাকে। কেন্দ্র মন্ত্রীমন্ডলের পরামর্শে কেবল রাষ্ট্রপতি আমাদের দেশে জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করতে পারবেন। দেশের সুরক্ষা বিপন্ন হলে বা বিপন্ন হবার আশঙ্কা দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করতে পারবেন। এতদ্ ব্যাতীত আবশ্যক স্থলে আরো দুপ্রকার জরুরী পরিস্থিতি যথাঃ রাষ্ট্রপতি শাসন ও অর্থ সম্বন্ধীয় জরুরী পরিস্থিতি ও রাষ্ট্রপতি ঘোষনা করে থাকেন।

- ঝোলা সংসদ ঃ যখন লোকসভায় কোনো একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা হাসিল করতে পারে না তখন ঝোলা সংসদের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

- অনাস্থা প্রস্তাব ঃ কেন্দ্র মন্ত্রী মন্ডল সামগ্রিক ভাবে লোকসভার নিকটে উত্তরদায়ী । তাই যখন বিরোধী দলেরা সরকারের কাজে অসন্তুষ্ট হন, তখন তারা লোক সভাতে অনাস্থা প্রস্তাব আগত করেন। প্রস্তাব বহুমতে গৃহীত হলে সরকার ইস্তাফা দিয়ে দেন।

- সামগ্রিক উত্তর দায়িত্ব ঃ মন্ত্রীমন্ডলের সমস্ত কার্য্যের জন্য সব মন্ত্রী দায়ী। কেউ একজন মন্ত্রী মন্ত্রীমন্ডলের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে গিয়ে মন্ত্রীমন্ডলে থাকতে পারবে না। সেই রকম প্রত্যেক মন্ত্রীর কার্য্যকলাপের জন্য সমগ্র মন্ত্রী মন্ডল সামগ্রিক ভাবে দায়ী। সংসদীয় গনতন্ত্রে মন্ত্রী মন্ডল লোকসভার নিকটে সামগ্রিক ভাবে উত্তর দায়ী।

- যোজনা আয়োগ ঃ আমাদের দেশে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প ত্যাদি সমস্ত প্রকার উন্নতির জন্য অনেক যোজনা প্রস্তত করার জন্য কেন্দ্র স্তরে একটি আয়োগ রয়েছে। তাকে যোজনা আয়োগ বলা হয়। প্রধান মন্ত্রী এর অধ্যক্ষ।

- কাট্ প্রস্তাব ঃ বাজেট আলোচনা করার সময় বিরোধী দলের 'কাট প্রস্তাব' (cut Motion) আগত করে থাকেন। ইহার মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের খর্চা কাট করার জন্য প্রস্তাব আগত করা হয়ে থাকে। 'কাট্ প্রস্তাব' গৃহীত হয়েগেলে সরকার লোকসভায় বহুমত হারিয়েছেন বলে প্রমানিত হয় এবং সরকার ভেঙে যায়। সাধারণত ঃ তিন প্রাকর কাট প্রস্তাব রয়েছে।

- প্রশ্নোত্তর কার্য্যক্রম ঃ সংসদ অধিবেশনের

প্রতিদিনের প্রথম ১ ঘন্টা (সাধারনত বেলা ১১ টা থেকে ১২ পর্য্যন্ত) সময়ের মধ্যে প্রশ্নোত্তর কার্য্যক্রম (Question Hour) অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে সাংসদগন মন্ত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন ও অতিরিক্ত, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং মন্ত্রীরা তার উত্তর দিয়ে থাকেন।

- বাজেট ঃ সরকারের বার্ষিক আয় ব্যায়ের হিসাব নিরুপন করাকে বাজেট বলা হয়। এটা প্রত্যেক আর্থিক বছরের আরম্ভের পূর্বে থেকেই কেন্দ্র আর্থমন্ত্রীর দ্বারা লোক সভায় আগত হয়ে থাকে। এবং সংসদে অনুমোদিত হয়ে থাকে। বাজেটে প্রদত্ত সরকারের বিভিন্ন বিভাগের খর্চাপাতি সংসদ দ্বারা গৃহীত হবার পরে সরকার ব্যায় বরাদ্দ করে থাকেন।

- শূন্যকাল (Zero Hour) ঃ সংসদ পরিচালনার জন্য উদ্ধিষ্ট নিয়মাবলীতে শূন্য কালের (Zero Hours) বিষয়ে কিছু লিখিত হয়নি। এটি একটি সংসদীয় পরম্পরা। শূন্য কাল সাধারনতঃ প্রশ্নোত্তরে কার্য্য ক্রমের পরে আরম্ভ হয়ে থাকে। এটা মধ্যাহ্ন ১২ টা থেকে ১ টা বা মধ্যাহ্ন ভোজনের বিরতি পর্য্যন্ত চলতে থাকায় একে শূন্যকাল (Zero Hours) বলা হয়। মাঝে মাঝে এটা ১০/১৫ মিনিটে শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত ঃ এই সময়ে গৃহের নির্দ্ধারিত কার্য্য ক্রম স্থগিত রেখে, সর্ব সাধারনের স্বার্থের দৃষ্টিতে অন্তত জরুরী বিষয়ে যে কোনো সভ্য যে কোনো প্রশ্ন করতে পারনে। একই সঙ্গে একাধিক সদস্য কিছু বলতে ও দেখা যায়। গৃহ পরিচালনার সাধারন নীতি নিয়ম এই সময় কেউ পালন করেনা।

- সংঘীয় রাষ্ট্র ঃ যে রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্র সরকার ও অনেক গুলি রাজ্য সরকার থাকেন এবং তাদের মধ্যে লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টন করা হয়ে থাকে, সেই রাষ্ট্রকে সংঘীয় রাষ্ট্র বলা হয়। আমেরিকা হচ্ছে বিশ্বের প্রথম সংঘীয় রাষ্ট্র।

নামেই কার্য্য পালিকা ও বাস্তব কার্য্যপালিকা ঃ

- যে রাষ্ট্র প্রধানের হস্তে সংবিধান সমস্ত কার্য্য পালিকা ক্ষমতা ন্যাস্ত করে থাকে, কিন্তু মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ বিনা তিনি নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারেন না, তাকে নামেই কার্য্য পালিকা বলা হয়। যথা ভারতের রাষ্ট্রপতি ও ইংল্যান্ডের রানী।

- যে শাসন প্রধান বাস্তবে সমস্ত কার্য্যপালিকার ক্ষমতা ও যাদের নির্দেশের সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাকে বাস্তবকার্য্য পালিকা বলা হয়। যথা ভারতের প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রীমন্ডল এবং ইংল্যান্ডের প্রধান মন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ।

- সাধারণত ঃ সংসদীয় সরকারে উপরোক্ত দুই প্রকারের কার্য্যপালিকা থাকেন।

রাষ্ট্রপতির সরকারী বাস ভবনের নাম "**রাষ্ট্রপতি ভবন**"।

প্রশ্নাবলী

১) প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ১০ টি শব্দে লেখ।

ক) রাষ্ট্রপতি কিভাবে বহিস্কৃত হন?

খ) রাষ্ট্রপতির প্রশাসনিক ক্ষমতা বুঝিয়ে লেখ।

গ) রাষ্ট্রপতির জরুরী কালীন ক্ষমতা কি?

ঘ) উপরাষ্ট্রপতির কার্য্য কি?

ঙ) প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যবলী বর্ননা কর।

চ) কেন্দ্র মন্ত্রী মন্ডলের কার্য্য কি?

ছ) লোক সভার গঠন ও কার্য্যবলী বর্ণনা কর।

জ) রাজ্য সভার গঠন ও কার্য্যবলী বর্ননা কর।

ঝ) সংসদে সাধারণ বিল কি ভাবে গৃহীত হয়?

ঞ) লোকসভার বাচস্পতির ক্ষমতা ও কার্য্য কি?

ট) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার লিখে বোঝাও।

২। নিম্ন লিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখ।

ক) ভারতের সাংবিধানিক রাষ্ট্রপ্রধান কে?

খ) রাষ্ট্রপতি রাজ্যসভাকে কোন ব্যাক্তি বিশেষদের মনোনীত করেন?

গ) লোক সভাকে রাষ্ট্রপতি কতজন সভ্য মনোনীত করেন ও তাঁরা কোন বর্গের?

ঘ) কোন কারনে রাষ্ট্রপতি কে বহিষ্কার করা যেতে পারা যাবে?

ঙ) রাষ্ট্রপতি রাজ্য সভায় কতজন সভ্যকে মনোনীত করেন?

চ) লোক সভায় সর্বাধিক সদস্য সংখ্যা কত?

ছ) লোক সভায় কে অধ্যক্ষতা করেন?

জ) রাজ্য সভার সভ্য হবার জন্য সর্বনিম্ন বয়স সীমা কত?

ঝ) রাষ্ট্রপতির কার্য্য কালে কত বছর ?

ঞ) কেন্দ্র মন্ত্রী মন্ডলের বৈঠকে কে অধ্যক্ষতা করেন ?

ট) ঝোলা সংসদ কি ?

ঠ) রাষ্ট্রপতি কখন অধ্যাদেশ জারি করেন ?

ড) ফোরাম বলতে কি বোঝায় ?

ঢ) কেন্দ্র মন্ত্রীমন্ডল কিভাবে গঠিত হয়

ন) সংসদের মিলিত অধিবেশনে কে অধ্যক্ষতা করেন ?

ত) রাজ্য সভার সভ্যগন কত বছরের জন্য নির্বাচিত হন ?

থ) অর্থবিল সংসদের কোন গৃহে আগত হয় ?

দ) ভারতের মুখ্য নির্বাচন আযুক্তকে কে নিযুক্তি দেন ?

ধ) ভারতে জরুরী পরিস্থিতি কে ঘোষনা করেন ?

ন) রাষ্ট্র পতির শাসন কোন পরিস্থিতি তে ঘোষনা করা হয় ?

প) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের কে নিযুক্তি দেন ?

ফ) সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিগন কত বছর বয়সে অবসর গ্রহন করেন ?

ব) কোন পরিস্থিতিতে রাষ্টপতির পদ খালি থাকে ?

ভ) কোন পরিস্থিতিতে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পাদন করেন ?

ম) রাষ্ট্রপতি কোন বর্গের ও কতজন ব্যাক্তিকে লোকসভায় মনোনীত করেন ?

য) রাজ্য সভার অধ্যক্ষ কে ?

র) কোন নির্দিষ্ট কারনে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপতিদের পদচ্যুত করা হয় ?

ল) কি ভাবে এবং কার দ্বারা সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচারপতি পদচ্যুত হয়ে থাকে।

ব) কাট প্রস্তাব গৃহীত হলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ?

শ) কেন্দ্র সরকারের বার্ষিক আয়ব্যায়ের বাজেট কে সংসদে আগত করেন ?

ষ) সংবিধান সংশোধন আইন কার দ্বারা গৃহীত হয় ?

স) লোকসভার সদস্য হবার জন্য বয়স গত যোগ্যতা কি ?

হ) কার বিরোধে ও কোন সদনে অনাস্থা প্রস্তাব আগত করা হয় ?

ক্ষ) সংসদের প্রোরোগ ঘোষনা কে করেন ও কখন ?

য়) কোন পরিস্থিতিতে সংসদের মিলতি অধিবেশন ডাকা হয় ?

ল) যোজনা আয়োগের পরিবর্ত্তিত নাম কি ?

৩। বন্ধনীর মধ্যে থেকে ঠিক উত্তর বেছে শূন্যস্থান পূরন কর।

ক) .....আমাদের দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

(জ্ঞানী জৈল সিং, আব্দুল কালাম, সর্বপল্লী ডকটর রাধাকৃষ্ণন, ডকটর রাজেন্দ্র প্রসাদ)

খ) কেন্দ্র মন্ত্রীমন্ডলের মুখ্য কে.....বলা হয়।

(প্রধান মন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, বাচস্পতি, মুখ্যমন্ত্রী)

গ) .....সালে আমাদের দেশরে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় জন্ম লাভ করেছিল।

(১৯২১, ১৯৫০, ১৯০৩, ১৯০৯)

ঘ) উপরাষ্ট্রপতি .....মাসের জন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ভাবে কার্য্যনির্বাহ করেন।

(৩,৪,৫,৬)

ঙ) .....একটি অস্থায়ী সভা

(লোকসভা, রাজ্যসভা, বিধান সভা, এটার মধ্যে কেউ নয়।)

দ্বিতীয় অধ্যায়

রাজ্য সরকার
কার্য্য পালিকা

উপমনিকা ঃ আমাদের সংবিধানে প্রদত্ত সংঘীয় শাসন ব্যবস্থা অনুসারে কেন্দ্রে কেন্দ্র সরকার ও প্রতি রাজ্যে একটি করে রাজ্য সরকার রয়েছে। ভারতে থাকা সর্ব মোট ২৯টি রাজ্যের মধ্যে কেবল জম্মু কাশ্মীর কে বাদ দিলে অন্য সব রাজ্যে সমান ধরনের শাসন ব্যবস্থা রয়েছে।

বস্তুত ঃ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শাসন প্রনালী সমান। কেন্দ্র সরকারের মত প্রতি রাজ্যে এক সংসদীয় গনতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থা রয়েছে। কেন্দ্র সরকারের মত প্রত্যেক রাজ্য সরকারে কার্য্য পালিকা ব্যবস্থাপিকা ও ন্যায় পালিকা রয়েছে। প্রত্যেক রাজ্যের সংবিধানিক শাসন মুখ্য হচ্ছেন রাজ্যপাল। রাজ্যের বিধান সভার নিকটে উত্তরদায়ী থাকা রাজ্য মন্ত্রী পরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করেন।

অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে রাজ্য পালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে। যা সংবিধানের স্বীকৃত। সেই পরিস্থিতিতে রাজ্য পাল মন্ত্রী পরিষদের উপদেশ গ্রহন করতে বাধ্য নন।

রাজ্যপাল ও মুখ্য মন্ত্রী সমেত মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে রাজ্য সরকারের কার্য্য পালিকা গঠিত। রাজ্যের আমলা তন্ত্র এই রাজ্য কার্য্যপালিকার একটি গুরুত্ব পূর্ণ অঙ্গ। সেই রকম রাজ্য ব্যবস্থাপিকা দ্বিসদনীয় রাজ্য বিধান মন্ডলকে বোঝায়। এখানে বলা যেতে পারে যে ভারতের ২৯ টি রাজ্যের মদ্যে থেকে ৭ টি রাজ্য যথা বিহার, মহারাষ্ট্র, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ, জম্মু-কাশ্মীর, আন্ধ্রপ্রদেশ ও তেলেঙ্গানায়, উভয় বিধান সভা ও বিধান পরিষদ রয়েছে। অবশিষ্ট রাজ্যে এবং দুটি কেন্দ্রশাষিত অঞ্চলে যথা দিল্লী ও পুদুচেরী তে কেবল বিধান সভা রয়েছে।

রাজ্যপাল ঃ রাজ্য পাল হচ্ছেন রাজ্যের সাংবিধানিক মুখ্য। তার নামে রাজ্য শাষন পরিচালিত হয়।

তুমি জান কি ?
ওড়িশার দ্রৌপদী মুর্মু (বর্তমানে ঝাড়খন্ডের রাজ্যপাল) হচ্ছেন ভারতের প্রথম আদিবাসী মহিলা রাজ্যপাল।

নিযুক্তি ও কার্য্যকাল ঃ সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছেন। আবশ্যক স্থলে একজন রাজপাল একাধিক রাজ্যের রাজ্য পালের দায়িত্ব নির্বাহ করেন। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির দ্বারা পাঁচবছরের জন্য নিযুক্তি হন। তিনি নির্বাচিত নন। কার্য্যকাল সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে তিনি রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে ইস্তফা পত্র লিখে ইস্তফা দিতে পারেন বা রাষ্ট্রপতির দ্বারা পদচ্যুত হতে পারেন।

একজন ব্যাক্তির একাধিকবার রাজ্যপাল ভাবে নিযুক্তি পাবার বাধা নেই। রাজ্য পালের পাঁচ বছর কার্য্য কাল শেষ

তুমি জান কি ?
পরম্পরা অনুসারে কোনো রাজ্যের অধিবাসী সেই রাজ্যের রাজ্যপাল পদে নিযুক্তি পান না।

হবার সময় নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ না হয়ে থাকলে, নবনিযুক্ত রাজ্যপাল, কার্য্যে যোগদান করা পর্য্যন্ত তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করে যান।

রাষ্ট্রপতির মর্জির ওপরে রাজ্যপাল নিজের পদে থাকেন। কোনো সময় রাজ্যপাল ছুটিতে গেলে কিম্বা অন্য কোনো

কারনে রাজ্যপাল পদ খালি থাকলে, প্রতিবেশী রাজ্যের রাজ্যপাল বা সেই রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ে মুখ্য বিচারপতি অস্থায়ী ভাবে রাজ্য পালের দায়িত্বে থাকেন। নব নিযুক্ত রাজ্য পালকে রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচার পতির শপথ পাঠের মাধ্যমে সংবিধান ও রাজ্যের জন সাধারনের সেবা ও সামগ্রিক মঙ্গলের দিকে নিজেকে নিয়োগ করতে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ করিয়ে থাকেন।

যোগ্যতা ঃ রাজ্যপালের পদে নিযুক্ত হওয়ার জন্য সংবিধান দ্বারা স্থির করা যোগত্য গুলি হল।

১) তিনি ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকবেন।

২) তাঁর বয়স ৩৫ বছরের উর্দ্ধ হয়ে থাক বে।

৩) তিনি কোনো লাভজনক পদে থাকবেন না।

৪) তিনি কেন্দ্র সংসদ কিংবা কোনো রাজ্য বিধান মন্ডলের সাদ্যস হবেন না। যদি কেন্দ্র সংসদ বা রাজ্য বিধান মন্ডলের কোনো সভা রাজ্যপাল পদে নিযুক্ত হয়ে শপথ নেন, তাহলে তাঁর সংসদে বা বিধায়ক পদবী সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাবে।

রাজ্যপালের ক্ষমতা ঃ

১) কার্য্যপালিকার ক্ষমতা) সংবিধান রাজ্য সরকারের সমস্ত কার্য্য পালিকা ক্ষমতা রাজ্যপালের ওপরে ন্যাস্ত করেছে। রাজ্যপাল কেবল সাংবিধানিক শাসন মুখ্য হওয়ায় এই সমস্ত ক্ষমতা তাঁর নামে মন্ত্রী পরিষদ দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

রাজ্য পালের কার্য্য পালিকা ক্ষমতার মধ্যে নিযুক্তি প্রদান ক্ষমতা বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ। রাজ্যে নতুন বিধান সভা গঠনের জন্য নির্বাচন শেষে ফলাফল ঘোষিত হবার পরে, রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর পরামর্শে মন্ত্রী পরিষদের অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন।

বিধান সভায় আবশ্যকীয় সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন পাওয়া দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ভাবে নিযুক্ত করেন। কোনো একটি রাজনৈতিক দল বিধান সভায় আবশ্যকীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হাসিল করতে না পারলে, একাধিক দল মিশে মন্ত্রী মন্ডল গঠন করেন এবং এই জোটবাঁধা দলের নেতাকে সর্বসম্মত ভাবে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করেন।

যদি কোনো একটি রাজনৈতিক দল আবশ্যকীয় সংখ্যা গরিষ্ঠতা হাসিল না করে বা ছোট দলের দ্বারা সমর্থিত নেতার সপক্ষে বিধান সভার অধার্ধিক সভ্যের নিশ্চিত সমর্থন না থাকে এবং একাধিক নেতা নিজের সপক্ষে রাজ্য পালের নিকট বহুমত দাবি করেন, তা হলে রাজ্য পাল নিজের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করে মুখ্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাঁকে এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিধান সভায় নিজের সপক্ষে সংখ্যা গরিষ্ঠতা প্রমান করতে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তবে সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি একটি স্থির সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠা না হতে পারে, তখন রাজ্যপাল সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করতে রাষ্ট্রপতি কে পরামর্শ প্রদান করে থাকনে।

রাজ্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতিদের নিযুক্তির সময়ে রাষ্ট্রপতি রাজ্য পালের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন। রাজ্যের মহাধিবক্তা (Advocate General) এবং রাজ্য লোকে সেবা আয়েগের অধ্যক্ষ এবং সদস্য বৃন্দ রাজ্য পালের দ্বারা নিযুক্ত হন। এছাড়া রাজ্যপাল রাজ্যের বিভিন্ন আয়োগের অধ্যক্ষদের নিযুক্ত দেন। নিজের পদাধিকারের বলে রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতিদের নিযুক্ত করেন। সমস্ত নিযুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে কার্য্য করেন।

যে রাজ্যে দুই কক্ষ বিশিষ্ট বিধান মন্ডল থাকে সে ক্ষেত্রে রাজ্যপাল, কলা সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ সেবা তথা সমবায় ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে থাকা ব্যাক্তিদের মধ্যে থেকে কয়েকজন কে রাজ্য বিধান পরিষদে এক ষষ্টাংশ স্থানের জন্য মনোনীত করেন।

যদি রাজ্যে পালের মনে হয় যে রাজ্য বিধান সভায় অ্যাংলো ইন্ডিয়ার সম্প্রদায়ের যথোচিত প্রতি নিধিত্ব হচ্ছে না তা হলে তিনি উক্ত সম্প্রদায়ের একজন ব্যাক্তিকে বিধান সভায় মনোনীয় করেন।

রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনের সময় রাজ্যপালকে রাজ্য শাসন পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করবার জন্য স্বতন্ত্র পরামর্শ দাতা নিযুক্ত হন। রাজ্যের প্রশাসন সম্পর্কিত সমস্ত নিস্পত্তি ও তথ্য রাজ্য পালকে অবগত করা হচ্ছে প্রধান মন্ত্রীর সাংবিধানিক কর্ত্তব্য। মন্ত্রী পরিষদের দ্বারা নেওয়া সমস্ত নিস্পত্তি ও সব আলোচনার সম্পর্কে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে থাকেন।

ব্যবস্থাপিকা ক্ষমতা ঃ

রাজ্য পাল রাজ্য বিধানমন্ডলের একজন অবিছেদ্দ অংগ। রাজ্য বিধান মন্ডল বলতে রাজ্যপাল। বিধান সভা ও বিধান পরিষদকে বোঝায়। মাত্র সব রাজ্যে বিধান পরিষদ নেই। রাজ্যপাল বিধান মন্ডলের এক বা উভয় গৃহের অধিবেশন আহ্বান করেন। অধিবেশন পরিসমাপ্তি বা প্রোরোগ (Prorog) ঘোষনা করেন এবং প্রয়োজনে তিনি কেবল বিধান সভাকে ভঙ্গ করে থাকেন। তবে সাধারনতঃ এসব ক্ষমতা তিনি মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে ব্যবহার করেন, বিধান পরিষদ একটি স্থায়ী সদন ও এর বিলয় নেই।

নির্বাচন পরবর্ত্তী কালে নবগঠিত বিধান সভার প্রথম অধিবেশন ও প্রতিবছরের প্রধম অধিবেশনের প্রারম্ভে রাজ্যপাল তাঁর লিখিত অভিভাষন বিধান সভায় পাঠ করেন। এতে সরকারের নীতি ও কর্মপন্থা সূচীত হয়ে থাকে। আবশ্যক স্থলে রাজ্যপাল বিধান সভাকে প্রশাসন সম্পর্কিত বার্ত্তা (Massage) প্রেরন করে থাকেন। প্রত্যেক বিল (বিধেয়ক) বিধান সভায় বা বিধান মন্ডলের উভয় গৃহে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে গৃহীত হবার পরে রাজ্য পালের সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হয়। রাজ্যপালের সম্মতি পাবার পরে বিলটি একটি পূর্ণাঙ্গ আইনে (Act) পরিণত হয়। প্রত্যেক অর্থবিলকে রাজ্যপাল সম্পত্তি দিতে বাধ্য । কারন অর্থবিলবিধান, সবায় আগত হওয়ার পূর্বেই রাজ্যপালে প্রাক্ অনুমতি লাভ করে থাকে। এত্দব্যাতীত অন্য সাধারন বিলগুলো রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তার কাছে পাঠানো হলে তিনি নিম্নোক্তর মধ্যে যে কোনো একটি বিকল্প পন্থা গ্রহন করে থাকেন।

১) তিনি সম্মতি প্রদান করেন, ফলে বিলটি পূর্ণাঙ্গ আইনে পরিণত হয়।

২) বিধান মন্ডল বা বিধান সভার পুনঃ বিচারের জন্য তিনি বিলটিকে নিজের বার্ত্তা সহ ফেরৎ দিতে পারেন।

৩) রাষ্ট্রপতির বিচারের জন্য তিনি বিলটিকে সংরক্ষিত রাখতে পারেন।

বিধান মন্ডল বা বিধান সভার পুনঃ বিচারের জন্য ফিরে আসা সাধারন বিল বিধান মন্ডলের পুনঃ বিচারের পরে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য পাঠালে তিনি সম্মতি দিতে নারাজ হন না।

বিধান মন্ডল বা বিধান সভার অধিবেশন চালু না থাকার সময়ে যদি কোনো জরুরী পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য নতুন আইন প্রনয়নের আবশ্যক হয় তখন মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ ক্রমে রাজ্যপাল অধ্যাদেশ জারি করেন।

অধ্যাদেশ হচ্ছে একটি কার্য্যনিবাহী আইন (ordinary), বা অস্থায়ী বা স্বল্পকালীন আইন। বিধান মন্ডলের পরবর্ত্তী অধিবেশ বসার ৬ সপ্তাহের মধ্যে অধাদেশটি বিধান মন্ডলে দ্বারা গৃহীত হওয়া আবশ্যক । নচেত এটি স্বতঃ অকৃতকার্য্য হয়ে যায়। এতদব্যতীত রাজ্য পাল ইচ্ছা করলে যে কোনো সময়ে অধ্যাদেশটিকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন।

অধ্যাদেশ সম্পর্কিত বিষয় বস্তুর ওপর এক স্থায়ী আইন বিধান মন্ডলে গৃহীত হলে অধ্যাদেশটি অকৃতকার্য্য হয়ে যায়।

অর্থ সম্পর্কিত ক্ষমতা ঃ

রাজ্য পালের প্রাক্ অনুমতি বিনা কোনো অর্থ সম্পর্কিত বিল বিধান সভায় আগত করা যায় না। প্রত্যেক আর্থিক বছর আরম্ভ হওয়ার পূর্বে রাজ্যপাল অর্থমন্ত্রীর দ্বারা বিধান সভায় রাজ্যের বার্ষিক আয় ব্যায়ের বাজেট উপস্থাপিত করিয়ে থাকেন। এছাড়া অতিরিক্ত খর্চা পাতি ও রাজ্যপাল অর্থমন্ত্রীর দ্বারা বিধান সভায় আগত করান।

ন্যায়িক ক্ষমতা ঃ

জেলা স্তরের ন্যায়ালয়ের বিচার পতি দের নিযুক্তি রাজ্য পালের ন্যায়িক ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতি দের নিযুক্তির সময় ও রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করেন। রাজ্যপাল রাজে প্রচলিত আইন দ্বারা দন্ডিত অপরাধীদের দন্ড লাঘব করতে পারেন বা দন্ডাদেশ স্থগিত রাখতে পারেন।

বিবিধ ক্ষমতা ঃ

১) রাজ্যপাল রাজ্যে কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি ভাবে কার্য্য সম্পাদন করেন। তাই প্রতি ১৫ দিনে একবার রাজ্যের শাসন সম্পর্কে তিনি রাষ্টপতিকে 'পাক্ষিক রিপোর্ট' প্রদান করেন।

২) সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুসারে কোনো রাজ্যে রাজ্য শাষন চলতে না পারলে সেই রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার জন্য রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৩) রাজ্যে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে তিনি কুলাধিপতি ভাবে অধ্যক্ষতা করেন ও দীক্ষান্ত অভিভাষন প্রদান করেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় সুপরিচালনার জন্য আবশ্যকীয় নির্দ্দেশ নামা জারি করে থাকেন।

৪) রাজ্যপাল হচ্ছেন রাজ্য রেডক্রশ সংস্থার মুখ্য।

৫) বিভিন্ন সভা সমিতি তথা সাংস্কৃতিক কার্যাক্রমে তিনি মুখ্য অতিথি ভাবে যোগদান করেন।

৬) সাধার তন্ত্র দিবসে রাজ্যপাল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার পরে রাজ্য স্তরীয় প্যারেডে অভিবাদন গ্রহন করেন।

৭) তিনি রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা করেন।

৮) তিনি রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রধান বিচার পতিকে শপথ পাঠ করান।

৯) রাষ্ট্রপতির দ্বারা আহূত রাজ্যপালদের বার্ষিক অধিবেশনে রাজ্যপাল যোগ দিয়ে আলোচনায় ভাগ নেন।

স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ঃ

সাংবিধানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী যে ক্ষমতা প্রয়োগ কালীন, রাজপোল মুখ্য মন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শদ্বারা পরিচালিত না হয়ে নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা পরিচালিত হন, সেই ক্ষমতাকে রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বলা হয়। তবে কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল ইচ্ছাধীন ক্ষণতা প্রয়োগ করবেন সেটা তিনি নিজে স্থির করবেন। রাজ্য পালের ইচ্ছাধীন ক্ষমতার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ন্যায়ালয়ে উত্থাপিত হয় না। এই ক্ষমতার পরিসরের সম্পর্কে সংবিধানে কোনো বিশদ আলোচনা হয়নি।

এব্যাপারে রাজ্যপালের নিষ্পত্তি ই চুড়ান্ত

রাজ্যপালের ভূমিকা ঃ

রাজ্যপালের ভূমিকা প্রধানতঃ দুটি একপক্ষে তিনি হচ্ছেন রাজ্য প্রশাসনের সাংবিধানিক শাসন মুখ্য। রাজের সাংবিধানিক শাসন মুখ্য ভূমিকায় নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করার সময়, রাজ্যপাল সংসদীয় গণতন্ত্রের পরম্পরা অনুযায়ী মুখ্য মন্ত্রীন পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করেন।

অপর পক্ষে রাজ্যপাল হচ্ছেন রাজ্যে কেন্ত্র সরকারের প্রতিনিধি। রাজ্যপাল হচ্ছেন রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে যোগসুত্র রক্ষাকারী। তিনি কেন্দ্র সরকারকে রাজ্য প্রশাসন

সম্পর্কে নিয়মিত ভাবে অবগত করে জাতীয় সংহতি ও অখন্ডতা বজায় রাখতে ও কেন্দ্র এবং রাজ্যের মধ্যে সুসম্পর্ক রক্ষা করতে সহায়ক হন। এই ভূমিকায় কার্য্য করার সময়ে রাজ্যপাল অন্য কারও পরামর্শ দ্বারা পরিচালতি না হয়ে নিজের ইচ্ছায় কার্য্য করেন। রাজ্য পালের পদবী মর্যাদা পূর্ণ ও সংবিধান স্বীকৃত, তবে নিজের কার্য্য নৈপুন্য, সাংবিধানিক দায়িত্ববোধ, রাজনৈতিক তথা প্রশাসনিক পরিপক্কতা ও সর্বোপরি বলিষ্ঠ ব্যাক্তিত্ব রাজ্যে পালের পদকে অধিক সম্মানজনক করে থাকে। নিজের ''দ্বৈত ভূমিকা'' য় (Duel Role) রাজ্যপাল নির্বিবাদীয়। হওয়া বাঞ্ছনীয়।

মন্ত্রী পরিষদ ও মুখ্যমন্ত্রী ঃ

মন্ত্রীপরিষদ ঃ

কেন্দ্র সরকারের মত প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে মন্ত্রী পরিষদ রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মন্ত্রী পরিষদের মুখ্য। রাজ্য প্রশাসনের সমস্ত ক্ষমতা সংবিধান দ্বারা রাজ্য পালের হাতে ন্যাস্ত হলেও সংসদীয় গনতন্ত্রের পরম্পরা অনুযায়ী বাস্তবে সেই সব ক্ষমতা রাজ্যপাল মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ ক্রমে প্রয়োগ করেন।

গঠন ঃ

প্রত্যেক রাজ্যবিধান সভার জন্য নির্বাচন শেষ হওয়ার পরে বিধান সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পাওয়া দলের নেতাকে রাজ্য পাল মুখ্যমন্ত্রী ভাবে নিযুক্তি দেন। মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে রাজ্য পাল অন্য মন্ত্রীদের নিযূক্তি দেন। বিধান মন্ডলের সভ্য না হওয়া ব্যাক্তিকে ও মুখ্যমন্ত্রী নিজের মন্ত্রী পরিষদে স্থান দিতে পারেন। এখানে উক্ত ব্যাক্তিকে ৬ মাসের মধ্যে বিধান মন্ডলের বিধান পরিষদ কিংবা বিধান সভায় নির্বাচিত হতে হবে। নচেৎ তিনি তাঁর মন্ত্রী পদ হারাবেন, মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সংখ্যা রাজ্য বিধান সভা বা বিধান মন্ডলের সভ্য সংখ্যার ১৫ শতাংশর চেয়ে বেশী হতে পারবে না, কোনো অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে যদি কোনো একটি দল বা একাধিক দলের প্রাক নির্বাচনী বা নির্বাচন পরবর্ত্তী জোট বিধান সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন পেতে সমর্থ না হয়, তবে সে ক্ষেত্রে রাজ্যপাল এমন এক ব্যাক্তিকে মুখ্যমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করবেন, যে কি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিজের সপক্ষে বিধান সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ সমর্থন থাকার প্রমান দেবেন।

রাজ্য মন্ত্রী পরিষদে সাধারনতঃ তিন ধরনের মন্ত্রী থাকেন। যথা ঃ

১) ক্যাবিনেট মন্ত্রী ২) রাষ্ট্রমন্ত্রী ৩)উপমন্ত্রী। বায়োজেষ্ট , অভিজ্ঞ ও প্রভাবশালী ব্যাক্তিদের ক্যাবিনট মন্ত্রী ভাবে নিযুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে।

এরা সরকারের এক বা একাধিক দায়িত্বে থাকেন। এই ক্যাবিনেট পদের মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত। এটি সরকারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা শালী সংস্থা। ক্যাবিনেট হচ্ছে, মন্ত্রী পরিষদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পরে থাকেন রাষ্ট্রমন্ত্রী তারা সাধারনতঃ ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের সহায়তা করার জন্য নিযুক্ত হন। কিছু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক একটি বিভাগের স্বাধীন দায়িত্ব ও দেওয়া হয়। তাঁদের পরে রইলেন উপমন্ত্রী। উপমন্ত্রীরা ক্যাবিনেট মন্ত্রী ও রাষ্ট্রমন্ত্রীদের কর্ত্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করেন। ক্যাবিনেট পদের মন্ত্রীগন কেবল ক্যাবিনেট বৈঠকে যোগ দেন। প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রমন্ত্রীগন এই বৈঠকে স্বতন্ত্র ভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে যোগ দেন। ক্যাবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারা আহূত হয়। মুখ্য মন্ত্রী ক্যাবিনেট বৈঠকের আধ্যক্ষতা করেন এবং এর কার্য্যসূচী প্রস্তুত করেন। ক্যাবিনেট বৈঠকে নিতে থাকা শাসন সম্বন্ধিয় সমস্ত নিষ্পত্তি সহমতির ওপরে আধারিত ক্যাবিনেট বৈঠকের তারিখ,

সময় ও স্থান, মুখ্যমন্ত্রী নিরূপন করেন।

তোমার জন্য কাজ ঃ
তোমার রাজ্য মন্ত্রী পরিষদের সব মন্ত্রীদের নামের তালিকা প্রস্তুত কর।

রাজ্য বিধান সভার নিকটে সমস্ত কার্য্যের জন্য মন্ত্রী পরিষদ ব্যাক্তি গত ভাবে ও সামগ্রিক ভাবে উত্তরদায়ী। বিধান সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ সদস্যদের বিশ্বাস বা আস্তাভাজন হয়ে থাকা পর্য্যন্ত মন্ত্রীপরিষদ তিষ্টে থাকে। যে মুহুর্তে মন্ত্রীপরিষদ বিধান সভার অধিক সভ্যের আস্থা হারায় সেই মুহুর্তে মন্ত্রী পরিষদ ইস্তফা দিয়ে থাকে।

মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন রাজ্য মন্ত্রী পরিষদের প্রধান। মুখ্য মন্ত্রী ইস্তফা দিলে রাজ্য মন্ত্রী পরিষদের বিলয় ঘটে। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে বিভাগ বন্টন ও বিভাগ অদল বদল করিয়ে থাকেন। মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে মন্ত্রীগন ইস্তফা প্রদান করেন। প্রয়োজনে মন্ত্রীকে বহিষ্কার করার জন্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালকে অনুরোধ করে থাকেন। মুখ্য মন্ত্রীর সুপারিশ ক্রমে রাজ্যপাল মন্ত্রীর ইস্তফা পত্র গ্রহন করেন।

কার্য্যাবলী ঃ

রাজ্য মন্ত্রীমন্ডল বাস্তবে রাজ্য প্রশাসনের সর্বোচ্চ নীতি নির্দ্ধারক। নীতি নির্দ্ধারন করার সহিত নীতি গুলি কিভাবে কার্য্য কারী হবে সে সম্পর্কিত সমস্ত পদক্ষেপ মন্ত্রি পরিষদ নেন। মন্ত্রীগন নিজের নিজের দায়িত্বে থাকা বিভাগ গুলোতে কার্য্যরত অধিকারীদের দ্বারা সরকারী নীতি নিয়ম গুলোকে জনসেবার উদ্দেশ্যে কার্য্যকারী করিয়ে থাকেন।

রাজ্য মন্ত্রী মন্ডলের বৈঠকে অর্থ বিভাগ দ্বারা প্রস্তুত বাজেট এর ওপরে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হয় ও

তোমার জন্য কাজঃ
স্বাধীনতা পরবর্ত্তী ওড়িশার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর নাম লেখ।

এটি অনুমোদিত হয় মন্ত্রী পরিষদেহর বৈঠকে আলোচিত হবার পরে বিভিন্ন সমস্যার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি মুখ্যমন্ত্রী নিয়ে থাকেন।।

সর্বোপরি রাজ্যের সর্ববিধ উন্নতির জন্যে বিভিন্ন প্রকার যোজনা প্রস্তুত করা এবং সে সব সফল ভাবে রূপায়ন করে জন সাধারনের মঙ্গল সাধন করা মন্ত্রী পরিষদের প্রথম ও মুখ্য কাজ। মন্ত্রী পরিষদ বৈঠকে নেওয়া সামগ্রিক নিষ্পত্তি কে সমস্ত মন্ত্রী মানতে বাধ্য।

যদি কোনো মন্ত্রী ভিন্ন মত পোষন করেন সামগ্রিক নিষ্পত্তিতে ভাগীদার না হল তবে তিনি মন্ত্রী পরিষদ থেকে ইস্তফা দিয়ে থাকনে।

মুখ্যমন্ত্রী ঃ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীমন্ডল রাজা স্তরে শাসন কার্য্য পরিচালনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন বিধান সভার নেতা ও সর্বোপরি রাজ্য বাসীর নেতা।

নিযুক্তি ও কার্য্যকাল ঃ সাধারন নির্বাচনের পরে বিধান সভায় থাকা সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ভাবে নিযুক্তি করেন। মাঝে মাঝে বিধান সভার সভ্য না হওয়া ব্যাক্তি ও বিধান সভার সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী ভাবে নিযুক্ত হন। কিন্ত তিনি ৬ মাসের মধ্যে বিধান সভায় নির্বাচিত না হতে পারলে;, তাকে মুখ্যমন্ত্রী পদ ত্যাগ করতে হয়।

মুখ্যমন্ত্রী সমেত মন্ত্রী পরিষদ বিধান সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ সভ্যদের আস্থাভাজন হয়ে থাকা পর্যন্ত তিনি নিজের পদে থাকেন। তিনি যে কোনো সময় রাজ্যপালকে নিজের ইস্তফা পত্র প্রদান করে পদত্যাগ করতে পারবেন।

এতদব্যাতিত রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে মুখ্য মন্ত্রী সমেত মন্ত্রী পরিষদকে বরখাস্ত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী ইস্তফা দিলে মন্ত্রী পরিষদের বিলয় ঘটে।

কার্য্যবলী ঃ মুখ্যমন্ত্রীর কার্য্যবলী বিবিধ ও ব্যাপ্ত।

১) মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদ ঃ

মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন মন্ত্রী পরিষদের সৃষ্টি স্থিতি এবং বিলয়ের

আধার। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে অন্য মন্ত্রী গন নিযুক্ত হন। মন্ত্রীদের পদ ও তাদের মধ্যে বিভাগ বন্টন মুখ্য মন্ত্রীর ইচ্ছে মত হয়। মুখ্য মন্ত্রী ইচ্ছে করলে যে কোনো মন্ত্রীর বিভাগ পরিবর্ত্তন করতে পারেন। এমন কি কোনো মন্ত্রীকে ইস্তফা দিতে নির্দেশ দিতে পারেন ও তাঁর পরামর্শ ক্রমে রাজ্যপাল উক্ত মন্ত্রীর ইস্তফা গ্রহন করেন। তিনি বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করেন এবং মন্ত্রীদের মধ্যে উদ্ভব হওয়া বিবাদের সমাধান করেন। মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের অধ্যক্ষ। তিনি মন্ত্রী মন্ডলের বৈঠক আহ্বান করেন। কার্য্য সূচী নির্দ্ধারন করেনএবং বৈঠকে অধ্যক্ষতা করেন। বিভিন্ন গুরুত্ব পূর্ণ সমস্যার ওপরে তিনি মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি মন্ত্রী মন্ডলের বৈঠকের নিষ্পত্তি রাজ্য পালকে জানিয়ে দেন।

২) মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপাল ঃ

মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে রাজ্যপাল ও মন্ত্রী পরিষদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষাকারী। মুখ্য মন্ত্রী ও মন্ত্রী মন্ডলের পরামর্শ অনুসারে রাজ্য পাল তাঁর কার্য্য সম্পাদন করেন। অপর পক্ষে রাজ্যপাল দিয়ে থাক। প্রস্তাবের ওপর মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রী মন্ডলের বৈঠকে মন্ত্রীদের সঙ্গে বিচার আলোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যশাসন সম্পর্কে রাজ্যপালকে সর্বদা অবগত করে থাকেন।

৩) মুখ্যমন্ত্রী ও বিধান সভাঃ

মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন বিধান সভার নেতা। বিধান সভার নেতা ভাবে মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভার সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেন। বিধান সভায় তিনি সরকারের নতুন নীতি ও যোজনা গুলি ঘোষনা করেন। বিধান সবার কার্য্যসূচী নির্দ্ধারন করার সময় বাচস্পতি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন। দ্বি-সম্বনীয় বিধান মন্ডল থাকা রাজ্যতে মুখ্য মন্ত্রীও দ্বিসদনের (বিধান পরিষদ) সঙ্গে যোগ সুত্র রক্ষা করেন। মুখ্য মন্ত্রী বিধান সভায় বিরোধী দনের নেতা ও অন্যদলের নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে থাকেন।

৪) মুখ্যমন্ত্রী ও শাসক দল ঃ

মুখ্য মন্ত্রী হচ্ছেন নিজের দল তথা শাসক দলের নেতা। কখনো কখনো মুখ্যমন্ত্রীও নিজ দলের সভাপতি হয়ে থাকেন। তিনি শাসক দলের সাদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার সম্পর্কে বিচার আলোচনা করার সঙ্গে দলের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করেন।

৫) মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য প্রসাসন ঃ

মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাক্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা দ্বারা রাজ্য প্রসাসন বিপুল ভাবে উপকৃত ও প্রভাবিত হয়। রাজ্য সরকারের মুখ্য শাসন কর্ত্তা হিসেবে বাস্তবে মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন নীতি নিয়ম প্রনয়ন করার নেতৃত্ব নেওয়ার সঙ্গে সেসব কিভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য্যকারী হতে পারবে, তার প্রতি সজাগ থাকেন। রাজ্যে দৈবদুর্বিপাক বা আপাত কালীন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে মুখ্য মন্ত্রী প্রশাসনকে ত্বরান্বিত করে সমস্যার সম্মুখীন হন ও সমস্যার সমাধান করেন। তিনি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করে জনসাধারনের সুবিধা অসুবিধা উপলব্ধি করে বিহিত প্রতিকারের বিধান করেন। আবশ্যক স্থলে প্রধান মন্ত্রী ও কেন্দ্র সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা গুলোর সমাধান করার চেষ্টা করে।

৬) মুখ্য মন্ত্রী ও রাজ্যের জনসাধারণ ঃ

রাজ্যের সর্বোচ্চ শাসন কর্ত্তা ও রাজ্যের জন সাধারনের প্রিয়নেতা ভাবে রাজ্যের তথা জনতার স্বার্থ কেন্দ্র সরকারের নিকট উচিত ভাবে উপস্থাপিত করা মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান কার্য্য। রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় অনুদানে ব্যবস্থা ও অন্যান্য জাতীয় এবং আর্ন্তজাতিক সংগঠনের মাধ্যমে রাজ্যের বিকাশ মূলক যোজনা গুলো কার্য্য কারী করে লোকেদের সর্বাবিধ উন্নতি সাধন করা মুখ্যমন্ত্রীর অন্য একটি প্রধান কার্য্য। মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগ, আঞ্চলিক পরিষদ, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ, জাতীয় সংহতি পরিষদ ও মুখ্য মন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দিয়ে রাজ্যের সমগ্র স্বার্থ কেন্দ্র সরকারের নিকটে উপস্থাপন করেন।

মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা।

মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছে ন রাজ্য সরকারের শাসন মুখ্য। তিনি মন্ত্রী পরিষদের সহায়তায় রাজ্য শাসনের নিমিত্তে বিভিন্ন নীতি প্রনয়ন করে বিভাগীয় অধিকারীদের দ্বারা সে সব

কার্য্যকারী করান ও বিভাগ গুলোর কার্য্যবলী সমীক্ষা করেন।

মুখ্য মন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের মুখ্য। রাজ্য পালের প্রমুখ পরামর্শদাতা, রাজ্য বিধান সভার নেতা এবং সর্বোপরি একজন জননায়ক ভাবে নিজের দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

মুখ্য মন্ত্রী বিভিন্ন সরকারী তথা সাংস্কতিক কার্য্যক্রমে যোগদিয়ে জনসাধারনকে উদবোধন দেন। স্বাধীনতা দিবস পালন কার্য্য ক্রমে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যস্তরীয় জীতীয় পতাকা উত্তোলন কার্য্যক্রমে যোগ দিয়ে প্যারেড অভিবাদন গ্রহন করেন। মুখ্য মন্ত্রীর সফলতা নির্ভর করে নিম্নোক্ত কয়েকটি পরিস্থিতির ওপরে যথা ঃ ক) মুখ্যমন্ত্রীর ব্যাক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব (খ) মুখ্য মন্ত্রীর প্রতি নিঃসর্ত দলীয় সমর্থন। (গ) মুখ্য মন্ত্রীর নিযুক্তি প্রক্রিয়া (ঘ) কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে থাকা রাজনৈতিক সমীকরন (ঙ) জাতীয় স্তরে মুখ্যমন্ত্রীর ভুমিকা।

রাজ্য বিধান মন্ডল (State Lagistation) ঃ

ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে বিধান মন্ডল রয়েছে। এটি এক সদনীয় বা দ্বি-সদনীয় হয়ে থাকে বিধান মন্ডলের নিম্ন সদনকে বিধান সভা এবং উচ্চ সদনকে বিধান পরিষদ বলা হয়। রাজ্যপাল হচ্ছেন বিধান মন্ডলের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বিহার, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, আন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা এবং জম্মু কাশ্মীর উভয় বিধান সভা এবং বিধান পরিষদ আছে।

অন্য সমস্ত রাজ্যে কেবল নিম্ন সদন বা বিধান সভা আছে। ওড়িশাতে কেবল বিধান সভা আছে। কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল দিল্লী ও পুদুচেরীতেও বিধান সভা আছে।

বিধান সভা গঠন ও কার্য্যকাল ঃ

সম্বিধানের ব্যবস্থা অনুসারে বিধান সভার সভ্য সংখ্যা ৫০০ র বেশী কিম্বা ৬০র কম হতে পারবে না। কিন্তু জনসংখ্যার স্বল্পতা দৃষ্টিতে সিকিম, বিধান সভা ৩২ আসন বিশিষ্ট। গোয়া, অরুনাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম বিদ্বান সভার সভ্য সংখ্যা ৪০ জন করে।

ওড়িশা বিধান সভার মোট সভ্যসংখ্যা ১৪৭ জন। তন্মধ্যে ২২টি আসন অনুসূচিত জাতি (S.C.) এবং ৩৪টি আসন অনুসুচিত জনজাতি (S.T.) এর জন্য সংরক্ষিত। অবশিষ্ট ৯১ টি আসন সাধারন বর্গের জন্য উদ্দিষ্ট। বিধান সভার সভ্যরা রাজ্যের ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে সাবালক ভোটদান ব্যাবস্থার মাধ্যমে নির্বাচিত হন। ১৮ বছরের অধিক বয়স্ক সমস্ত সাবালক নাগরিক ভোটদাতা

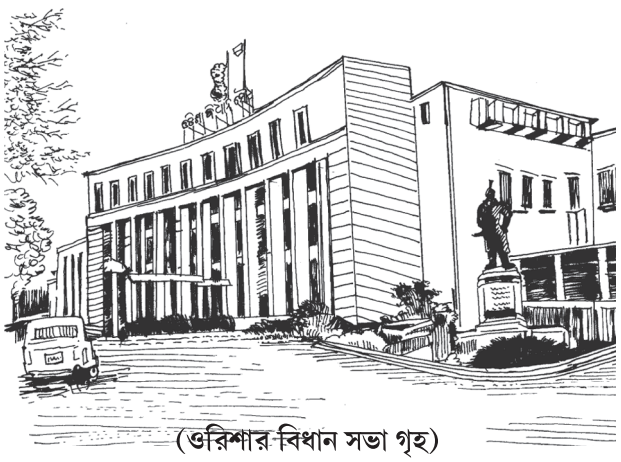

(ওরিশার বিধান সভা গৃহ)

ভোটার হিসেবে নিজের মতদান, অধিকার সাব্যস্ত করে নির্বাচনের মাধ্যমে নিজনিজ নির্বাচন মন্ডলীর একজন প্রার্থীকে বিধায়ক (M.L.A.) ভাবে নির্বাচিত করেন। সাধারনতঃ প্রতি পাঁচ বছর ব্যবধানে বিধান সভা গঠিত হওয়ার জন্য নির্বাচন হয়।

বস্তুতঃ বিধান সভার কার্য্যকাল ৫ বছর। জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি জারি হওয়ার সময় এর কার্য্যকাল সংসদের আইন দ্বারা আরও ১ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যেতে পারে। মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে রাজ্য পাল পাঁচ বছরের পূর্বেই বিধান সভা ভঙ্গ করে থাকেন।

বিধান সভার সভ্য পদের জন্য যোগ্যতা ঃ

বিধান সবার সভ্য পদের জন্য একজন ব্যাক্তির নিম্নলিখিত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক

১) তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হবেন।

২) তাঁর বয়স ২৫ বছরের কম হবে না।

৩) সংসদ দ্বারা প্রনীত নির্বাচন আইন দ্বারা নির্দ্ধারিত

তোমার জন্য কাজঃ

তোমার জেলার সমস্ত নির্বাচন মন্ডলী এবং সব বিধায়কদের নামের তালিকা কর।

হওয়া অন্য সমস্ত যোগ্যতা তাঁর থাকবে।

কোনো লাভজনক পদে থাকলে বা দেউলিয়া বা মস্তিষ্ক বিকৃত হলে, যে কোনো ব্যাক্তি বিধান সভার সভ্য পদের জন্য অযোগ্য ঘোষিত হয়ে থাকেন।

অধিবেশনঃ

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ক্রমে রাজ্যপাল বিধান সভার অধিবেশন ডেকে থাকেন। সংবিধান অনুযায়ী বিধান সভার দুটি অধিবেশনের মধ্যে ৬ মাসের বেশী বিরতি থাকতে পারবে না। তাই প্রতি বছর বিধান সভার অন্যুন দুটি অধিবেশ হওয়া বাধ্যতা মূলক। বাস্তবে প্রতি বছর বিধান সভার তিনটি অধিবেশন আহুত হয়ে থাকে। যথা বাজেট অধিবেশন বর্ষা কালীন ও শীত কালীন অধিবেশন।

কোরামঃ

বিধান সভায় প্রতিদিন অধিবেশন কার্য্য চালু রাখতে সংবিধানের ব্যবস্থা অনুসারে অতিক্রম গৃহের সর্বমোট সভা সংখ্যার এক দশমাংশ সভ্য গৃহে উপস্থিত থাকা আবশ্যক। এই সর্ব নিম্ন সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতি কে কোরাম বলা হয়।

বাচস্পতি ঃ লোকসভার মত বিধান সভার বৈঠকে বাচস্পতি অধ্যক্ষতা করেন। বিধান সভার প্রথম অধিবেশনে গৃহের সভ্যগন তাঁদের মধ্যে একজন সদস্যকে বাচস্পতি ভাবে নির্বাচিত করেন । সাধারনতঃ বাচস্পতি শাসক দলের ও উপবাচস্পতি বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত হয়ে থাকেন ।বিধান সভার নীতি নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত করা এবং বিধান সভার অধিবেশনে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার সঙ্গে সুচারুরূপে অধিবেশন কার্য্য চালানো বাচস্পতির প্রধান কাজ। বিশৃঙ্খলিত আচরনের জন্য বাচসপিতি সভ্যদের গৃহ তেকে বহিষ্কৃত (Expulsion) বা নিলম্বিত করে থাকনে। সভ্যরা বাচস্পতির অনুমতি ক্রমে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। বাচস্পতি বিধান সভার কার্য্য সূচী নির্দ্ধারন করেন। তিনি বিধান সভার কার্য্য পদ্ধতি সম্বন্ধীয় নিয়ম গুলোর তর্জমা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর নিষ্পত্তি (Rulling) চূড়ান্ত।

সভ্যদের অধিকার ও মর্য্যাদার সুরক্ষা করা বাচস্পতির মুখ্য কর্ত্তব্য। বাচস্পতি হচ্ছেন গৃহের নির্বিবাদীয় ও নিরপেক্ষ অধ্যক্ষ। উভয় বাচস্পতি ও উপবাচস্পতি অনুপস্থিত থাকলে অধিবেশন কার্য চালাবার জন্যে এক অধ্যক্ষ মন্ডলী রয়েছে।

বাচস্পতি বিধান সভায় আগত বিভিন্ন প্রস্তাবের বৈধতা এবং সাংবিধানিকতা নির্ণয় করেন।। বিধান সভার অধিবেশন চলার সময়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলে কিম্বা নিয়ম অনুসারে অধিবেশন কার্য্য চলতে না পারলে বাচস্পতি গৃহকে মুলতুবী (Adjourn) রাখেন।

কোনো বিল অর্থবিল কিনা সেটা বাচস্পতি নির্ণয় করেন এবং তাঁর এই নিষ্পত্তি চূড়ান্ত।

বাচস্পতি দলীয় আনুগত্যের উর্দ্ধে থেকে নিরপেক্ষ ভাবে বিধান সভার অধিবেশন কার্য্য পরিচালনা করেন। তিনি সাধারনত ঃ কোনো বিলের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন না। কিন্তু যখন বিলের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে সমান ভোট পড়ে তখন তিনি তাঁর নির্ণায়ক ভোট দিয়ে বিলের ভাগ্য নির্দ্ধারন করেন। বাচস্পতি ও উপবাচস্পতি বিধান সভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত ও বহিস্কৃত হন। তারা লিখিত

ভাবে ইস্তফা পত্র নিখে নিজের পদ থেকে অব্যহতি নিয়ে থাকেন।

বিধান সভার কার্য্যাবলী ঃ

১) আইন প্রনয়ন কার্য্য ঃ

বিধান সবার মুখ্য কার্য্য হলো আইন প্রনয়ন করা। রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকার অন্তভূর্ক্ত বিষয়ে বিধান সভার আইন প্রনয়ন করেন। যে কোনে সাধারন বিল বিধান সভায় নির্দ্ধারিত পদ্ধতিতে গৃহীত হবার পরে রাজ্য পালের সম্মতির জন্য পাঠানো হয় এবং রাজ্য পালের সম্মতি প্রাপ্ত হলে সেটা আইনে পরিনত হয়।

২) অর্থ সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রন ক্ষমতা ঃ

বিধান সভার বিনা অনুমোদনে সরকার একটিও পয়সা খর্চা করতে পারবে না। অর্থ মন্ত্রী বার্ষিক আয়ব্যায়ের বাজেট বিধান সভায় উপস্থাপিত করে থাকেন। বাজেটের ওপর আলোচনা শেষ হবার পরে বিভিন্ন বিভাগের মন্ত্রীরা বিভাগীয় খর্চাপাতির হিসাব বিধান সভায় উপস্থাপন করেন। বিধান সভায় খর্চাদাবি গৃহীত হবার পরে সরকার অর্থব্যায় করেন।

এই প্রকার অর্থ সম্পর্কিত নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে বিধান সভা মন্ত্রী মন্ডলকে নিয়ন্ত্রন করে। বিধান সভার বিনা অনুমোদনে সরকার ট্যাক্স আদায় করতে পারবেন না। অর্থ সম্পর্কিত বিলের আইন কেবল বিধান সভাতেই আগত হয়।

৩। কার্য্য পালিকার ওপরে নিয়ন্ত্রন জাহির করার ক্ষমতা ঃ

বিধান সভা লোকেদের দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। তাই বিধান সভার সভ্যরা মন্ত্রী পরিষদের ওপরে বিভিন্ন প্রকারে নিয়ন্ত্রন জারি করেন।

মন্ত্রী পরিষদ বিধান সভার নিকটে সামগ্রিক ভাবে উত্তরদায়ী। বিধান সভার সভ্যরা প্রশ্নউত্তর কার্য্য ক্রমে মাধম্যে এবং মুলতবী প্রস্তাব ও ধ্যান আকর্ষন কারী প্রস্তাবের মাধ্যমে মন্ত্রী মন্ডলকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন। এছাড়া বাজেট আলোচনার সময়ে বিধায়করা মন্ত্রীদের তাঁদের বিভাগের বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে থাকেন। বিভিন্ন কাট্ প্রস্তাবের মাধ্যমে বিধান সভা মন্ত্রী মন্ডলের ওপরে নিয়ন্ত্রন জাহির করে থাকেন। এতদব্যাতীত বাজেট আলোচনার সময় ও খরচাপাতি গৃহীত হবার সময়ে বিধায়করা মন্ত্রীদের তাদের বিভাগ পরিচালনার বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন। বিধান সভায় অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রী পরিষদ ইস্তফা প্রদান করেন।

৪) বিতর্ক ও পর্য্যলোচনা মূলক ক্ষমতা ঃ

বিধান সভায় রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, বানিজ্য প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে সদস্যরা আলোচনা ও পর্য্যালোচনা করেন।

এর ফলে সরকারের নানা দোষ ত্রুটি লোকলোচনে আসে ও সরকার সমালোচিত হন।

৫) সংবিধান সংশোধন সম্পর্কিত ক্ষমতা ঃ

সংবিধানের কয়েকটি ধারার সংশোধনের জন্য আগত বিধেয়ক গুলো অধ্যাধিক রাজ্য বিধান মন্ডলের অনুমোদনের (Reflication) আবশ্যকতা করে থাকেন।

৬) নির্বাচন সম্পর্কিত ক্ষমতা ঃ

ক) বিধান সভার সভ্যগন প্রথম অধিবেশনে তাদের মধ্যে থেকে একজনকে বাচস্পতি এবং অন্য একজনকে উপবাচস্পতি ভাবে নির্বাচিত করেন।

খ) প্রতি ২ বছরে একবার রাজ্যসভার এক তৃতীয়াংশ সদস্যরা নিজ নিজ রাজের বিধান সভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হল।

গ) বিধান সভার নির্বাচিত সভ্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনেও ভাগ নেন। বিধান পরিষদের অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ বিধান পরিষদের সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

৭। বিবিধ ক্ষমতা ঃ

রাজ্য লোকসভা আয়োগের বার্ষিক রিপোর্ট বিধান সভায় গৃহের সদস্যদের গোচরার্থে উপস্থাপিত করা যায়।

বিধান সভায় আইন প্রনয়ন পদ্ধতি ঃ

কোনো আইন প্রনয়ন করার জন্যে প্রস্তাবটি প্রথমে বিলের আকারে সরকারের তরফে বিভাগীয় মন্ত্রীর দ্বারা গৃহের অনুমতি সহ বিধান সভায় আগত হয়। বিল মুখ্যত ঃ দুই প্রকারের যথা ঃ ১) সাধারন বিল। ২) অর্থবিল অর্থ বিল অর্থ সম্পর্কিত বিষয়ে এবং সাধারণ বিল অন্য সমস্ত বিষয়ে আইন প্রনয়ন করার জন্য গৃহে আগত হয়। প্রত্যেক বিল বিধান সভায় প্রথম পাঠ, দ্বিতীয় পাঠ ও তৃতীয় পাঠের মধ্যে দিয়ে গতি করে। তৃতীয় পাঠের স্তরে বিলটি গৃহীত হবার জন্য গৃহের সভ্যদের মতামত নেওয়া হয়। বিলটি সংখ্যাধিক সভ্যদের মতামত নেওয়া হয়। বিলটি সংখ্যাধিক সভ্যদের সমর্থন লাভ করলে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাঁর কাছে পাঠানো হয়।

রাজ্য পালের সম্মতি পাবার পরে বিলটি আইনে পরিনত হয়।

বিধান পরিষদ

বিধান পরিষদ রাজ্যে বিধান মন্ডলের উচ্চ সদন। এটি একটি স্থায়ী গৃহ এর বিলয় নেই। বিধান পরিষদের সভ্যরা ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন এবং প্রতি ২ বছরে এর এক তৃতীয়াংশ সভ্য অবসর গ্রহন করেন।

অন্ধ্রপ্রদেশে, তেলেঙ্গানা, কর্নাটক, বিহার, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও জম্মু কাশ্মীর কে বাদ দিলে অন্য রাজ্যে বিধান পরিষদ নেই। সেই সব রাজ্যে কেবল বিধান সভা আছে ওড়িশায় বিধান পরিষদ নেই। কেবল বিধান সভা আছে।

গঠন ঃ বিধান পরিষদ কিছু পরোক্ষ ভাবে নির্বাচিত ও কিছু মনোনীত সভ্য নিয়ে গঠিত। কোনো বিধান পরিষদের সদস্য সংখ্যা ৪০ র কম বা সেই রাজ্যের বিধান সভার সভ্যসংখ্যার এক তৃতীয়াংশে অধিক হবে না।

নিম্ন মতে বিধান পরিষদের পাঁচ ষষ্ঠাংশ সভ্য নির্বাচিত ও এক ষষ্ঠাংশ সভ্যমনোনীত হয়ে থাকেন।

১) গৃহের এক দ্বাদশাংশ সভ্য রাজ্য মিউনিসিপাল জেলা বোর্ড ইত্যাদি স্থানিয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

২) গৃহের এক দ্বাদশাংশ সভ্য রাজ্যে অন্যুন ৩ বছর ধরে বাস করতে থাকা স্নাতক দের () নিয়ে গঠিত নির্বাচন মন্ডলীর দ্বার নির্বাচিত হন।

৩) গৃহের এক দ্বাদশাংশ সভ্য মাধমিক বিদ্যালয়ে অন্যুন ৩ বছর ধরে শিক্ষাদান করে থাকা শিক্ষকদের নিয়ে গঠিত নির্বাচন মন্ডলীর দ্বারা নির্বাচিত হন।

৪) গৃহের এক তৃতীয়াংশ সভ্য রাজ্য বিধান সভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন।

৫) গৃহের অবশিষ্ট এক শতাংশ সভ্যকে রাজ্যপাল, সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা, সমবায় আন্দোলন এবং সমাজ সেবার ক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে মনোনীত করেন।

যোগ্যতা ঃ

রাজ্য বিধান সভার সভ্য হবার জন্য নিম্নোক্ত যোগ্যতা থাকা আবশ্যক।

১) তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হবেন।

২) তার বয়স অন্যুন ৩০ বছর হয়ে থাকবে।

৩) সংসদ দ্বারা প্রনীত আইনে নির্দ্ধারিত অন্য সমস্ত যোগ্যতা তাঁর থাকবে।

রাজ্য বিধান পরিষদের অধিবেশন কার্য্য পরিচালনার জন্য একজন নির্বাচিত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ থাকেন। যদি বিধান মন্ডলটি দ্বি-সদনীয় হয়, তবে উভয় বিধান সভা ও বিধান পরিষদে বিল গৃহীত হবার পরে রাজ্য পালের সম্মত্তির জন্য পাঠানো হয়। রাজ্য বিধান সভার ক্ষমতা রাজ্য বিধান পরিষদের চেয়ে বেশী।

রাজ্য ন্যায়পালিকা

দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয় ও জেলা স্তরীয় আদালত নিয়ে একটি ত্রি-স্তরীয় ন্যায় পালিকা সংস্থা আমাদের দেশে কার্য্যরত। উচ্চ ন্যায়ালয় এবং জেলা স্তরীয় ন্যায়ালয়দের নিয়ে রাজ্য ন্যায়পালিকা গঠিত।

উচ্চ ন্যায়ালয় ঃ সংবিধানের ২১৪ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একটি উচ্চ ন্যায়ালয় থাকবে। মাত্র দুই কিম্বা ততোঃধিক রাজ্যদের জন্য একটি উচ্চ ন্যায়ালয় গঠন করার .ক্ষমতা সংসদের আছে।

ওড়িশার উচ্চ ন্যায়ালয় কটকে অবস্থাপিত। এটি ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হয়েছে। পূর্বে বিহার ও ওড়িশার জন্য বিহারের পাটনায় একটি উচ্চ ন্যায়লায় ছিল।

গঠন ঃ

প্রতি উচ্চ ন্যায়ালয় একজন প্রধান বিচার পতি এবং একাধিক বিচারপতি নিয়ে গঠিত।

তাঁরা ভারতের রাষ্ট্র পতির দ্বারা নিযুক্ত হন। রাজ্যপাল নবনিযুক্ত বিচার পতিদের শপথ পাঠ করান।

বর্ত্তমান দেশে কার্য্যরত উচ্চ ন্যায়ালয়ের তালিকা প্রস্তুত কর।

বিচার পতিদের যোগ্যতা ঃ

উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিচার পতি ভাবে নিযুক্ত হবার জন্যে একজন ব্যাক্তির নিম্ন লিখিত য্যেগ্যতা থাকা আবশ্যক।

১) তিনি একজন ভারতীয় নাগরিক হবেন।

২) কোনো এক বা একাধিক উচ্চ ন্যায়ালয়ে অন্যুন্য দশ বছর অ্যাডভোকেট রা অধিবক্তা ভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা তাঁর থাকবে কিম্বা ভারত বর্ষের যে কোনো স্থানে অন্যুন দশবছর বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে থাকবেন।

কার্য্যকাল ঃ একবার নিযুক্ত হলে উচ্চন্যায়া লয়ের বিচার পতির া ৬২ বছর পর্য্যন্ত (বয়স) কার্য করেন ও ৬২ বছর বয়সে অবসর গ্রহন করেন। স্বইচ্ছায় বিচার পতিরা

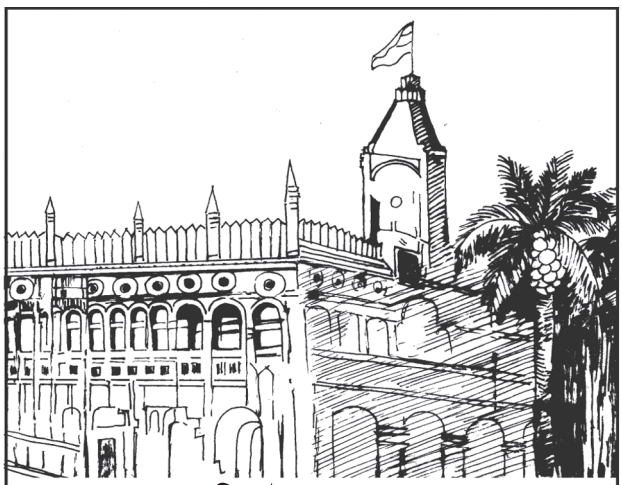

(ওড়িশা উচ্চ ন্যায়ালয়)

রাষ্ট্রপতিকে সম্বোধন করে লিখিত ভাবে নিজের পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারবেন। উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতি রা একটি রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য বদলী হন।

সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় এবং উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতিদের বহিষ্কার প্রনালী বস্তুতঃ সমান। আবশ্যকীয় দুই তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থন পেয়ে সংসদের উভয় গৃহে বহিষ্কার প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্টপতি দ্বারা বিচার পতি পদচ্যুত হন।

তোমার জন্য কাজ ঃ

ওড়িশার উচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য বিচারপতি ও বিচার পতিদের নাম সংগ্রহ কর।

রাজ্য উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার ঃ

১) মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার ঃ

উচ্চ ন্যায়ালয়ে যে সব বিষয়ে সোজা মকদ্দমা দায়েৰ করা যেতে পারবে, সে সব মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার পরিসর ভুক্ত। কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুন্য হলে তিনি সোজা উচ্চ ন্যায়ালয়ে 'রিট' (পরমাদেশ) আবেদন করতে পারবেন। (ধারা ২২৬)। সংসদ, বিধান সভা, ইত্যাদি নির্বাচন সংক্রান্ত মামলা উচ্চ ন্যায়ালয়ে আগত হয়ে থাকে। আদালত অবমাননা, বিবাহ, ছাড়পত্র ইত্যাদি মামলা গুলো ও উচ্চ ন্যায়ালয়ে মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার অন্তর্ভুক্ত।

তুমি জান কি ?
ওড়িশা উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্রধান বিচার পতি কে নিয়ে সর্বমোট ২৭ জন বিচার পতি থাকতে পারবেন।

২) আবেদন মূলক ক্ষেত্রাধিকার ঃ (Appellate Jurisdiction)

আবদেন মূলক ক্ষেত্রাধিকার উচ্চ ন্যায়ালয়ের অন্য এক গুরুত্ব পূর্ণ ক্ষমতা। বিভিন্ন দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় জেলাস্তরীয় বিচার পতির (জেলা সেসনস / জজ্ / দায়রা জজ) রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদন করা যায়। যদি এই মামলা গুলোয় আইনের ব্যাখা করার আবশ্যকতা থাকে।

৩) পর্য্যবেক্ষন ক্ষেত্রাধিকার ঃ

রাজ্যের জেলা স্তরের সমস্ত নিম্ন আদালত উচ্চ ন্যায়ালয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, উচ্চ ন্যায়ালয়ের মুখ্য বিচা রপতি জেলা স্তরের নিম্ন আদালত গুলো পরিদর্শ করেন এবং আবশ্যকীয় নির্দেশ দেন। উচ্চ ন্যায়ালয়ের নিম্ন আদালতের কার্য্য নির্বাহ পদ্ধতি স্থির করেন। নিম্ন আদালতে বিচারাধীন যে কোনো মকদ্দমা নিজের কাছে প্রত্যাহার করে এনে উচ্চ ন্যায়লয়ের বিচার করার ক্ষমতা আছে। এতদব্যাতীত উচ্চ ন্যায়ালয়ে কার্য্যরত কর্মচারীদের চাকরীর সর্তাবলী উচ্চ ন্যায়ালয় দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। পুনশ্চ জেলা জজের নিযুক্তি ও পদন্নোতির সময় রাজ্যপাল উচ্চ ন্যাযালয়ের প্রধান বিচার পতির সঙ্গে পরামর্শ করেন।

নিম্ন আদালত বা অধস্তন আদালত ঃ

রাজ্যের উচ্চ ন্যায়ালয়ের মত জেলা ও সাবডিভিসন বা উপখন্ডে দুপ্রকার ন্যায়ালয় কার্য্য করছে। সেগুলো হল

ক) দেওয়ানী আদালত

খ) ফৌজদারী আদালত

ক) দেওয়ানী আদালত ঃ

জমি জমা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত মকদ্দমা যে আদালতে বিচার করা হয় তাকে দেওয়ানী আদালত বলে। জেলা স্তরীয় জজ্ ও সেসনস () কোর্ট জেলার সর্বোচ্চ দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত। তাই জেলা জজকে ও জেলা দায়রা জজ বলা হয়। দেওয়ানী মামলা বিচারের জন্য জেলা স্তরে জেলা জজ, অতিরিক্ত জেলা জজের আদালত এবং সাবডিভিসন বা উপখন্ড স্তরে সাবজজ এবং মুন্সেফ আদালত রয়েছে।

খ) ফৌজদারী আদালত ঃ

যে আদালত গুলোয় চুরি, ডাকাতি, ধর্ষন, হত্যা ইত্যাদি অপরাধের বিচার করা হয় তাকে ফৌজদারী আদালত বলা হয়। এই সব মকদ্দমার বিচারের জন্য জেলা স্তরে জেলা দায়রা জর্জ, অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ এবং সাবডিভিসন বা উপখন্ড স্তরে সাব ডিভিসনাল জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও প্রথম শ্রেনী এবং দ্বিতীয় শ্রেনী ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত রয়েছে।

লোক আদালত ঃ

আদালত পরিসরের বাইরে বিচার পতিরা বিভিন্ন অঞ্চল গস্ত করে সেখানে লোক আদালত পরিচালনা করে তার মাধ্যমে আপোষ সমাধান ভিত্তিক মকদ্দমার ফয়সলা করে রায় প্রদান করার ব্যবস্থাকে লোক আদালত বলে এর ফলে গ্রামাঞ্চলের লোকেদের অযথা খর্চান্ত হয়ে ব ারম্বার আদালতে দৌড়তে হয় না।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক ঃ

ভারতীয় সংঘীয় ব্যবস্থার উভয় কেন্দ্র রাজ্যের স্বতন্ত্র স্থিতি সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত ও স্থিরীকৃত হয়ে আছে।

উভয় সরকারের মধ্যে সমন্বয় তথা সহযোগে প্রতিষ্ঠার জন্যে তথা তাদের নিজনিজ কার্য্য পরিষরের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে কাজ করতে সংবিধানে কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতে প্রচলিত কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক তিন প্রকার -

১) ব্যাবস্থাপিকা সম্পর্ক

২) প্রশাসনিক সম্পর্ক এবং

৩) অর্থ সম্বন্ধীয় সম্পর্ক

১) ব্যাবস্থাপিকা সম্পর্কঃ

কেন্দ্র সংসদ ও রাজ্য বিধান মন্ডল কোন বিষয়ে আইন প্রনয়ন করবে, তা সংবিধান দ্বারা স্থির করা হয়েছে। সংবিধানে তিনটি তালিকা রয়েছে যথা ক) কেন্দ্রতালিকা খ) রাজ্য তালিকা গ) যুগ্ম তালিকা।

সাধারনতঃ কেন্দ্র তালিকার অন্তর্ভূক্ত বিষয় - প্রতিরক্ষা , রেল, ডাক বিভাগ সম্পর্কে কেন্দ্র সংসদ আইন প্রনয়ন করবে।

রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয় গুলোর সম্পর্কে (যথা কৃষি ও জঙ্গল) রাজ্য বিধান মন্ডল আইন প্রনয়ন করবে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের (যথা বিবাহ, বিচ্ছেদ) ওপর উভয় কেন্দ্র সংসদ ও রাজ্য বিধান মন্ডলের দ্বারা প্রনীত আইনের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়, তা হলে কেন্দ্র সংসদ দ্বারা প্রনীত আইন বজায় থাকবে। কিন্ত রাজ্য বিধান মন্ডল দ্বারা প্রনীত আইনটি যদি রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে থাকে, তবে রাজ্য বিধান মন্ডল দ্বারা প্রনীত আইনটি বজায় থাকবে।

নিম্নোক্ত কয়েকটি স্বতন্ত্র পরিস্থিতিতে সংসদ চাইলে রাজ্যদের জন্য আইন প্রনয়ন করে থাকে। যথা ঃ

ক) যখন ৩৪২ ধারা অনুযায়ী দেশে জাতীয় জরুরী পরিস্থিতি ঘোষনা করা হয়েথাকে।

খ) যখন কোনো রাজ্যে ৩৫৬ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষনা করা হয়ে থাকে।

গ) যখন রাজ্য সভার দ্বি-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিতে সংসদের রাজ্যে তালিকাভুক্ত বিষয়ের ওপর আইন প্রনয়ন করা আবশ্যক মনে হয়।

ঘ) যখন দুই বা ততোধিক রাজ্যের বিধান মন্ডল প্রস্তাব গ্রহন করেন যে সংসদে তাদের জন্য আইন প্রনয়ন করার আবশ্যকতা রয়েছে।

ঙ) যখন কোনো আন্তজার্তিক চুক্তিকে কার্য্যকারী করার জন্য রাজ্য তালিকার বিষয়ে ওপরে আইন প্রনয়ন করা আবশ্যক হয়।

২। প্রশাসনিক সম্পর্কঃ

যেসব বিষয়ের ওপরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার আইন প্রনয়ন করে, সেই সব বিষয়ের ওপরে তাদের যথোচিত প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রন থাকে। তাই কেন্দ্র সরকার এবং রাজ্যসরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতার পরিসর ভিন্ন এবং উভয় সরকার নিজের কার্য্য পরিসরের মধ্যে প্রায়তঃ স্বতন্ত্র এবং স্বয়ং শাসিত। কিন্ত কয়েকটি পরিস্থিতিতে সংঘীয় সমন্বয় রক্ষা করার জন্য কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারদের ওপরে বিভিন্ন প্রসাসনিক নিয়ন্ত্রন জারী করে থাকে।

ক) কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারদের প্রসাসনিক ক্ষেত্রে আবশ্যকীয় নির্দেশ দিয়েথাকেন যে রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের সময় কেন্দ্র সরকারের আইনের বিরুদ্ধাচরন না হওয়া উচিৎ।

খ) জাতীয় তথা সামরিক প্রাধন্য দৃষ্টি থেকে রাজের মধ্যে থাকা যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং রেল ও জল পথের যোগাযোগের নির্মান ও রক্ষনা বেক্ষনের জন্য রাষ্টপতি রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেন।

গ) রাজ্য রাজের মধ্যে বিবাদের সমাধান এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় রক্ষা করতে রাষ্ট্রপতির দ্বারা আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠিত হয়েছে।

ঘ) সমগ্র দেশে প্রশাসনিক একতা ও সমন্বয় বজায় রাখতে কয়েকটি আয়োগ প্রতিষ্ঠা করতে সাংবিধানিক ব্যবস্থা রয়েছে। যথা কেন্দ্র লোক সেবা আয়োগ বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ ও অর্থ আয়োগ ইত্যাদি।

ঙ) সর্ব ভারতীয় প্রশাসনিক সেবা (I.A.S) ও সর্ব ভারতীয় পুলিশ সেবা (I.P.S) র মত সর্ব ভারতীয়

সেবার মাধ্যমে কেন্দ্র প্রশাসন ও রাজ্য প্রশাসন উভয়ে সম্পর্কিত।

চ) রাজ্যপাল সম্মিলনী, মুখ্যমন্ত্রী সম্মিলনী ও বাচস্পতি সম্মিলনীর মাধ্যমে কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকারদের বিভিন্ন নির্দেশ দিয়ে সমগ্র দেশের এক সমন্বিত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছেন।

৩। অর্থ সম্বন্ধীয় সম্পর্কেঃ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আর্থিক সম্পর্ক সংবিধান দ্বারা স্বীকৃত। সাধারনত দক্ষতা প্রাচুয্য এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পদের বন্টন করা হয়।

সাধারনতঃ কেন্দ্র তালিকা ভুক্ত বিষয়ের ওপরে আদায় হওয়া কর বা ট্যাক্স, কেন্দ্র সরকার পেয়ে থাকে। রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের ওপরে আদায় হতে থাকা কর রাজ্যসরকার পান। কিন্ত কেন্দ্র সরকার নিজের সম্পদের কিছুটা অংশ রাজ্য সরকারদের মধ্যে বন্টন করেন।

ক) কিছু কর বা ট্যাক্স কেন্দ্র সরকার বসায়, কিন্ত রাজ্য সরকার আদায়করে সেটা খর্চা করে যথা - স্ট্যাম্প ডিউটি।

খ) কিছু ট্যাক্স কেন্দ্র সরকার বসায় আদায় করে কিন্ত আদায় হওয়া অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে বন্টন করা হয়। যথা - আয়কর।

গ) কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারকে বার্ষিক অনুদান বা গ্র্যান্টস ইনএড্ এবং সমতুল্য অনুদান (ম্যাচিং গ্রান্ট) প্রদান করেন।

ঘ) কেন্দ্র সরকার গরীব রাজ্যদের স্বতন্ত্র গ্র্যান্ট বা অনুদান দেন।

ঙ) অনুসূচীত জাতীয় ও জন জাতির কল্যানের জন্য কেন্দ্র সরকার রাজ্যদের স্বতন্ত্র সাহায্য প্রদান করেন।

চ) রাজ্যে বিভিন্ন প্রকল্প ও যোজনা কার্য্যকারী করার জন্য কেন্দ্র স্বতন্ত্র অর্থ অনুদান দেন।

ছ) সংবিধানের ২৮০ ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বছরে একটি করে অর্থ আয়োগ নিযুক্ত করে অর্থ আয়োগ কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পদ বন্টনের নীতি নির্দ্ধারন করেন।

ভারতে কেন্দ্র রাজ্য সম্পর্ক কে পর্য্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকার অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ব্যবস্থঅপিকা, প্রশাসনিক এবং অর্থ সম্বন্ধীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ওপরে কেন্দ্র সরকারের যথেষ্ঠ অধিপত্য রয়েছে। তাই ভারতকে একটি অর্ধ সংঘীয় রাষ্ট্র বা কেন্দ্রীভূত সংঘীয় রাষ্ট্র (Centralised Fedaration) বলা হয়।

আমরা কি শিখলাম ?

১। রাজ্যের সংবিধানিক শাসন মুখ্য হচ্ছেন রাজ্যপাল ।

২। রাজ্য বিধান সভার নিকটে উত্তরদায়ী থাকা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী পরিষদের উপদেশ ও পরামর্শ অনুসারে তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

৩। কয়েকটি ক্ষেত্রে তাঁর স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা রয়েছে। যেটা তিনি নিজের ইচ্ছা অনুসারে প্রয়োগ করেন এবং মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ গ্রহন করতে তিনি বাধ্য নন।

৪। রাজ্য পাল রাজ্যপ্রশাসনিক সংবিধানিক প্রধান এবং কেন্দ্র সরকারের প্রতিনিধি ভাবে তিনি নিজের ভূমিকা পালন করে থাকেন।

৫। বিধান সভায় সংখ্যা গরিষ্ঠ আসন পাওয়া দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী ভাবে নিযুক্তি দেন ও তার পরামর্শক্রমে অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত করেন ও তাদের মধ্যে বিভাগ বন্টন করেন।

৬। রাজ্য মন্ত্রী মন্ডল বিধান সভার নিকটে উত্তরদায়ী। বিধান সভায় অনাস্থাপ্রস্তাব গৃহীত হলে মন্ত্রী মন্ডল ইস্তফা দিয়ে থাকে।

৭। মুখ্যমন্ত্রীর কার্য্যবলী বিবিধ এবং ব্যাপ্ত।

৮। রাজ্য বিধান মন্ডল রাজ্যপাল বিধান সভা ও বিধান পরিষদকে নিয়ে গঠিত। ভারতের ৭টি রাজ্যে বিধান পরিষদ আছে।

৯। বিধান মন্ডল রাজ্য তালিকায় অন্তর্ভূক্ত বিষয়ের ওপর আইন প্রনয়ন করে। যুগ্ম তালিকার অন্তর্ভূক্ত বিষয়ে উভয় কেন্দ্র সংসদ ও রাজ্য বিধান মন্ডল আইন প্রনয় করতে পারবে।

১০। বিধান মন্ডলের দুটি সদনের মধ্যে নিম্ন সদন বিধান সভা হচ্ছে উচ্চ সদন বিধান পরিষদের চেয়ে শক্তিশালী।

১১। সংবিধানের ২১৪ ধারা অনুযায়ী প্রতি রাজ্যে একটি উচ্চ আদালত থাকে। আবশ্যক স্থলে একাধিক রাজ্যের জন্য একটি উচ্চ আদালত থাকে। প্রতিটি উচ্চ ন্যায়ালয়ে একজন মুখ্য বিচার পতি ও একাধিক বিচার পতি থাকেন। বিচারপতিরা ৬২ বছর বয়সে অবসর গ্রহন করেন।

১২। ওড়িশার উচ্চ ন্যায়ালয় ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত। মুখ্য বিচারপতি সহ ২৭ জন বিচার পতি থাকার ব্যবস্থা আছে। কটকে উচ্চ ন্যায়ালয় অবস্থিত।

১৩। রাজ্য উচ্চ আদালতে মুখ্য বিচারপতি এবং অন্য বিচারপতি গন রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হল।

১৪। এটি মৌলিক ক্ষেত্রাধিকার ও আবেদন মূল ক ক্ষেত্রধিকার উপভোগ করে

১৫। এটি নিম্ন আদালতের কার্য্যবলী পর্যবেক্ষন করে থাকে।

১৬। ভারত একটি সংঘীয় রাষ্ট্র। কেন্ত্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সমন্বয় রাখতে কেন্দ্র ও রাজ্যের সম্পর্ক কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় ১) ব্যবস্থাপিকা ২) প্রশাসনিক ৩ আর্থিক।

১৭। কেন্ত্র সংসদ কেন্দ্র তালিকা , যুগ্মতালিকা এবং নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে রাজ্য তালিকা অন্তর্ভূক্তর বিষয়ে আইন প্রনয়ন করে থাকে।

১৮। রাজ্য বিধান মন্জল রাজ্য তালিকা এবং যুগ্মতালিকার ওপরে আইন করে।

১৯। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকারের নির্দেশে রাজ্য মানতে বাধ্য।

২০। অর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার রাজ্যদের বিভিন্ন প্রকার আর্থিক সাহায্য করে থাকেন ও অর্থ আয়োগের সুপারিশ ক্রমে সম্পদ বন্টন করে থাকেন।

জানার কথা

- রাজ্য কার্য্য পালিকা ঃ ভারতের প্রতি রাজ্যে একটি রাজ্য সরকার রয়েছে। রাজ্য পাল ও মন্ত্রী পরিষদ নিয়ে রাজ্য কার্য্য পালিকা গঠিত।

  কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল ঃ বর্ত্তমানে ভারতে সাতটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে রয়েছে। এই কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ওপরে কেন্দ্র সরকারের অধিক নিয়ন্ত্রন থাকে দিল্লী পুদুচেরী এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ পুঞ্জকে বাদ দিলে অন্য ৪ টে অঞ্চলে রাষ্টপতির দ্বারা নিযুক্ত অ্যাডমিনিস্ট্রেটার শাসন মুখ্য। দিল্লী, পুদুচেরী এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ পুঞ্জের শাসন মুখ্য হচ্ছেন উপরাজ্য পাল (লেফ্টানেন্ট গর্ভনর)

  রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ঃ রাজ্যপাল মন্ত্রী মন্ডলের বিনা পরামর্শ যে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবে সেগুলোকে তাঁর ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলা হয়। এটা সংবিধান স্বীকৃত। যথা ঃ ১) বিধান সভায় কোনো একটি দল বা জোট দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না থাকার বেলায় মুখ্যমন্ত্রী চয়ন করা। ২) রাষ্ট্রপতিকে পাক্ষিক রিপোর্ট পাঠানো।

সমাবর্তন উৎসব ঃ প্রতেক বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন পরীক্ষায় উর্ত্তীন ছাত্র ছাত্রী তথা গবেষকদের উপাধি (Degree) বা সার্টিফিকেট প্রদান করার জন্য প্রতিবর্ষ একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। একে সমাবর্ত্তন উৎসব (Convocation) বলা হয়।

মুলতুবী ঃ সাময়িক ভাবে সভার কার্য্য বন্ধ রাখাকে মুলতূবী বলা হয়।

অর্থ আয়োগ ঃ কেন্দ্র ও রাজ্যদের মধ্যে সম্পদ বা অর্থ বন্টন এবং বিভিন্ন রাজ্য দের প্রদত্ত অনুদানের পরিমান নির্দ্ধারন করার জন্য রাষ্ট্রপতি প্রতি ৫ বছরে একবার একটি আয়োগ নিযুক্ত করে থাকেন তাকে অর্থ আয়োগ বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। প্রত্যেকপ্রশ্নের উত্তর ১০০ টি শব্দে লেখ।

ক) রাজ্যপালের ব্যাবস্থাপিকা ক্ষমতা কি?

খ) মুখ্যমন্ত্রীর কার্য্যবলী বুঝিয়ে লেখ?

গ) বিধান সভা কিভাবে গঠিত হয়?

ঘ) উচ্চ ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রাধিকার বুঝিয়ে লেখ।

ঙ) মন্ত্রী পরিষদের গঠন কি ভাবে হয়?

২। প্রত্যেকপ্রশ্নের উত্তর ৪০ টি শব্দে লেখ।

ক) রাজ্য পালের ইচ্ছাধীন ক্ষমতাগুলি লেখ।

খ) বিধান সভায় আইন প্রনয়ন ক্ষমতা বুঝিয়ে লেখ।

গ) উচ্চল্যায়ালয়ের আবেদন মূলক ক্ষেত্রাধিকার বুঝিয়ে লেখ।

ঘ) বাচস্পতি কখন নির্ণায়ক ভোট দিয়ে থাকেন ?

ঙ) নিম্ন আদালত বলতে তুমি কি বোঝ ?

চ) ফৌজদারী মকদ্দমা কি ?

ছ) দেওয়ানী মকদ্দমা কি ?

৩। নিম্ন লিখিত প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর একটি করে বাক্যে দাও।

ক) রাজ্য পাল কে কে নিযুক্ত করেন ?

খ) রাজ্যপালের কার্য্য কত বছর ?

গ) মুখ্যমন্ত্রীকে কে নিযুক্ত দেন ?

ঘ) বিধান সভায় কে অধ্যক্ষতা করেন।

চ) ওড়িশায় উচ্চ ন্যায়ালয় কোথায় অবস্থিত ?

ছ) উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচার পতিরা কত বছর বয়সে অবসর গ্রহন করেন ?

৪। নিম্নে দেওয়া সম্ভাব্য উত্তররে মধ্যে সঠিক উত্তর বেছে লেখ।

ক) জম্মু কাশ্মীর রাজ্যের জন্য সংবিধানের কোন ধারা অনুযায়ী স্বতন্ত্র ব্যবস্থা প্রদান করা হয়ে।

ক) ৩৭০ খ)৩৭৪ গ)৩৭৮ ঘ) ৩৭২

খ) ভারতের কতটি রাজ্যে দ্বিসদনীয় বিধান মন্ডল আছে ?

ক) ৪ খ) ৫ গ) ৬ ঘ) ৮

গ) রাজ্য সরকারের কোন বিভাগ বাজেট প্রস্তুত করে থাকে ?

ক) শিক্ষা বিভাগ খ) অর্থ বিভাগ গ) স্বাস্থ্য বিভাগ ঘ) গৃহ বিভাগ

ঘ) রাজ্যপাল কতদিনে একবার রাজ্য শাসন সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট প্রদান করেন।

ক)১৫ দিন খ) ২০ দিন গ) ৩০ দিন ঘ) ৬ মাস

ঙ) রাজ্য বিধান সভার কতটি আসন সাধারন বর্গের জন্য উদ্দিষ্ট ?

ক) ৯০ খ) ৯১ গ) ৯৪ ঘ) ৯৫

তৃতীয় অধ্যায়

জেলা প্রশাসন

MSLJGH

প্রশাসনিক সুবিধা দৃষ্টিতে প্রতিটি রাজ্যকে কয়েকটি জেলায় বিভক্ত করা হয়েছে। বর্ত্তমান ওড়িশার জেলা সংখ্যা ৩০। জেলার প্রশাসনিক মুখ্য হচ্ছেন জেলা পাল।

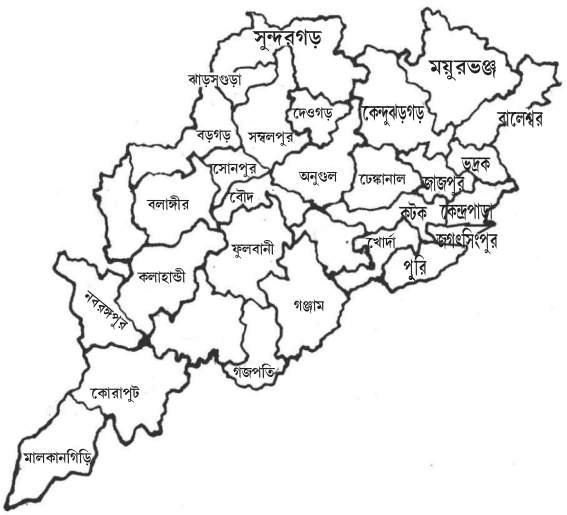

ভারতে এই জেলা পালের পদ ওয়ারেন হেস্টিংশ দ্বারা ১৭৭২ সালে সৃষ্টি করা হয়েছিল। ব্রিটিস শাসন কালে জেলা পালের মুখ্যত দুটি কায্য্য ছিল। একটি হল কালেকটার ভাবে ভূরাজস্ব আদায় করা ও অন্যটি হল ম্যাজিষ্ট্রেট ভাবে মকদ্দমার বিচার করা । স্বাধীনতার পরবর্ত্তী কালে জেলা পালের ক্ষমতার পরিসর বৃদ্ধি পেল। ভারত একটি জনমঙ্গল কারী রাষ্ট্র হওয়ায় দেশের বিকাশ তথা সাধারন লোকের অভাব অসুবিধে পূরণ সম্পর্কিত কার্য্যক্রমে জেলা পালের ভূমিকার গুরুত্ব তথা কার্য্য পরিসর বহু গুনিত হয়ে গেল।

জেলার উন্নয়ন বা বিকাশের সঙ্গে জেলা পাল অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। জেলা পালকে বাদ দিয়ে জেলার উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যেতে পারে না।

জেলা পালের কার্য্যলয় জেলার সদর মহকুমায় অ বস্থিত। জেলাপাল হচ্ছেন জেলা প্রশাসনের সর্বোচ্চ অধিকারী।

প্রশাসনিক সুবিধের জন্য প্রতি জেলাকে কয়েকটি উপখন্ড (সাবডিভিশন) ও প্রতিটি উপখন্ডকে কয়েকটি তহসিলে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি তহসিল শতাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত। জেলার সদর কার্য্যালয়ে জেলা পালকে প্রশাসনিক সহায়তার জন্য এক বা একাধিক অতিরিক্ত জেলা পাল ও অন্য জেলাস্তরীয় অধিকারী ও ডেপুটি কালেকটর কার্য্য রত আছেন। জেলায় থাকা প্রতিটি উপখন্ডের জন্য একজন উপখন্ড অধিকারী (সাব কালেক্টার) ও তহসিল দায়িত্বে একজন তহসিলদার কার্য্যরত আছেন। সাবকালেক্টার সাধারনত ঃ এবং মুখ্যত ঃ ভূরাজস্ব্য ও জমিজমার দায়িত্বে থাকেন।

জেলাপাল পদে একজন সর্বভারতীয় প্রশাসনিক সেবা (IAS) অধিকারী নিযুক্ত হন। ওড়িশার কয়েকটি জেলায় রাজ্য স্তরীয় বরিষ্ঠ প্রশাসনিক সেবা অধিকারীকে ও জেলা পাল ভাবে অবস্থাপিত করা হয়েছে।

জেলাপালের কার্য্যবলী ঃ

জেলাপালের কার্য্যগুলি মুখ্যত ঃ চার প্রকারের যথা ঃ

১) ভুরাজস্ব আদায় ও জমি জমা সম্পর্কিত কার্য্য।

২) শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা ও আইনের সুরক্ষা কার্য্য।

৩) উন্নয়ন বা বিকাশ মূলক কার্য্য

৪) বিবিধ কার্য্য।

১) ভূ-রাজস্ব আদায় ও জমি জমা সম্পর্কিত কার্য্য ।ঃ

জেলা পালের প্রধান কর্ত্তব্য হল ভূরাজস্বস্ব আদায়। উপখন্ড অধিকারী ও তহসিলদারের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে জেলায় ভূরাজস্ব আদায়ের পরিচালনা দায়িত্ব জেলা পালের। এতদব্যাতীত জমি জমা সম্পর্কিত কাগজ পত্রের রক্ষনা বেক্ষন, ভূ-সংস্কার কার্য্য ক্রমের সুপরিচালনা, কৃষির বিকাশ তথা চাষীদের সুরক্ষা, জমি অধিগ্রহন () প্রভৃতি কার্য্যের তদারখের দায়িত্বও জেলা পালের।

বন্যা, দুভিক্ষ, শুখার জন্য শষ্য উৎপাদন ক্ষতি গ্রস্ত হলে জেলা পাল বিহিত পদক্ষেপ নিয়ে থাকনে। জমি জমা সংক্রান্ত কিছু মকদ্দমাও জেলা পাল বিচার করেন।

২) শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ও আইনের সুরক্ষা কার্য্য ঃ

জেলায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব জেলা পালের। জেলা আরক্ষী অধীক্ষক (পুলিশ সুপারিটেনডেন্ট) ও তার অধীনস্ত পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় জেলা পাল জেলায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। জেলা পাল নিজে একজন কার্য্যপালিকা ম্যাজিশেট্রট (executive Magistrate) । শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের আশঙ্খা থাকলে জেলা পাল তৎক্ষনাৎ ওখানে পুলিশ বাহিনী মেতায়ন করে অবস্থা সামলে নেন। ভারতীয় পুলিশ আইনের ক্ষেত্রে জেলা পালকে কিছুটা এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ক্ষমতা প্রদান করেছে। জেলায় থাকা জেল ও উপকারাগার তিনি পরিদর্শন করেন ও তাদের পরিচালনা তদারক করেন। এতদ্ ব্যাতীত জেলার মাসিক অপরাধ রিপোর্ট সরকারকে নিয়মিত পাঠান।

৩) বিকাশ বা উন্নয়ন মূলক কার্য্য ঃ

স্বাধীনতা পরবর্ত্তী সময়ে জেলা পাল দের উন্নয়ন মূলক কার্য্যের পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। জন সাধারনের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসগৃহ, রাস্তা ঘাট গ্রামীন বিদ্যুতীকরন, কর্ম নিযুক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্য্যক্রম জেলা পালের নেতৃত্বে সম্পাদিত হয়। এসব কাজের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রন জেলাপালের হাতে ন্যাস্ত। বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্য্য ক্রম এগিয়ে নেবার জন্য কার্য্যরত জেলাস্তরীয় অধস্তন কর্মচারীদের জেলা পাল নির্দ্দেশ দেন।

জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার (আর.ডি.এ) মুখ্য কার্য্য নির্বাহী অধিকারী ভাবে জেলা পাল সমগ্র জেলায় সমস্ত উন্নয়ন মূলক কার্য্য ক্রমকে ত্বরান্বিত করেন।

মন্ডল উন্নয়ন অধিকারী (বি.ডি.ও) বিভিন্ন প্রকার উন্নয়ন মূলক কার্য্য জেলাপালের নির্দেশ মতে ব্লক বা পঞ্চায়েত সমিতিস্তরে কার্য্যকারী করান। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা অনুমোদিত সমস্ত বিকাশ মূলক যোজনা গুলো জেলা স্তরে সফল রূপায়নের দ্বায়িত্ব জেলা পালের।

৪) বিবিধ কার্য্য। ঃ জেলা পালের অন্যান্য কার্য্য নিম্নে আলোচিত হয়েছে।

ক) নিজের জেলার অন্তভূর্ক্ত লোকসভা ও রাজ্য বিধান সভার নির্বাচন মন্ডলীর জন্য জেলা পাল রিটানিং অফিসার ভাবে কার্য্য করেন। ও নির্বাচন অধিকারী তাকে এই কার্য্যে সহায়তা করেন।

খ) জেলা পাল হচ্ছেন জেলাস্তরীয় মুখ্য জনগনা অধিকারী।

গ) জেলা পাল হচ্ছেন জেলাস্তরীয় মুখ্য প্রোটোকল অধিকারী

ঘ) জেলাপাল জেলার পৌরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চলে থাকা স্বায়ত্ব শাসন সংস্থার গুলির প্রশাসনিক ব্যবস্থা তদারক করেন ও প্রয়োজনে রাজ্য সরকার কে রিপোর্ট দিয়ে সমস্ত বিষয় জানান। পৌর পরিষদ ভঙ্গ করা হলে জেলা পাল পৌর পরিষদের দায়িত্বে থাকেন।

ঙ) জেলা পাল জনসাধারন ও সরকারের মধ্যে যোগ সূত্র রক্ষা করেন।

চ) জন সম্পর্ক তথা সম্বাদ সরবরাহ ও পরিবেষনের ক্ষেত্রে জেলা পালের ভূমিকা ও গুরুত্ব পূর্ণ।

ছ) দৈব দুর্বিপাক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময়ে জেলা পালের দায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

তখন আপৎকালনী সাহায্য (Relief) বন্টন কার্য্য জেলা পালের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত হয়।

জ) প্রয়োজনে জেলাপাল বিভিন্ন সভাসমিতি, সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম, মেলা, মহোৎসবে উপস্থিত থাকেন।

ঝ) জেলায় আবশ্যক সামগ্রীর যোগান তথা জনসাধারনের মধ্যে এর সুষম বন্টন করার দায়িত্ব জেলা পালের।

ঞ) বেসামরিক প্রতিরক্ষা (Civil Defence) জেলা পালের কতৃত্ত্বাধীন কার্য্যক্রম।

ট) জেলায় বিভিন্ন শিল্পানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে উদ্ভব হওয়া পরিবেশ তথা বিজ্ঞাপন ও পুনঃবসতির সম্পর্কিত সমস্যা গুলির আশু সমাধানের দায়িত্ব মুখ্যতঃ জেলা পালের।

ঠ) সর্বশিক্ষা অভিযান, জাতীয় গ্রামীন স্বাস্থ্য মিশন, মহাত্মা গান্ধী নিশ্চিত কর্ম নিযুক্তি যোজনা, স্ব-রোজগার যোজনা, প্রধান মন্ত্রী গ্রাম্য সড়ক যোজনা , ভারত নির্মান যোজনা, বিজু কে. বি. কে যোজনা, গোপবন্ধু গ্রামীন যোজনা, মধুবাবু পেনসন যোজনা প্রভৃতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত জনহিতকর যোজনা গুলোর সফল রূপায়নের দায়িত্ব জেলা পালের হাতেন্যাস্ত।

জেলা পালের ভূমিকা ঃ

জেলাপালের বিভিন্ন ক্ষমতা ও কার্য্যবলীর আলোচনা থেকে এটা প্রতীয়মান হয় যে জেলা পাল রাজ্য সরকারের চক্ষু - কর্ণ-ওনাসার' মত তিনি একজন জন সাধারনের 'বিশ্বস্ত সেবা প্রদান কারী পদাধিকারী ()

জেলা পাল বস্তুতঃ একজন কার্য্য ব্যস্ত পদধিকারী। নিজের ব্যক্তিত্ব সময়ানুবর্ত্তীতা, কর্ম তৎপরতা, কার্য্য দক্ষতা, অধ্যাবসায় জন সম্পৃক্তি তথা জন সহযোগ ও নিজের সেবা মনবৃত্তির জন্যে জেলাপাল গন সফল তার শীর্ষে পৌছেতে পারবে এতে সন্দেহ নেই।

তোমার জন্য কাজ ঃ

১) তোমার অঞ্চলে এক সপ্তাহ ধরে সাংস্কৃতিক কার্য্যক্রম করতে চাইছে। তার জন্যে জেলাপালের অনুমতি পাবার জন্যে একটি দরখাস্ত লেখ।

২) নিজের জেলার জেলা পালের নাম লেখ।

জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থা ঃ (DRDA) (District-Rural Development Agency)

আত্ম নিযুক্তি ও কর্ম নিযুক্তির মাধ্যমে দারিদ্য দূরীকরন হচ্ছে গ্রামীন উন্নয়ন ব্যবস্থার মুলমন্ত্র। বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরন যোজনা সম্বলিত কার্যক্রমের পর্য্যবেক্ষন করার জন্য প্রতি জেলাস্তরে জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার সৃষ্টি। ১৯৭০ সালে ১লা এপ্রিল থেকে প্রাত জেলায় একটি করে গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে আসছে।

বর্ত্তমানের জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থা একটি স্বয়ং চালিত সংস্থা এর নিজের পরিচালনা সমিতি আছে। ভারতীয় সমিতি পঞ্জিকরন আইন ১৯৬০ () অনুসারে এই সংস্থাগুলি পঞ্জিকৃত। আগে জেলার জেলাপাল এই সংস্থার অধ্যক্ষ ভাবে কার্য্য করতেন। মাত্র ১৯৯৩ সালের ৭৩ তম সংবিধান সংশোধন আইনের ব্যবস্থা (জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান) এই সংস্থার পরিচালনা সমিতির () অধ্যক্ষ রয়েছেন ও জেলা পাল এর মুখ্য কার্য্য নির্বাহী অধিকারী () ভাবে কাজ করছেন।

গঠন ঃ

জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ এই জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার অধ্যক্ষ এই সংস্থার পরিচালনা সমিতির অন্য সভ্যগন হলেন।

ক) সেই জেলার সমস্ত সাংসদ ও বিধায়ক।

খ) জেলার সমস্ত পঞ্চায়েত সমিতির এক তৃতীয়াংশ অধ্যক্ষ, যাঁদের কার্য্য কাল প্রতিবছর নিজের নামের বর্ণমালা অনুসারে পরিবর্ত্তিত হবে। তার মধ্যে একজন করে মহিলা, হরিজন ও আদিবাসী সভ্য থাকবেন।

গ) অন্য সভ্যদের মধ্যে থাকবেন, জেলা পাল, সমবায় কেন্দ্র ব্যাঙ্কের মুখ্য অধিকারী, আঞ্চলিক গ্রাম্যব্যাঙ্কের অধ্যাক্ষ, রিজার্ভ ব্যাংকের জেলা স্তরীয় মহিলা ও শিশু মঙ্গল অধিকারী বেসরকারী সংস্থার (NGO) দুজন প্রতি নিধি, খাদি ও গ্রামোদ্যোগ সংস্থার একজন প্রতিনিধি।

জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার প্রকল্প নির্দেশক (প্রোজেক্ট ডাইরেকটার) এই পরিচালনা সমিতির সদস্য সচিব () ভাবে কাজ করবেন।

এই সংস্থার প্রধান লক্ষ তথা উদ্দেশ্য গুলো হল ঃ

১) গ্রাম্য বিকাশ যোজনা গুলো কে মন্ডল উন্নয়ন অধিকারী (BDO)র সহায়তায় নির্দ্দেশিত নিয়মানুসারে কার্য্যকারী করানো।

২) বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা পঞ্চায়েতী রাজ অনুষ্ঠান সমব্যায় ব্যাংক তথা জাতীয়করন ব্যাংক, বিভিন্ন নিগমদের সঙ্গে সমন্বয় ও সহযোগ রক্ষা করে বিভিন্ন বর্গের লোকেদের প্রতক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে উপকৃত করার জন্য উদ্দিষ্ট যোজনা গুলোর সফল রূপায়ন করানো।

৩) জেলা স্তরের বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরন কার্য্য ক্রম গুলোকে সফলতার সহিত কার্য্যকারী করানো ও তার জন্য বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করার জন্য মধ্যস্থতা () করা।

৪) সরকারী নিস্পত্তি গ্রহন প্রক্রিয়ায় গ্রামের দরিদ্র শ্রেনীর লোককে ভাগীদার করতে সহায়ক হওয়া।

৫) নির্দিষ্ট গোষ্টি ও বর্গের ব্যাক্তির মঙ্গল ও বিকাশের জন্য উদ্দিষ্ট গ্রামীন বিকাশ যোজনা গুলোর সফল রূপায়ন কার্য্য তদারক করা।

৬) বিভিন্ন গ্রামীন বিকাশ যোজনা গুলোর নীতি নির্দ্ধারন, প্রস্তুতি তথা কার্য্যকারীতার ক্ষেত্রে আর্থিক স্বচ্ছতা অবলম্বন করার সঙ্গে সম্পৃক্ত কর্মচারীদের কার্য্য তৎপরতার সমীক্ষা করা।

৭) জেলা স্তরে কার্য্যকারী হওয়া সমস্ত গ্রামীন বিকাশ যোজনা গুলোর অগ্রগতি () কে সমীক্ষা করা ও উদ্দিষ্ট বর্গের লোকেরা কিভাবে উপকৃত হচ্ছেন তা পূনঃ নিরীক্ষা করা।

সংস্থার কার্য্যলয় পরিচালনা ব্যাবস্থা ঃ (Office Management)

প্রতিটি জেলাস্তরীয় গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থায নিম্ন লিখিত সাতটি শাখা বা অনুবিভাগ (Section) রয়েছে যথা ঃ

১) আত্মনিযুক্তি শাখা (Self Employment)

২) কর্ম নিযুক্তি শাখা (Wage Employment)

৩) মহিলা শাখা (Women Section)

৪) ইঞ্জিনিয়ারিং শাখা (Engineering Section)

৫) হিসাব রক্ষক শাখা (Accounts Section)

৬) নিয়ন্ত্রন ও মূল্যায়ন শাখা ()

৭) সাধারন প্রশাসন শাখা (General Administration)

উপরোক্ত প্রতিটি শাখা বা অনুবিভাগের দায়িত্বে একজন করে সহকারী প্রকল্প নির্দেশক এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কার্য্য করেন ও বিভিন্ন উন্ননয়ন মূলক যোজনা গুলো কার্য্য কারী করান। তাঁরা সংস্থার পরিচালনা সমিতির নিকটে উত্তরদায়ী।

জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা ঃ

এই সংস্থার একটি কার্য্য নির্বাহী সংস্থা নয়। এই সংস্থা নিজে কোনো দারিদ্র দূরীকরন যোজনা কার্য্যকারী করায় না। অন্যদিকে বিভিন্ন দারিদ্র দূরীকরন যোজনা গুলো কিভাবে সুচারু রূপে কার্য্যকারী হতে পারবে, সেসবের মধ্যে কিভাবে সু-সম্পর্ক ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠা হতে পারবে, যোজনার কার্য্যকারী হবার জন্যে প্রাপ্ত উদিষ্ট অর্থ ও

অনুদানের কিভাবে সৎ উপযোগ হবে এবং তাতে কি ভাবে শংখলা ও স্বচ্ছতা রক্ষা করা যেতে পারবে,

তোমার জন্য কাজঃ

তোমার অঞ্চলে জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার আনুকূল্যে কোন যোজনা কার্যকারী হচ্ছে লেখ।

সর্বোপরি লোকেদের মধ্যে বিভিন্ন বিকাশ মূলক যোজনার সম্পর্ক অধিক সচেতনাতা কি করে সৃষ্টি করা হবে ইত্যাদি সমস্ত দায়িত্ব জেলা গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থার।

সর্বশেষে এইটুকু বলা যেতে পারে যে গ্রামীন উন্নয়ন যোজনা গুলোর সফল রূপায়ন করার জন্য সর্বদা একটি দক্ষ কার্য্য নির্বাহী সংস্থার আবশ্যকতা আছে। সঠিক উদ্দেশ্য ও কর্ম প্রতি বদ্ধতা বিনা কোনো দারিদ্র্য দূরীকরন যোজনা সফলতা পায় না। তাই বিভিন্ন গ্রামীন বিকাশ মূলক তথা দারিদ্র দূরীকরন যোজনার সফলতার দিকে জেলা গ্রামীন উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্ব পূর্ণ।

আমরা কি শিখলাম ?

১। জেলা পাল জেলার সর্ব্বোচ্চ শাসন কর্ত্তা।

২। তিনি রাজ্য সরকারের চক্ষু ও কর্ণ ভাবে কাজ করেন।

৩। জেলাপাল ভূরাজস্ব আদায়, জমি জমার কার্য্য, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা, আইনের সুরক্ষা উন্নয়ন বা বিকাশ মূলক কায্যা ইত্যাদি করে থাকেন।

৪। জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার মুখ্য কার্য্য হচ্ছে বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরন যোজনা সম্বন্ধীত কার্য্য ক্রমের পর্য্য বেক্ষন করা।

জানার কথা

পুলিশ কমিশনারেট ঃ

যে জেলায় পুলিশ কমিশনারেট ব্যবস্থা চালু আছে সেখানে জেলা পাল কমিশনারের সাহায্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন।

১) উপখন্ড ঃ একটি জেলাকে প্রশাসনিক সুবিধের দৃষ্টিতে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। একে উপখন্ড (Sub- Division) বলে।

২) সর্বভারতীয় প্রশাসনিক সেবা ঃ আই. এ. এস. ও আই . পি . এস. কে সর্ব্বভারতীয় প্রশাসনিক সেবা বলা হয়। এই সেবার জন্য সারা ভারতে একটিই সংস্থা যথা - কেন্দ্র লোক সেবা আয়োগ, (UPSC) দ্বারা চয়ন কার্য্য করা হয়।

৩) আরক্ষী অধ্যাক্ষক ঃ জেলার সর্ব্বোচ্চ পুলিশ অধিকারী কে আরক্ষী আধ্যক্ষক (S.P) বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ১০০ টি শব্দে লেখ।

ক) জেলা পালের কার্য্যবলী বর্ণনা কর।

খ) জেলা পালের ভূমিকা বুঝিয়ে লেখ।

গ) আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে জেলা পালের ভূমিকা কি? সংক্ষেপে লেখ।

ঘ) দৈব দুর্বিপাকের সময় জেলা পাল লোকেদের কিভাবে সাহায্য করেন।

ঙ) জেলা পালের উন্নয়ন কার্য্যগুলি কি?

২। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর একটি বাক্যে লেখ।

ক) জেলা প্রশাসনিক মুখ্য কে?

খ) জেলা পালকে রাজ্য সরকারের চক্ষু কর্ণ ও নাসা বলে কেন বলা হয়?

গ) জেলা পাল করে সাহায্যে জেলায় শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেন?

ঘ) জেলা পালকে কেন কালেক্টর বলা হয়? কালেক্টার (জেলাপাল) পদ কবে সৃষ্টি হয়েছিল?

৩। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ৭৫ টি শব্দে লেখ।

ক) জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার কাজ কি?

খ) জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার গঠন কি ভাবে হয়?

গ) জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থা কেন গঠিত হল?

ঘ) গ্রামীন দরিদ্র দূরীকরনে জেলা গ্রাম্য উন্নয়নের সংস্থার ভূমিকা কি?

ঙ) জেলা পরিষদ ও জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক কি?

চ) জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার মুখ্য কার্য্য নির্বাহী অধিকারী কে?

ছ) প্রতি জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থায় কতগুলি অনুবিভাগ রয়েছে? তাদের নাম লেখ?

জ) জেলা গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থার সদস্য সচিব কে?

৪। 'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের যর্থাথ উত্তর মেলাও ঃ

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
জেলা পাল পদ	জনহিতকর কার্য্য
গ্রাম্য উন্নয়ন সংস্থা	আরক্ষী অধীক্ষক
রিলিফ বন্টন	ওয়ারেন হেস্টিংস
জেলার সর্বোচ্চ পুলিশ অধিকারী	দারিদ্র্য দূরীকরন

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের রাজনৈতিক দল ও চাপদায়ী গোষ্ঠী

রাজনৈতিক দলগুলি গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ অংগ। রাজনৈতিক দলবিনা গনতান্ত্রিক সরকার গঠন হতে পারে না। জন সাধারনের রাজ নৈতিক মতামততের পরিপ্রকাশের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিই প্রকৃষ্ঠ মাধ্যম।

রাজনৈতিক দলের বৈশিষ্ট্য হল ঃ

১। কয়েকজন ব্যাক্তি সংগঠিত হয়ে দল গঠন করেন।

২। তাঁরা কিছু নির্দ্দিষ্ট নীতির ওপরে সহমতি প্রকাশ করেন।

৩। তাঁরা জাতীয় স্বার্থ সাধনায় ব্রতী হয়ে থাকেন।

৪। নির্বাচনের মাধ্যমে তারা ক্ষমতা হাসিল করতে এবং ক্ষমতা জাহির করতে উদ্যাম করেন।

৫। প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের সংগঠন নিয়মাবলী পতাকা ও সংকেত আছে।

৬। ভারতের নির্বাচন আয়োগ রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং প্রয়োজনে স্বীকৃতি প্রত্যাহার করেন।

রাজনৈতিক দলের কার্য্যাবলী ঃ

১) দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলো জন সাধারনের সম্মুখে উপস্থাপন করে জনমত ও রাজনৈতিক সচেনতা সৃষ্টি করা ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশ গ্রহন এর দিকে লোকেদের উৎসাহিত করা রাজনৈতিক দলের মুখ্য কার্য্য।

২) রাজনৈতিক দলগুলি লোকেদের ন্যায্য দাবি গুলো একত্রি ত করে সঠিক ভাবে উপযুক্ত সময়ে সরকারের কাছে উপস্থাপন করেন।

৩) রাজনৈতিক দলগুলি জনসাধারনের মধ্যে থেকে তাদের সভ্য বেছে নিয়ে সভ্যদের দলের নীতি ও আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষন দেওয়ার সাথে আগামী প্রজন্মের রাজনেতা সৃষ্টি করতে সাহায্য করেন।

৪) রাজনৈতিক দলগুলি ক্ষমতা হাসিল করতে নির্বাচন লড়েন। তারা নির্বাবনের সময় সভা সমিতি ও প্রচার পত্রের মাধ্যমে জনসাধারনের সামনে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিকল্প উপস্থাপন করেন।

৫) নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলি বহুমত হাসিল করলে সরকার গঠন করেন ও দেশ শাসন করেন। সংখ্যা গরিষ্ঠতা হাসিল করতে না পারলে বিরোধী দল হয়ে সরকারের দোষ ত্রুটি দেখিয়ে সরকারকে সমালোচনা তথা নিয়ন্ত্রন করেন।

৬) রাজনৈতিক দলের সভ্যরা বন্যা, ঝড়, শুখা, ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সময়ে পীড়িত দের সাহায্য যুগিয়ে দিয়েথাকেন।

দলীয় ব্যবস্থা ঃ

সাধারনত তিন প্রকার দলীয় ব্যবস্থা দেখা যায় যাথা ঃ

ক) এক দলীয় ব্যবস্থা খ) দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা গ) বহু দলীয় ব্যবস্থা।

যে দেশে কেবল একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে তাকে এক দলীয় বাবস্থা বলা হয়। যেমন - চীন, রাশিয়া

যে দেশে দুইটি প্রমুখ দল থাকে তাকে দ্বি-দলীয় ব্যাবস্থা

বলা হয়। যথা ইংল্যান্ড, আমেরিকা ।

যে দেশে দুটির অধিক রাজনৈতিক দল দেখা যায় তাকে বহু - দলীয় ব্যাবস্থা বলা হয়। যথা ঃ ভারত, ফ্রান্স। ভারতে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল আছে, যথা ঃ কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট (মাক্সবাদী) পার্টি, সমাজ বাদী দল, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, আন্না ডি.এম.কে., ডি.এম. কে, অকালী দল, শিবসেনা ইত্যাদি।

জাতীয় দল ও আঞ্চলিক দল ঃ

আমাদের দেশের রাজনৈতিক দল গুলি কে সাধারনত ঃ দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যথা ঃ জাতীয় দল, ও আঞ্চলিক দল।

একটি রাজনৈতিক দলকে স্বীকৃতি প্রদান করার জন্যে নির্বাচন আয়োগ দল পেয়ে থাকা ভোটের অনুপাত ও আসনের সংখ্যা বিচারে নিয়ে বিশদ নিয়মাবলী স্থির করেছেন।

আঞ্চলিক দল ঃ

ক) যে রাজনৈতিক দল একটি রাজ্যের ঠিক পূর্ববর্ত্তী বিধান সভা নির্বাচনে সমগ্র সিদ্ধ মত এর অন্যান্য ছয় প্রতিশত ভোট পেয়ে থাকে এবং বিধান সভায় অনুন্য দুটি আসনে জয়ী হয়ে থাকবে। কিম্বা

খ) যে রাজনৈতিক দল রাজ্য বিধান সভার হওয়া পূর্ববর্ত্তী সাধারন নির্বাচনে বিধান সভার মোট আসন সংখ্যার অন্যান্য তিন শতাংশ কিম্বা অন্যুন দুটি (দুটোর মধ্যে যেটা বেশী) আসনে বিজয় লাভ করে থাকবে তাকে একটি আঞ্চলিক দলের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বি.জে.ডি, ডি.এম.কে, তেলেগুদেশম ইত্যাদি এক একটি আঞ্চলিক দল।

জাতীয় দল ঃ

ক) যে রাজনৈতিক দল ঠিক পূর্ববর্ত্তী লোক সভা নির্বাচন বা যে কোনো চারটে রাজ্যের বিধান সভা নির্বাচনে প্রত্যেক রাজ্যে সর্বমোট সিদ্ধমত ( ) এর ছয় শতাংশ ভোট পেয়ে থাকবে এবং লোক সভায় অন্ত ৪ টে আসন পেয়ে থাকবে সেই দল একটি জাতীয় রাজনৈতিক দল ভাবে স্বীকৃতী পায়। কিম্বা।

খ) যে রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা লোক সভার জন্য হওয়া পূর্ববর্ত্তী সাধারন নির্বাচনে সারা ভারতের সংসদীয় নির্বাচন মন্ডলীর অন্তত দুই শতাংশ স্থানে বিজয় লাভ করে থাকবে এবং সেই প্রার্থীরা লোকসভায় অন্তত তিনটি রাজ্য থেকে নির্বাচিত হয়েথাকবে, সেই দল ও জাতীয় দল ভাবে স্বীক;তি পেয়ে থাকে। ভারতীয় জীতীয় কংগ্রেস, ভারতীয় জনতা পার্টি ইত্যাদি জাতীয় রাজনৈতিক দল।

জাতীয় দল গুলি মুখ্যত ঃ সর্ব ভারতীয় সমস্যা, জাতীয় স্বার্থের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েথাকেন। তাদের কার্য্যকলাপ বস্তুতঃ জাতীয় স্তরের। জাতীয় দলের সংগঠন ভারতের সব রাজ্যে রয়েছে। সর্বভারতীয় সংগঠন রাজ্য সংগঠনকে নিয়ন্ত্রন করে এবং রাজ্য স্তরীয় সংগঠন, জেলা, উপখন্ড এবং মন্ডল স্তরীয় (ব্লক) সংগঠনদের নিয়ন্ত্রন করে। সর্ব ভারতীয় দলগুলি প্রায় প্রত্যেক রাজ্য নির্বাচন লড়ে। ভারতীয় জীতীয় কংগ্রেস ভারতীয় জনতা পার্টি, ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি ইত্যাদি জাতীয় রাজনৈতিক দল।

আঞ্চলিক দলগুলি সাধারনতঃ এক একটি রাজ্যে সীমিত। সেগুলো মুখ্যত রাজ্য স্তরীয় সমস্যা সমাধান করার জন্য উদ্দিষ্ট। বিজেডি, ডিএম কে, এ আই ডিম কে, তেলেগুদেশম ইত্যাদি এক একটি আঞ্চলিক দল।

আঞ্চলিক দল গুলি নিজ নিজ রাজ্যে নির্বাচন লড়ে। এখন কার মিলিত সরকার ব্যবস্থায় আঞ্চলিক দল কখনও কখনও কখনও কেন্দ্র সরকারে সামিল হয়। কেন্দ্র সরকারের নিকটে নিজের দাবি উপস্থাপন করার সঙ্গে সঙ্গে সেই দলগুলি অধিক থেকে অধিকতম রাজ্য স্বতন্ত্রতা আবশ্যক করেন।

চাপদায়ী গোষ্ঠী বা চাপ দান কারী গোষ্ঠী (Pressure Group)ঃ

চাপদায়ী বা চাপদানকারী গোষ্ঠী দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া তথা প্রশাসনে প্রধান ভূমিকা গ্রহন করে। এই গোষ্ঠী গুলো প্রত্যক্ষ রাজনীতি বা নির্বাচনী রাজনীতি তে জড়িত না হয়ে নিজেদের গোষ্ঠীর স্বার্থা হাসিল করতে সরকারের নীতি নিদ্ধারন তথা প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। তাই চাপদান কারী গোষ্ঠীকে স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী ও (Interest Group) বলা হয়।

সংজ্ঞা ঃ হ্যারিসের মতে যে স্বার্থন্বেসী গোষ্ঠীর নিজেরা সুযোগ সুবিধা হাসিল করার জন্যে সরকারী নীতি নির্দ্ধারকের ওপরে বিভিন্ন চাপ প্রয়োগ করেন। তাদের কে চাপদায়ী গোষ্ঠী বা চাপদান কারী গোষ্ঠী বলা হয়।

টার্নারের বলা অনুসারে যে অ-রাজনৈতিক সংগঠন গুলি নীতিকে প্রভাবিত করে থাকে তাদের কে চাপদায়ী গোষ্ঠী বলা হয়।

একস্টিন চাপ গোষ্ঠীর এক সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে এক প্রকার মনোভাবাপন্ন, এক প্রকার মুল্য বোধ, এবং স্বার্থে বিশ্বাসী এক সুসংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ সরকারী পদ গ্রহন না করে নিজের স্বার্থ সাধন করতে সরকারী নীতি কে প্রভাবিত করলে তাকে চাপদায়ী বা চাপদান কারী গোষ্ঠী বলা হয়।

চাপদান কারী গোষ্ঠীর লক্ষন নিম্নে প্রদত্ত হল।

১) এটা সমমনোভাবাপন্ন বা সমস্বার্থী ব্যাক্তিদের একটি গোষ্ঠী।

২) এরা কোনো রাজনৈতেক দলের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্পৃক্ত নয়।

৩) স্বার্থ সাধনের লক্ষে এটা একটি অস্থায়ী বা স্থায়ী গোষ্ঠী হয়ে থাকে।

৪) এই চাপদান কারী গোষ্ঠী গুলো প্রত্যক্ষ রাজনীতির ক্ষেত্রে না এসে পর্দ্দার আড়ালে থেকে কাজ করে।

চাপদান কারী গোষ্ঠীর শ্রেনী বিভাগঃ

চাপদানকারী গোষ্ঠীকে সাংগঠনিক এবং কার্য্য শৈলির দৃষ্টিতে চার ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

১) সংঘীয় গোষ্ঠী ()

একটি নির্দিষ্ট কায্যে নিয়োজিত ব্যাক্তিরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের স্বার্থ সাধনের জন্য সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করে থাকে। তাদের সংঘীয় গোষ্ঠী বলাহয়। সংঘীয় গোষ্ঠীর সভ্যরা এক নির্দিষ্ট বৃত্তির সদস্য হওয়ায় একেও বৃত্তি গত সংঘ বলা হয়। যথা বনিক সংঘ, শ্রমিক মহা সংঘ।

২) অ-সংঘীয় গোষ্ঠী ()ঃ

এই গোষ্ঠী গুলি, রক্ত সম্পকীয় ধর্ম সম্পর্ক ও কৌলিক বৃত্তি সম্পর্কের মাধ্যমে একত্রিত হয়ে তাদের কার্য্য বা স্বার্থ সাধনের জন্যে সরকারী নীতিগুলোকে প্রভাবিত করে । যতাঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুক গোষ্ঠী, যাদব মহাসভা স্বর্নকার গোষ্ঠী।

৩) আনুষ্টানিক গোষ্ঠী ()ঃ

এই সংঘ গুলি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে কার্যরত ব্যাক্তিদের নিয়ে গঠিত । তারা আনুষ্ঠানিক স্বার্থের মাধ্যমে নিজেদের স্বার্থ সাধনের জন্য সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টি করে । যথা ঃ আমলাতন্ত্র।

৪) সামাজিক মুল্যবোধ বিরোধী চাপগোষ্ঠী। () ঃ এই গোষ্ঠী কোনো নির্দিষ্ট সামাজিক মুল্য বোধে বিশ্বাস না কার হিংসাত্মক পন্থায় তাদের স্বার্থ সাধনের জন্য কাজ করে । যথাঃ আলফা (), জম্মু কাশ্মীর লিবারেশন (ফ্রন্ট)।

সেই রকম চাপ গোষ্ঠী গুলোকেও তাদের উদ্দেশ্য অনুসারে দুভাবে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ

১) স্বার্থী গোষ্ঠী , ২) জনমঙ্গল কারী গোষ্ঠী

যে সব গোষ্ঠী গুলো জনসাধারনের স্বার্থের প্রতি ভ্রুক্ষেমপ না করে শুধু নিজের স্বার্থ যে কোনে প্রকারে হাসিল করতে উদ্যম করে, তাদের স্বাথী গোষ্ঠী বলা হয়।

যে সব গোষ্ঠী সর্বসাধারনের স্বার্থ সাধনের প্রয়াস করে থাকে তাদের জন মঙ্গল কারী গোষ্ঠী বলা হয়। উদাহরন যথা ঃ বস্তী বাসিন্দা উন্নয়ন সংঘ, কার্য্যকাল অনুসারে চাপদান কারী গোষ্ঠীদের ও দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা ঃ দীর্ঘস্থায়ী ও ক্ষনস্থায়ী গোষ্ঠী।

যে গোষ্ঠী গুলো তাদের চিরস্থায়ী স্বার্থ সাধন নিমিত্ত সংগঠিত হয়ে কার্য্য করেন তাদের কে দীর্ঘস্থায়ী গোষ্ঠী বলা হয়। যথা) সর্ব ভারতীয় শিক্ষক মহাসংঘ।

যে সব চাপদান কারী গোষ্ঠীগুলো ক্ষনিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সংগঠিত হয়ে থাকে এবং নির্দিষ্ট স্বার্থ সাধিত হয়ে গেলে তাদের বিলয় ঘটে সেগুলোকে ক্ষনস্থায়ী গোষ্ঠী বলা হয়। যথা ঃ মহানদী বাচাঁও সমিতি, নর্মদা বাচাও সমিতি।

রাজনৈতিক দল ও চাপদান কারী গোষ্ঠীর মধ্যে সমানতা ও বিভিন্নতা ঃ

উভয় চাপদান কারী গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দল নিজেদের সদস্যদের স্বার্থ হাসিল করতে কার্য্য করে থাকে। রাজনৈতিক দল গুলো রাজনৈতিক স্বার্থ বা ক্ষমতা হাসিল করতে চেষ্টিত হওয়ার সময় চাপদান কারী গোষ্ঠী নিজের অ-রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল করার চেষ্টা করে।

১) রাজনৈতিক দল গুলো আকারে চাপদানকারী গোষ্ঠীর চেয়ে অনেক বড় রাজনৈতিক দলের সভ্য সংখ্যাও অনেক বেশী। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন প্রকার কার্য্যক্রম গ্রহন করে। কিন্তু চাপ দায়ী গোষ্ঠী কেবল নিজের স্বার্থ হাসিল করতে সীমিত কার্য্য ক্রম গ্রহন করে।

২) রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট ইস্তাহার থাকে। এর সভ্যদের বিধিবদ্ধ ভাবে পঞ্জিকৃত করে তাদের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলতে বলা হয়। এবং যে সব সভ্য এর ব্যাতিক্রম করেন তাদের দল থেকে বহিষ্কার করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক দলে নির্দিষ্ট দলীয় পতাকা, দলীয় সংবিধান ও দলীয় সংকেত থাকে। অন্য দিকে চাপদান কারী গোষ্ঠী গুলোর সভ্য সংখ্যা সীমিত। তাদের নির্দিষ্ট পতাকা বা চয়ন পদ্ধতি থাকে না। চাপদান কারী গোষ্ঠী গুলো অনেক সময় পর্দার অন্তরালে থেকে কাজ করেন।

৩) রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করে ক্ষমতা হাসিল করার চেষ্টা সর্বদা করেন। সরকার গঠন বা সরকারে অংশ গ্রহন করা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। রাজনৈতিক দল গুলি পঞ্জিকৃত না হলে নির্বাচন লড়তে পারবে না।

কিন্তু চাপদান কারী গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে দুরে থাকেন। তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করেন না। ক্ষমতা বলয়ের বাইরে থেকে সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করা তাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

৪) একজন ব্যাক্তি এক সময়ে কেবল একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য হয়। কিন্ত একজন ব্যাক্তির বিভিন্ন প্রকার স্বার্থ থাকায় তিনি এককালীন একাধিক চাপদানকারী গোষ্ঠীর সভ্য হয়ে থাকেন। ভারতে কার্য্যরত কয়েকটি চাপদান কারী গোষ্ঠী হল। সর্ব ভারতীয় শ্রমিক সংঘ, সর্ব ভারতীয় শিক্ষক মহাসংঘ, ওড়িশা ডাক্তারী সেবা সংঘ, সরকারী কলেজে শিক্ষক সংঘ, ও নিখিল উৎকল শিক্ষক মহাসংঘ ইত্যাদি।

সর্বশেষে চাপদানকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পূর্ণ। চাপ দানকারী গোষ্ঠীরা বিভিন্ন প্রকারের প্রতিবাদ মূলক মাধ্যমের মধ্যে যথা ঃ ধর্মঘট, বন্ধ পালন, রাস্তা রোকো ইত্যাদির দ্বারা সরকারকে নিজেরর দায়িত্ব সম্পাদন করতে সচেতন করে।

আমরা কি শিখলাম ?

১। রাজনৈতিক দল গনতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ।

২। কিছু বা কয়েকজন সম ভাবাপন্ন ব্যাক্তি এক নির্দিষ্ট জাতীয় স্বার্থ সম্মতি নীতির রূপায়নের জন্য সংগঠিত হয়ে নির্বাচন মাধ্যমে ক্ষমতা হাসিল করতে উদ্যম করলে এটা একটি রাজনৈতিক দলের রূপ নিয়ে থাকে।

৩। প্রতিটি রাজনৈতিক দলের সংগঠন, নিয়মাবলী, পতাকা ও সংকেত রয়েছে।

৪। রাজনৈতিক দল দুই প্রকার জাতীয় ও আঞ্চলিক।

৫। নির্বাচন আয়োগ রাজনৈতিক দলগুলিকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

৬। চাপগোষ্ঠী একটি দলগত গোষ্ঠী মাত্র এরা নিজের নির্দিষ্ট লক্ষ বা স্বার্থ সাধনের জন্য সরকারের ওপরে চাপ দিয়ে থাকে এবং আন্দোলন মূলক অভিমুখ্য গ্রহন করে থাকে।

জানার কথা

১। চাপদানকারী গোষ্ঠী নির্বাচন অংশ গ্রহন করেন।

২। ভারতে নিম্নোক্ত চাপদান কারী গোষ্ঠী কার্য্যরত

ক) সর্বভারতীয় শ্রমিক সংঘ

খ) সর্ব ভারতীয় শিক্ষ মহাসংখ।

গ) ওড়িশা ডাক্তারী সেবা সংঘ

ঘ) সরকারী কলেজ শিক্ষক সংঘ।

ঙ) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সংঘ।

প্রশ্নাবলী

১। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর প্রায় ৬০ টি শব্দে লেখ।

ক) রাজনৈতিক দলের লক্ষন গুলি বর্ণনা কর।

খ) গনতান্ত্রিক ব্যাবস্থায় রাজনৈতিক দলের ভূমিকা আলোচনা কর।

গ) চাপদানকারী গোষ্ঠীর লক্ষনগুলি বুঝিয়ে লেখ।

ঘ) চাপদান কারী গোষ্ঠী কত প্রকার তা সংক্ষেপে লেখ।

২। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর ৩০ টি শব্দে লেখ।

ক) রাজনৈতিক দল কাকে বলা হয়।

খ) জাতীয় রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝ ?

গ) আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল বলতে কি বোঝ ? এর কয়েকটি উদাহরন দাও।

ঘ) চাপদায়ী গোষ্ঠী মুখ্যত ঃ কত প্রকার ?

৩। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর একটি করে বাক্যে দাও।

ক) দুটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের নাম লেখ।

খ) চাপদানকারী গোষ্ঠী মুখ্যতঃ কি প্রকার মাধ্যম অবলম্বন করে সরকারের ওপর চাপ দিয়ে থাকে?

গ) ভারতে রাজনৈতিক দলকে কোন অনুষ্ঠান স্বীকৃতী প্রদান করে?

৪। রেখাংকিত অংশকে পরিবর্ত্তন না করে ভ্রুম সংশোধন কর ঃ

ক) চাপদান কারী গোষ্ঠীর **একটা করে পতাকা আছে।**

খ) চাপদান কারী গোষ্ঠীর **নির্বাচনে অংশ গ্রহন করেন।**

গ) **ভারতে** দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা আছে।

ঘ) সর্বভারতীয় শ্রমিক সংঘ **একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল।**

৫। নিম্নে প্রদত্ত বিকল্প গুলির মধ্যে থেকে ঠিক উত্তর বেছে লেখ।

ক) ইংলন্ডে কোন দলীয় ব্যবস্থা প্রচলিত? এক দলীয়, দ্বিদলীয়, বহুদলীয়, সর্বদলীয়।

খ) আমাদের দেশে নিম্নোক্ত কোনটি একটি জাতীয় দল? ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, বিজেডি, তৃনমূল কংগ্রেস , বিজেপি।

গ) একদলীয় ব্যবস্থা নিম্নোক্ত কোন দেশে প্রচলিত ? পাকিস্তান, চীন, আমেরিকা ইংল্যান্ড।

অধিক জানার কথা

১।	ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ঃ	ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ
২।	ভারতের প্রথম উপরাষ্ট্রপতি	ড. সর্বপল্লী রাধা কৃষ্ণান
৩।	ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী	পন্ডিত জবাহার লাল নেহেরু
৪।	ভারতের প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি	শ্রীমতি প্রতিভা দেবী সিংহ পাটিল
৫।	ভারতের প্রথম মহিলা প্রধান মন্ত্রী	শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী
৬।	ভারতীয় রাজ্যের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী	শ্রীমতী সুচেতা কৃপালিনী
৭।	ভারত প্রদেশের প্রথম মহিলা রাজ্যপাল	শ্রীমতি সরোজিনী নাইডু
৮।	সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচার পতি	মান্যবর বিচারপতি এত্ এল কানিযা
৯।	ওড়িশার প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী	শ্রমতি নন্দিনী সতপথী
১০।	ওড়িশার প্রথম রাজ্যপাল	স্যার জন্ অষ্টিন হবাক
১১।	লোকসভার প্রথম বাচস্পতি	শ্রীযুক্ত গনেশ বাসুদেব মাভলংকর
১২।	দেশের প্রথম সাধারন নির্বাচন (লোকসভা)	১৯৫১-৫২
১৩।	প্রথম লোকসভার প্রথম অধিবেশন তারিখ	১৩.৫.১৯৫২
১৪।	প্রথম রাজ্য সভা গঠন	০৪.০৪.১৯৫২
১৫।	রাজ্য সভার প্রথম বৈঠক	১৩.৫.১৯৫২
১৬।	বর্ত্তমান লোক সভায় ওড়িশার সভ্যসংখ্যা	২১
১৭।	বর্ত্তমান রাজ্য সভায় ওড়িশার সভ্যসংখ্যা	১০

১৮। কেবল দিল্লীর (কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল) জন্য একটি উচ্চ ন্যায়ালয় আছে।

১৯। গোয়া, মনিপুর, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মিজোরাম, হরিয়ানা, অরুনাচল প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র উচ্চ ন্যায়ালয় নেই।

২০। লোক সভার অধ্যক্ষ মন্ডলী বাচস্পতির দ্বারা মনোনীত হয়ে থাকেন।

২১। কোনো সাংসদ এক সঙ্গে উভয় লোকসভা ও রাজ্য সভা এবং রাজ বিধান মন্ডলের সদস্য হতে পারবেনা

২২। সংসদের দৈনিক অধিবেশনের ১ম ঘন্টাকে 'প্রশ্নকাল' বলা হয়। এই সময়ে প্রশ্নোত্তর কার্য্যক্রম হয়।

২৩। কেবল ২টি কেন্দ্র শাষিত অঞ্চল দিল্লী, ও পুদুচেরীর জন্য উপ রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযুক্ত হয়ে থাকেন।

২৪। স্বতন্ত্র ওড়িশা প্রদেশ গঠন - ১লা এপ্রিল ১৯৩৬ সাল

২৫। ২০০০ সালে ঝাড়খন্ড, উত্তরাখন্ড ও ছত্রিশগড় রাজ্যের জন্য নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠা হওয়ায়, হাইকোর্টের সংখ্যী ১৮ থেকে ২১ শে বৃদ্ধি পেয়েছে।

● ● ●